আদর্শ হিন্দু হোটেল

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিমহিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেইজানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ারসঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকাবাড়ি হইয়াছে, চারজন রসুয়ে বামুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌শিম্‌ খাইয়া যায়, এমনখদ্দেরের ভিড়।

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বাক্সের ওপরকনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়াদাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—এই দিকেআসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী, ভাত—হিন্দু-হোটেল বাবু।

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের লোকের সাদরআমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে এখানে কোন্‌ ক্লাসে খাবেন? ফাস্ট ক্লাস না সেকেন্‌ ক্লাস—ফাস্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন্‌ ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট (এক টুক্‌রা সাদাকাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। সেখানে একজনরসুয়ে-বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের টিকিট লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবারজন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাস্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন্‌ ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু চক্কত্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্বৃত্ত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে-বামুনেরা চুরি করিতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটে চার জন লোক খদ্দের। দু'জন ওদেরওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাক্‌ গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা—শান্তিপুর আসবারসময় হল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকেই। আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেক্‌চিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পয়সা দেও বাবু, দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাস্টো কেলাসে খাবে। আমায় বলে পাঠিয়েছে। দইচাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্‌ তো? খদ্দের?

—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এমনি না। আমার ভাইপো আসবে দেশথেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু-এক দিনের জন্যেআসবে—তার কাছ থেকে পয়সা কিসের। দইয়ের পয়সা নিয়ে যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্টলোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে স্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের বেশী করে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবে না মনে রেখো—আমার খরচা না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমায় পইপই করে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনাবাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস্-টেলাস্ তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয়ফাস্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট্ কমিয়েছে—শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল্ না। কারও কানে কথা গেলে এখুনি—

এমন সময় ছ'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে খাবেন বাবুরা? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্নাখেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয়—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হলে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বামুনঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল—পোড়ারমুখো মিন্সেআবার শুনতে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়েরাখি। আর এখন তোগাড়ী নেই—আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেল—

—আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা-দশটা ফি দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনোমজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এইখদ্দের বাবুরা গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমিতেনো রাঁধো বলে—যত অনাছষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কিকরবে বলেন—

—ডাল কতটা আছে দেখলি?

—লবডঙ্কা। আর মেরেকেটে তিন জনের মত হবে—

ক'জনের মত ডাল দিইছিলি?

—দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের জন্যে দিইছি—সেকেন্ কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল—

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ, একহারা চেহারা, রঙ কালো। দেখিলে মনেহয় লোকটা নিপাট ভালোমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হল কি করে?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি করে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদেরদিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হলে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পষ্টদেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কিমুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্মদিদি। একটা বিড়িখেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখোআমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে-মুখে তক্‌কো কোরো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয়করে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জিকিনে দেয়নি?

—ইস্—ভারী গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাও যাও, ঠাকুর, বাজেকথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

—কেন বাবু, আমার কি দোষ হল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়াবলিল—আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নচ্ছার, বদমাইশ গাঁজাখোর কোথাকার দশ জনের দশের অর্ধেক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিইনি বের করে?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেক্‌চিতে দুটিখানি মাত্রভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্মঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে—সে রোজ বেলা দেড়টার সময়রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়—রসুয়ে-বামুনদেরজন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায়না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তারভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেক্‌চিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে—অত ভাত খাবে কে? ও তো তিন জনের খোরাক—আমার থালায় আর দুটো বেশী করে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, নাহয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইশ মাগী—পেট ভরে যে কেউ খায়— তাও তার সহ্যি হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুনএকথালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে? বাব্বাঃ,

যেমন কর্তা, তেমনি গিন্নী—(পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নী বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমায়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারেরঠাকুরবাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জনেভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারোটা পর্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তারপর কর্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শুইবারঅবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাবভেরেণ্ডার বেড়াঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন—বলিলেন—কি চাই?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে?

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী।

এইভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায়?

—গাংনাপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয় এড়োশোলা গ্রামে।

—রাঁধতে জানো?

—বাবু একদিন রাঁধিয়ে দেখুন। মাংস, মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাঁধতে হবে—তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজী থাকো আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দেরবাবুরা সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভাল কথা তো দূরের কথা, পদ্ম ঝি তাহাকে আঁশবটি পাতিয়া পারে তো কাটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায়?যাক, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোদিন—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—

হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।

আসুন ! দেখুন ! পরীক্ষা করুন !!!

কর্তার মত তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাঁধুনী-বামুন ও ঝি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এহোটেলের মত ঝিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খদ্দেরদের ভালজিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে বুঝিয়া দেখিল, লোকেভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট্ দিতেও আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেঁসারি ডাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তামাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্য কিনিবে না।

এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই—যাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়—কিন্তু তাহার মনে হয় বিশ্রামের ভালব্যবস্থা থাকিলে সে হোটেলে লোক বেশী আসিবে—অনেকেই খাওয়ার পর একটুগড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটেলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খদ্দেরদের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকিবে, বালিশথাকিবে, তামাক খাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেওঅনায়াসে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটেরকোনো হোটেলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেও না। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইস্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল' বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খদ্দের আসে?

খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোকঝুঁকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটেলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে দেখিতেদেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটেলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘরখুলিয়া বসিবে—যদি তাহাতে খদ্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারইসুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাথায় আছে, শুধু খদ্দেরের বিশ্রামঘর কেন, মোকদ্দমা মামলা যাহারা করিতে আসে, তাহারা সারাদিনের খাটুনির পরে হয়তোখাইয়া দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়—সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক।

চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহারমনে আসে। কিন্তু কখনো কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বয়সতো হইয়া গেল ছেচল্লিশের উপর—সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই, সাত টাকামাহিনার চাকুরি আজও ঘুচিল না—ছা-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহাসে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা, এই চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া? ভাবিতে বেশলাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত্র সে নয়। ছেচল্লিশ বছর এমন কিছু বয়সনয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচিবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া মরিয়াগেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিবে না। পদ্ম ঝি এতক্ষণ উনুনেআঁচ দিয়াছে, দেরি করিয়া গেলে তাহার মুখনাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়—অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিনকালে।

ফিরিবার পথে ছোট বাজারে রাধাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়।

—বাবা রাধাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। পদ্মঝির ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ওই কর্তাবাবুর হোটেলের পাশে পদ্ম ঝিকে দেখিয়েদেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পদ্ম ঝি উনুনে আঁচ দিয়াকোথায় গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

—শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিস্টি করবেন, তাঁরা আমায় আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা করবে। ওঁরা মুর্শিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসেনি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্কত্তি একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনো ইহারা তাহার রান্না ভালবলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে!

রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনেআছে, তাহাদের এড়োশোলা গ্রামেএকজন সেকালের প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় তাঁর শুধু সাধারণধরনের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামের বাহিরেও অনেক জায়গায়লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল—খুড়ীমা, আপনার তো বয়েস হয়েছে, কবে চলেযাবেন—আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন—আচ্ছা তোকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি করে নিরিমিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একটিজিনিস রাঁধিবার গুণেই হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস নিরিমিষ চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এ কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—মাংস, মাছ সবই রাঁধে ভাল—কিন্তু তার হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চমৎকার হোটেলে একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারেতে অতগুলোহোটেল রহিয়াছে সে আর কোথাও যাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধিবার ভার তাহারই উপর পড়িল। খদ্দেররা মাংস খাইয়া খুব তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই—খদ্দেরের মুখের প্রশংসা ছাড়া। পদ্ম ঝি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাওবলিল না। বেচু চক্কত্তিও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্য তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, কর্তাবাবু নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পদ্ম ঝি চাটিয়া-পুটিয়ালইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মুশকিল ঘটে। তাহার জন্য বিশেষ কিছুই থাকে না, এক একদিন ভাত পর্যন্ত কম পড়িয়া যায়—মাছ, মাংস তো দূরের কথা। বয়স ছেচল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে ভাল, খাইতে ভালও বাসে—কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট ভরে না।

রাত সাড়ে বারোটা। কর্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেলে সে আরমতি চাকর ছাড়া আর কেহ থাকে না। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রাত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল—চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্ছে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর?

—এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি! সারাদিন খেটে আবার ও-সব শখ থাকে? আমি যাবো না—তুই যাস্ তো যা। এসে ভাড়ার ঘরের জানালায় টোকা মারিস্ দোরখুলে দেবো।

মতি চাকর ছোকরা মানুষ। তাহার শখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারিউঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয্যেকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের সঙ্গে তাহাদের রেষারেষিকরিয়া কারবার চলে। তিনি এত রাত্রে এখানে কি মনে করিয়া? কখনো তো আসে না ! হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুয্যেও একটা হোটেলের কর্তা, সুতরাং হাজারির কাছে সেও তার মনিবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল, আর কে আছে ঘরে?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণে মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল—বিনীত ভাবে বলিল—কেউ নেই বাবু, আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—চলো ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বেচু চক্কত্তির গদিতে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

কাপড়-চোপড় দেয়?

—আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুয্যে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—শোন, আমার হোটেলে তুমিকাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা কাপড়পাবে। ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক। যাবে?

হাজারি দস্তুরমত অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না।তারপর বলিল—বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

—ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজী। তবে হ্যাঁ, বেচু চক্কত্তির সঙ্গে আমি অসরস করতে চাইনে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম ঝি কোথাওআড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন আমি কোন কথা বলতেপারবো না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যে নয়, তবে খায় খুব সঙ্গোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না।সংসারে কেহ এ পর্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল রাঁধে বলিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরস্কার দিতে চায় নাই—খদ্দেরের মুখের ফাঁকা কথায় পেট ভরে না তো!

যদুবাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার চাকরি (মায় খোরাকী ধোপা নাপিত) দিতে!

এতদিন রাণাঘাটের বাজারে আছে—কখনও কাহারও সঙ্গে মেশে না সে—মিশিতে ভালও বাসে না। তাহার জীবনের আশা যে—টা, সেটা দশজনের সঙ্গে মিশিয়াআড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে পূর্ণ হইবে না। তাহাকে খাটিতে হইবে, বাজারবুঝিতে হইবে, হিসাব রাখা শিখিতে হইবে, একটা ভাল হোটেল চালাইবার যাহা কিছুসুলুকসন্ধান সব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, দেশের কাছেবড় মুখ দেখাইতে হইলে, পরের মুখে নিজের নাম শুনিতে হইলে—চেষ্টা চাই, খাটুনিচাই। আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে কিংবা মতি চাকরের মত ছোট বাজারেরবারোয়ারীর যাত্রা শুনিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

রাত অনেক। মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঘুম আসার নামটি নাই।

দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হইল। হাজারি উঠিয়া দরজা খুলিল—সে আগেই বুঝিয়াছিলমতি চাকর ফিরিয়াছে। মতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি ঠাকুর? এখনোজেগে যে!

হাজারি গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখিয়া তবে মতিকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিল।বলিল—যে গরম, ঘুম আসবে কি, সারাদিন আগুনের তাতে—যাত্রা দেখলি নে?

মতি বলিল—যাত্রার আসরে জায়গা নেই। লোক ভর্তি। ফিরে এলাম। চলো একজায়গায়, যাবে ঠাকুরমশায়?

—কোথায়?

—পাড়ার মধ্যে। চলো না—ঘুম যখন নেই, একটু ঘুরেই না হয় এলে। তোমারতো কোনদিন কোথাও—

হাজারি বলিল—তোরা ছেলে-ছোকরা, আমার বয়স ছেচল্লিশ। আমি তোর বাপেরবয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব কথা কেন?...তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস্ কর্‌গে যা।

—বাবুর কাছে কি পদ্মদিদির কাছে কিছু বোলো না ঠাকুরমশাই, দোহাই, দুটি পায়ে পড়ি।

আশ্চর্য এই যে, মতির এই কথা হাজারির মনে এক নতুন ধরনের ভাবনা আনিয়া দিল। তাহার উচ্চাশা আছে, মতির মত রাত বেড়াইয়া স্ফূর্তি করিয়া সময় নষ্ট করিলেভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না। মতি কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না, বাসনেরঘরে (হোটেলের পিতল কাঁসার থালা-বাটি রান্নাঘরের পাশে সিন্দুকে থাকে, মাজাঘষারপর রোজ রাত্রে বেচু চক্কত্তি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেগুলি গুনিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া চাবি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান) গিয়া শুইয়া পড়িল। হাজারিও বাসনেরঘরে শোয়, আজ সে বাহিরের গদির মেজেতে তাহার পুরানো মাদুরখানা পাতিয়াশুইল।

না—যদুবাবুর হোটেলে সে যাইবে না। হোটেলের রাঁধুনীগিরি সব জায়গায় সমান।এ হোটেলে আছে পদ্ম, ও হোটেলে হয়তো আবার কে আছে কে জানে? তা ছাড়া, বেচুবাবু তাহার পাঁচ বছরের অন্নদাতা। লোভে পড়িয়া এতদিনের অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

সে নিজে হোটেল খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাঁধুনী-বৃত্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেনতখন অন্য কথা।

পরদিন খুব সকালে পদ্ম ঝি আসিয়া ডাকিল—ও ঠাকুর, দোর খোলো—এখনওঘুম—বাবাঃ! কুম্ভকর্ণকে হার মানালে তোমরা!

হাজারি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ছেঁড়া মাদুরখানা গুটাইয়া রাখিয়া দোরখুলিয়া দিল। একটু পরেই বেচু চক্কত্তি আসিলেন। দরজায়, গদিতে ও ক্যাশ-বাক্সে গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া, ক্যাশ-বাক্সের ডালার উপরটা সামান্য একটু গঙ্গাজল দিয়ামার্জনা করিয়া লইয়া পদ্ম ঝিকে বলিলেন—ধুনো দে—বেলা হয়ে গেল। আজ হাটবার, ব্যাপারীদের ভিড় আছে, শীগ্‌গির করে আঁচ দে—আর সেদিনকার মত পচা দই-টইআনিস নে বাপু। ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—শেষকালে স্যানিটারি বাবুর চোখে পড়ে যাবো। দরকার কি?

ব্যাপারীরা সাধারণত পাড়াগাঁয়ের চাষা লোক। তাহারা দই খাইতে পছন্দ করে বলিয়া প্রতি হাটবারে তাহাদের জন্যে কয়েক হাঁড়ি দইয়ের বরাদ্দ আছে। এই দই পদ্মঝি তাহার নিজের ঘরে পাতিয়া হোটেলে বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা লাভ করিয়া থাকে।এবং সে যে প্রথম শ্রেণীর জিনিস সরবরাহ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ্ম ঝি মুখ ঘুরাইয়া বলিল—বাবু আপনার যত সব অনাছিষ্টি কথা! দই পচা নাঘণ্ট, কে বল্‌চে দই পচা! ওই মুখপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাদ্দর চাল যদিআজ—

হাজারি ঠাকুর কথাটা বলিয়াছিল বটে—তবে সে দই পচা কি তাজা তাহা বলেনাই—বলিয়াছিল ব্যাপারী খদ্দেররা বলাবলি করিতেছিল এ রকম খারাপ দই খাইতে দিলে তাহারা চোদ্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সার বেশি খোরাকি দিবে না।

পদ্ম ঝি রান্নাঘরের চৌকাঠে পা দিয়া ঝাঁজালো ঝগড়ার সুরে বলিল—বলি, ওঠাকুর—দই পচা তোমাকে কে বলেচে?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—ওই সাধু মণ্ডল আর তার ভাইপো রোজ হাটেই তো এখানে খায়—ওরাই বলছিল—

—বলছিল! তোমার গলা ধরে বলতে গিয়েছে ওরা! তোমার মত হিংসুক কুচুটেলোক তো কখনো দেখিনি—আমি দই দিই বলে তুমি হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্ছ সে কি আমি বুঝিনে! তোমার শখের কুসুম গয়লানীর ছাপ-বাক্সে পয়সা না উঠলে কি আর তোমার মনে শান্তি আছে!.....গাঁজাখোর মড়ুই-পোড়া বামুন কোথাকার!

হাজারি জিভ্ কাটিয়া বলিল—ছি ছি, কি যে বলো পদ্মদিদি তার ঠিক নেই—কুসুমের বাপের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে, আমায় জ্যাঠা বলে ডাকে, আমি তাকে মেয়েবলি—তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না?

ইহার উত্তরে পদ্ম ঝি যাহা বলিল, তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল।কুসুমকে সে সত্যই মেয়ের মত স্নেহ করে— তাহাদের গ্রামের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে—রাণাঘাটে তাহার শ্বশুরবাড়ি—অল্পবয়সেবিধবা হইয়াছে, এখন দুধ বেচিয়া, দই বেচিয়া ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে মানুষ করে।এক শাশুড়ী ছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে কেহ নাই।

হঠাৎ একদিন পথে দু'জনের দেখা।

—জ্যাঠামশায় যে! দাঁড়ান একটু পায়ের ধুলো দিন। আপনি এখানে কোথায়?

—আরে কুসুম, কোত্থেকে তুই এখানে?

—এই তো আমার শ্বশুরবাড়ী, ছোট বাজারে মন্দিরের গায়েই। আপনি কি আজবাড়ী থেকে এসেছেন?

—না রে—আমি রেল-বাজারে হোটেলেকাজ করি। আজ মাস ছ'-সাত আছি।

বিদেশে একই গ্রামের মানুষ দেখিয়া দুজনেই খুব খুশী হইল। সেই হইতে কুসুম হাজারি ঠাকুরের হোটেলে দুধ-দই বেচিতে গিয়াছে। গরীব বলিয়া হাজারি ঠাকুরঅনেকবার লুকাইয়া হোটেল হইতে রাঁধা ভাত-তরকারি থালা করিয়া বাড়িয়া দিয়াছে। দুধ-দই বেচিয়া ফিরিবার সময় কুণ্ডুদের পাটের আড়তের গলিটায় দাঁড়াইয়া কুসুম থালালইয়া গিয়াছে। ইহাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা পদ্ম ঝির চোখ এড়ায় নাই, সুতরাং সেবলিতেই পারে।

দুপুরের পর হাজারি প্রতিদিনের মত চূর্ণীর ধারে যাইতেছে—এমন সময় কুসুমেরসঙ্গে দেখা হইল।

কুসুম দুধের ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, বেশ স্বাস্থ্য, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী বেশ শান্ত।

হাজারি বলিল—বাড়ী ফিরছিস্ এত বেলায় যে!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিজের তো দুধ নেই—কায়েত পাড়া থেকে দুধ আনি, তবে বিক্রী করি, তবে বাড়ী ফিরি। আসুন না আমাদের বাড়ী।

—না, এখন আর কোথায় যাবো! তুই যা, খাবি-দাবি।

কুসুম কিছুতেই ছাড়ে না, বলিল—আমার খাওয়া-দাওয়া জ্যাঠামশায়, শাশুড়ী রেঁধেরেখে দিয়েচে গিয়ে খাবো; কতক্ষণ লাগবে? আসুন না।

হাজারি অগত্যা গেল। ছ'চালা একখানা বড় ঘর, সেখানেতে কুসুমের শাশুড়ীথাকে—আর একখানা ছোট চারচালা ঘরে কুসুম ছেলে দুটি লইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত কুসুমের খুব সদ্ভাব নাই।

কুসুম নিজের ঘরে হাজারিকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোশ, পুরু কাঁথা পাতিয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তাহার উপরে। তক্তপোশের নীচে বালিদেওয়া আর-বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি ও একটা বড় জালা—

বাঁশের আল্নাতে কতকগুলি লেপ-কাঁথা বাঁধা। একটা জলচৌকিতে খানকতক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্ঝকে পিতল কাঁসার বাসন। ঘর দেখিয়া হাজারির মনে হইল—কুসুম বেশসাজাইয়া রাখিতে জানে জিনিসপত্র।

কুসুম বলিল—পান খাবেন জ্যাঠামশায়?

—দে একটা। আর তুই খেতে যা। বেলা অনেক হয়েচে।

কিন্তু কুসুমের দেখা গেল, খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো তাড়া নাই। হাজারিকে পান দিয়াসেই যে হাজারির সামনে মেজেতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল—প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। সে নড়িবার নামও করে না দেখিয়া হাজারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বলিল—তুই খেতে যা না। আমি যাই, আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে সকালসকাল।

কুসুম বলিল—যাচ্ছি এবার।

বলিয়া আর যায় না। আরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কুসুম আর যায় নাই। বাবা মারা গিয়াছে, ভাইয়েরা গরীব বলিয়া হউক বাভাই-বৌদের জন্যই হউক—তাহাকে বাপের বাড়ীতে কেহ লইয়া যায় না। নিজেদু-একবার গিয়াছিল, বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ভাই-বৌদের ব্যবহার ভাল নয়।

হাজারির সঙ্গে কুসুম সেই সব কাহিনীই বলিতে লাগিল। ছেলেবেলায় গ্রামে কিপথে করিয়াছিল কি, সেই বিষয়ে কথাও তাহার আর ফুরায় না।

—এখানে ছোলার শাক পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের গাঁয়ের যুগী-পাড়ারমাঠে আমরা ছোলার শাক তুলতে যেতাম জ্যাঠামশায়—একবার, তখন আমার বয়েসন'বছর, আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দুজনে গিয়েছি ছোলার শাকতুলতে—একটা মিনসে দেখি জ্যাঠামশায়ের ছোলার ক্ষেতে বসে কচি ছোলা তুলে তুলেখাচ্ছে। আমাদের না দেখে দোড় দোড়, বিষম দোড়! আমরা তো হেসে বাঁচিনে— ভেবেছে বুঝি আমাদের ক্ষেত!

বলিয়া কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি!

হাজারি দেখিল, ইহার ছেলেমানুষী গল্প শুনিতে গেলে ওদিকে হোটেলে যাইতেবিলম্ব হইবে—পদ্ম ঝি মুখ-নাড়ার চোটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

সে উঠিতে যাইতেছে, কুসুম বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, আপনার জন্যে একটা জিনিস করে রেখেছি। সেইটে দেবার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বলিয়া একটা কাপড়ের পুঁটুলি খুলিয়া একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

—বাঃ, বেশ হয়েছে রে!

কুসুম কাঁথাখানি পাট করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল—আপনি এখানা রাত্রেপেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে,—আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দেব। তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু করে এখানা আজ দিন পাঁচ-ছয় হল শেষ হয়েছে।

হাজারি ভারি খুশী হইল।

কুসুমের বাবা রসিক ঘোষ প্রায় তাহার সমবয়সী। কুসুম তাহার মেয়ের সমান।একই গাঁয়ের লোক,—তাহা হইলেও কি সবাই করে?গাঁয়ে তো কত লোক আছে!

মুখে বলিল, —বেঁচে থাক মা, মেয়ে না হলে বাপের জন্যে এত আত্তি দেখায় কে? ভারী চমৎকার কাঁথা। আমি পেতে শুয়ে বাঁচবো এখন। ভারি চমৎকার কাঁথা। বেশ, বেশ!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, আপনি তো বললেন, মেয়ে না হলে কে করে—কিন্তুআমিও বলছি বাবা না হলে হোটেল থেকে নিজের মুখের ভাতের থালা কে মেয়েকে দেয় লুকিয়ে—শ্রাবণ মাসের সেই উপব্রান্ত বাদলায়—

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে সে বাঁ-হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া চুপকরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—মাথার ওপর ভগবানজানেন—আর কেউ জানে না আপনি আমার জন্যে যা করছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা—আমি ছোট জাতের মেয়ে—আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, তবেআমিও বলচি ওপরের দেনেওয়ালা আপনাকে ভাতের থালার বদলে মোহরের থালা যেন দেন। আমিও যেন দেখে মরি।

বলিয়াই সে আসিয়া হাজারির পায়ে গড় হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সেদিন ছিল বেশ বর্ষা।

হাজারি দেখিল, হোটেলে গদির ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। অন্যদিনএ ধরনের খদ্দের এ হোটেলে সাধারণত আসে না—হাজারি ইহাদের দেখিয়া একটুবিস্মিত হইল।

বেচু চক্কত্তি ডাকিল—হাজারি ঠাকুর, এদিকে এসো-হাজারি গদির ঘরে দরজায়আসিয়া দাঁড়াইলে ভদ্রলোকদের একজন বলিলেন—এই ঠাকুরটির নাম হাজারি?

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাঁ বাবু, এরই নাম হাজারি।

বাবুটি বলিলেন—এর কথাই শুনেচি। ঠাকুর তুমি আজ বর্ষার দিনে আমাদেরমাংস পোলাও রেঁধে ভাল করে খাওয়াতে পারবে? তোমার আলাদা মজুরী যা হয়দেবো।

বেচু বলিল—ওকে আলাদা মজুরী দেবেন কেন বাবু, আপনাদের আশীর্বাদে আমারহোটেলের নাম অনেক দূর অবধি লোকে জানে। ও আমারই ঠাকুর, ওকে কিছু দিতেহবে না। আপনারা যা হুকুম করবেন তা ও করবে।

এই সময় পদ্ম ঝি বেচু চক্কত্তির ডাকে ঘরে ঢুকিল।

বেচু চক্কত্তি কিছু বলিবার পূর্বে জনৈক বাবু বলিল—ঝি, আমাদের একটু চা করে খাওয়াও তো এই বর্ষার দিনটাতে। না হয় কোনো দোকান থেকে একটু এনে দাও।বুঝলেন চক্কত্তি মশায়! আপনার হোটেলের নাম অনেক দূর পর্যন্ত যে গিয়েছে বল্লেন—সে কথা মিথ্যা নয়। আমরা যখন আজ শিকারে বেরিয়েছি, তখন আমার পিসতুতোভাই বলে দিয়েছিল, রাণাঘাট যাচ্ছ, শিকার করে ফেরবার পথে রেল-বাজারের বেচুচক্কত্তির হোটেলের

হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস খেয়ে এসো। তাই আজ সারাদিন জলায় আর বিলে পাখি মেরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভাবলাম, ফিরবার গাড়ী তো রাত দশটায়। তা এ বর্ষার দিনে গরম গরম মাংস একটু খেয়েই যাই। মজুরী কেন দেব নাচক্কত্তি মশায়? ও আমাদের রান্না করুক, আমরা ওকে খুশি করে দিয়ে যাবো। ওরজন্যেই তো এখানেআসা। কথা শুনিয়া হাজারি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরো সে খুশি হইল এই ভাবিয়া যে, চক্কত্তি মশায়ের কানে কথাগুলি গেল—তাহার চাকুরির উন্নতি হইতে পারে। মনিবের সুনজরে পড়িলে কি না সম্ভব? খুশির চোটে সে লক্ষ্যইকরিল না যে, পদ্ম ঝি তাহার প্রশংসা শুনিয়া এদিকে হিংসায় নীল বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবুরা হোটেলের উপর নির্ভর করিল না—তাহারা জিনিসপত্র নিজেরাই কিনিয়াআনিল। হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে একটুকুজল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরতডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেক দিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলেদৈনন্দিন খাদ্যতালিকার মধ্যে মাংস কোনদিনই থাকে না—তবে বাঁধা খরিদ্দারগণের মনস্তুষ্টির জন্য মাসে একবার বা দু-বার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে—সে রান্নার মধ্যে বিশেষ কৌশল দেখাইতে গেলে চলে না বা হাজারির ইচ্ছাও করে না—যেমন ভাল শ্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না—তেমনি।

হাজারি ঠিক করিল, পদ্ম ঝি তাহাকে দুই চক্ষু পাড়িয়া যেমন দেখিতে পারে না—তেমনি আজ মাংস রাঁধিয়া সকলের বাহবা লইয়া পদ্ম ঝির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াদিবে, তাহাকে যত ছোট মনে করে ও, তত ছোট সে নয়। সেও মানুষ, সে অনেক বড়মানুষ।

ভাল যোগাড় না দিলে ভাল রান্না হয় না। পদ্ম ঝি যোগাড় দিবে না এ জানা কথা। হোটেলের অন্য উড়ে বামুনটিকে বলিতে পারা যায় না—কারণ সে-ই হোটেলেরসাধারণ রান্না রাঁধিবে।

একবার ভাবিল—কুসুমকে আনবো?

পরক্ষণেই স্থির করিল, তার দরকার নাই। লোকে কে কি বলিবে, পদ্ম ঝি তো বঁটিপাতিয়া কুটিবে কুসুমকে। যাক্, নিজেই যাহা হয় করিয়া লইবে এখন।

বেলা হইয়াছে। হাজারি বাজার হইতে কেনা তরি-তরকারী, মাংস নিজেই কুটিয়া বাছিয়া লইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। বর্ষাও যেন নামিয়াছে হিমালয় পাহাড় ভাঙিয়া। কাঠগুলো ভিজিয়া গিয়াছে—মাংস সে কয়লার জ্বালে রাঁধিবে না। তাহার সে বিশেষ প্রণালীর মাংস রান্না কয়লার জ্বালে হইবে না।

সব রান্না শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। তারপরে খরিদ্দার বাবুরা খাইতে বসিল। মাংস পরিবেশন করিবার অনেক পূর্বেই ওস্তাদ শিল্পীর গর্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত হাজারি বুঝিয়াছে, আজ যে ধরনের মাংস রান্না হইয়াছে—ইহাদের ভাল না লাগিয়া উপায় নাই। হইলও তাই।

বাবুরা বেচু চক্কত্তিকে ডাকাইলেন, হাজারি ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিলেন যে, বেচু চক্কত্তিও যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল সে কথা শুনিয়া। চাকরকে ছোট করিয়া রাখিয়া মনিবের সুবিধা আছে, তাহাকে বড় করিলেই সে পাইয়া বসিবে।

যাইবার সময় একজন বাবু হাজারিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এখানেকত পাও ঠাকুর?

সাত টাকা আর খাওয়া-পরা।

—এই দুটো টাকা তোমাকে আমরা বক্‌শিশ দিলাম—চমৎকার রান্না তোমার। যখন আবার এদিকে আসবো, তুমি আমাদের রেঁধে খাইও।

হাজারি ভারি খুশি হইল। বক্‌শিশ ইঁহারা হয়তো কিছু দিবেন সে আশা করিয়াছিলবটে, কিন্তু দু-টাকা দিবেন তা সে ভাবে নাই।

যাইবার সময় বেচু চক্কত্তির সামনে বাবুরা হাজারির রান্নার আর এক দফা প্রশংসাকরিয়া গেলেন। আর একবার শীঘ্রই শিকারে আসিবেন এদিকে, তখন এখানে আসিয়া হাজারি ঠাকুরের হাতের মাংস না খাইলে তাঁহাদের চলিবেই না। বেশ হোটেল করেছেনচক্কত্তি মশায়।

বেচু চক্কত্তি বিনীত ভাবে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু মশায়েরা রাজসইলোক, সব দেখতে পাচ্ছেন, সব বুঝতে পাচ্ছেন। এই রাণাঘাট রেল-বাজারে হোটেলআছে অনেকগুলো, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন, সকলেই দয়া করে এইগরীবের কুঁড়েতেই পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন। তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছাহয়, আগে থেকে একখানা চিঠি দেবেন, সব মজুদ থাকবে আপনাদের জন্যে; বলবেনকলকাতায় ফিরে দু'চারজন আলাপী লোককে—যাতে এদিকে এলে তাঁরাও এখানে এসে ওঠেন। বাবু—তা আমার বামুনের মজুরীটা?..হেঁ-হেঁ—

—কত মজুরী দেবো?

—তা দিন বাবু একবেলার মজুরী আট আনা দিন।

বাবুরা আরও আট আনা পয়সা বেচুর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেচু হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—ঠাকুর আজ আর বেরিয়ো না কোথাও। বেলা গিয়েচে। উনুনে আঁচ আর একটু পরেই দিতে হবে। পদ্ম কোথায়?

—পদ্মদিদি থালা বাসন বার করচে, ডেকে দেবো?

পদ্ম ঝি আজ যে মুখ ভার করিয়া আছে, হাজারি তাহা বুঝিয়াছিল। আজ হোটেলে সকলের সামনে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে বাবুরা, আজ আর কি তাহার মনে সুখ আছে? পদ্ম ঝির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য তাহার ভাতের থালায় হাজারি বেশী করিয়া ভাত তরকারি এবং মাংস দিয়াছিল। পদ্ম ঝি কিছুমাত্র প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইলনা, মুখ যেমন ভার তেমনিই রহিল।

ভাতের থালা উঠাইয়া লইয়া পদ্ম ঝি হঠাৎ প্রশ্ন করিল রাঁধা মাংস আর কতটাআছে ঠাকুর?

বলিয়াই ডেক্‌চির দিকে চাহিল। এমন চমৎকার মাংসকুসুমের বাড়ী কিছু দিয়া আসিবে (সে ব্রাহ্মণের বিধবা নয়, মাছ-মাংস খাইতে তাহার আপত্তি নাই) ভাবিয়া ডেক্‌চিতে দেড় পোয়া আন্দাজ মাংস হাজারি রাখিয়া দিয়াছিল—পদ্ম ঝি কি তাহা দেখিতে পাইল?

পদ্ম দেখিয়াছে বুঝিয়া হাজারি বলিল—সামান্য একটু আছে।

—কি হবে ওটুকু? আমায় দাও না—আমার আজ ভাগ্নীজামাই আসবে—তুমি ত মাংস খাও না—

কুসুমের জন্য রাখা মাংস পদ্ম ঝিকে দিতে হইবে—যার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেনা হাজারির! হাজারি মাংস খায় না তাহা নয়, হোটেলে মাংস রান্না হইলেই হাজারিনিজের ভাগের মাংস লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসে—নিজেকে বঞ্চিত করিয়া। পদ্মঝি তাহা জানে, জানে বলিয়াই তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা উহারমনে জাগিয়াছে ইহাও হাজারি বুঝিল।

হাজারি বলিল—তোমায় তো দিলাম পদ্মদিদি, একটুখানি পড়ে আছে ডেক্‌চির তলায়—ওটুকু আর তুমি কি করবে?

—কি করবো বললুম, তা তোমার কানে গেল না? ভাগ্নীজামাই এসেছে শুনলেনা?যা দিলে এতটুকুতে কি কুলুবে? ঢেলে দাও ওটুকু।

হাজারি বিপন্ন মুখে বলিল—আমি একটু রেখে দিইছি, আমার দরকার আছে।

পদ্ম ঝি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সুরে বলিল—কি দরকার? তুমি তো খাও না—কাকে দেবে শুনি?

হাজারি বলিল—দেবো—ও একজন একটু চেয়েছে—

—কে একজন?

—আছে—ও সে তুমি জানো না।

পদ্ম ঝি ভাতের থালা নামাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—না, আমি জানিনে। তা কি আর জানি? আর সে জানা-জানির আমার দরকার নেই। হোটেলের জিনিস তুমিকাউকে দিতে পারবে না, তোমায় অনেকদিন বলে দিইছি। বেশ তুমি আমায় না দাও, চক্কত্তি মশায়ের শালাও আজ কলকাতা থেকে এসেছে—তার জন্যে মাংস বাটি করেআলাদা রেখে দাও—ওবেলা এসে খাবে এখন। আমি না পেতে পারি, সে হোটেলেরমালিকের আপনার লোক, সে তো পেতে পারে?

বেচু চক্কত্তির এই শালাকে হাজারি অনেকবার দেখিয়াছে—মাসের মধ্যে দশ দিনআসিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী পড়িয়া থাকে, আর কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া টেরি কাটিয়া হোটেলে আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব চালায়—কথায় কথায় ঠাকুর-চাকরকে অপমানকরে; চোখ রাঙায়, যেন হোটেলের মালিক নিজেই।

তাহাদের গ্রামের মেয়ে, দরিদ্রা কুসুম ভালটা মন্দটা খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পেটের ভাত জুটাতেই পারে না—তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া এত যত্নের মাংস শেষকালে সেই চালবাজ বার্ডসাই-খোর শালাকে দিয়া খাওয়াইতে হইবে—এ প্রস্তাব হাজারির মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু সে ভালমানুষ এবং কিছু ভীতু ধরনের লোক, যাহাদের হোটেল, তাহারা যদি খাইতে চায়, হাজারি তাহা না দিয়া পারে কি করিয়া—অগত্যা হাজারিকে পদ্ম ঝিয়ের সামনে বড় জামবাটিতে ডেক্‌চির মাংসটুকুঢালিয়া রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে রেকাবি চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হইল।

সামান্য একটু বেলা আছে, হাজারি সেটুকু সময়ের মধ্যেই একবার নদীর ধারেফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে গেল।

আজ তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে—দুইটি জিনিস আজ বুঝিয়াছে সে। প্রথম, ভাল রান্না সে ভুলিয়া যায় নাই, কলিকাতার বাবুরাও তাহার রান্না খাইয়া তারিফ করেন। দ্বিতীয়, পরের তাঁবে কাজ করিলে মানুষকে মায়া-দয়া বিসর্জন দিতেহয়।

আজ এমন চমৎকার রান্না মাংসটুকু সে কুসুমকে খাওয়াইতে পারিল না, খাওয়াইতে হইল তাহাদের দিয়া, যাহাদের সে দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কুসুম যেদিনকাঁথাখানি দিয়াছিল, সেদিন হইতে হাজারির কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ পড়িয়াছেকুসুমের ওপর।

বয়সে তো সে মেয়ের সমান বটেই, কাজও করিয়াছে মেয়ের মতই। আজ যদি হাজারির হাতে পয়সা থাকিত, তবে সে বাপের স্নেহ কি করিয়া দেখাইতে হয়, দেখাইয়া দিত। অন্য কিছু দেওয়া ত দূরের কথা, নিজের হাতে অমন রান্না মাংসটুকুই সে কুসুমকে দিতে পারিল না।

ছেলেবেলাকার কথা হাজারির মনে হয়। তাহার মা গঙ্গাসাগর যাইবেন বলিয়া যোগাড়যন্ত্র করিতেছেন—পাড়ার অনেক বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বিধবাদের সঙ্গে। হাজারি তখন আট বছরের ছেলে—সেও ভীষণ বায়না ধরিল গঙ্গাসাগর সে না গিয়া ছাড়িবেই না। তাহার ঝুঁকি লইতে কেহই রাজী নয়। সকলেই বলিল—তোমার ও ছেলেকে কেদেখাশুনো করবে বাপু, অত ছোট ছেলে আর সেখানে নানান্ ঝক্কি—তাহলে তোমারযাওয়া হয় না।

হাজারির মা ছেলেকে ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁর যাওয়াই হইল না। জীবনে আর কখনোই তাঁর সাগর দেখা হয় নাই, কিন্তু হাজারিরমনে মায়ের এই স্বার্থত্যাগের ঘটনাটুকু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া আছে।

হাজারি ভাবিল—যাক গে, যদি কখনো নিজে হোটেল খুলতে পারি, তবে এই রাণাঘাটের বাজারে বসেই পদ্ম ঝিকে দেখাবো—তুই কোথায় আর আমি কোথায়! হাতে পয়সা থাকলে কালই না হোটেল খুলে দিতাম! কুসুমকে রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবো আমার নিজের হোটেল হলে।

কতকগুলি বিষয় সে যে খুব ভাল শিখিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারে। বাজার-করাহোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারী কাজ এবং শক্ত কাজ। ভাল বাজার করারউপরে হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এবং ভাল বাজার করার মানেই হইতেছে সস্তায় ভাল জিনিস কেনা। ভাল জিনিসের বদলে সস্তা জিনিস—অথচ দেখিলে তাহাকে মোটেই খেলো বলিয়া মনে হইবে না—এমন দ্রব্য খুঁজিয়া বাহিরকরা। যেমন বাটা মাছ যেদিন বাজারে আক্রা—সেদিন ছ'আনা সের রেল-চালানী রাস্মাছের পোনা কিনিয়া তাহাকে বাটা বলিয়া চালাইতে হইবে—হঠাৎ ধরা বড় কঠিন, কোন্‌টা বাটার পোনা, কোন্‌টা রাসের পোনা।

পরদিন হাজারি চূর্ণীর ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মন কাল হইতে ভাল নয়। পদ্ম ঝির নিকট ভাল ব্যবহার কখনও সে পায় নাই, পাইবার প্রত্যাশাও করেনা। কিন্তু তবুও কাল সামান্য একটু রাঁধা মাংস লইয়া পদ্ম ঝি যে কাণ্ডটি করিল, তাহাতে সে মনোকষ্ট পাইয়াছে খুব বেশী। পরের চাকরি করিতে গেলে এমন হয়।কুসুমকে একটুখানি মাংস না দিতে পারিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছে বেশী—অমন ভালরান্না সে অনেক দিন করে নাই—অত আশার জিনিসটাকুসুমকে দিতে পারিলে তাহার মনটা খুশি হইত।

ভাল কাজ করিলেও চাকুরির উন্নতি তো দূরের কথা, ইহারা সুখ্যাতি পর্যন্ত করিতেজানে না। বরঞ্চ পদে পদে হেনস্থা করে। এক একবার ইচ্ছা হয় যদুবাবুর হোটেলেকাজ লইতে। কিন্তু সেখানেও যে এরকম হইবে না তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। সেখানেও পদ্ম ঝি জুটিতে বিলম্ব হইবে না। কি করা যায়।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বেশীক্ষণ বসা যায় না। বহু পাপ না করিলে আরকেহ হোটেলের রাঁধুনীগিরি করিতে আসে না। এখনি গিয়া ডেক্‌চি না চড়াইলে পদ্ম ঝি এক ঝুড়ি কথা শুনাইয়া দিবে, এতক্ষণ উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।...কিন্তুফিরিবার পথে সে কি মনে করিয়া কুসুমের বাড়ী গেল।

কুসুম আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—বাবাঠাকুর আসুন, বড় সৌভাগ্য অসময়েআপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

হাজারি বলিল—দ্যাখ্ কুসুম, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

কুসুম সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বাবাঠাকুর?

—আমার বয়েস ছেচল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না, কিবলিস কুসুম? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে, তুই কি বলিস্?

হাজারির কথাবার্তার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া কুসুম কিছু বিস্ময়, কিছুকৌতুকের সুরে বলিল—তা বাবাঠাকুর, তা তো বটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি—কেন বাবাঠাকুর?

কুসুমের মনে একটা কথা উঁকি মারিতে লাগিল—বাবাঠাকুর আবার বিয়ে-টিয়েকরবার কথা ভাবচেন নাকি?

হাজারি বলিল—আমার বড় ইচ্ছে আছে কুসুম, একটা হোটেল করব নিজেরনামে। পয়সা যদি হাতে কোনদিন জমাতে পারি, এ আমি নিশ্চয়ই করবো, তুই জানিস! পরের ঝাঁটা খেয়ে কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। আমি আজ দশ বছর হোটেলেকাজ করছি, বাজার কি করে করতে হয় ভাল করে শিখে ফেলেছি। চক্কত্তি মশায়েরচেয়েও আমি ভাল বাজার করতে পারি। মাখনপুরের হাট থেকে ফি হাট্‌রা যদিতরিতরকারী কিনে আনি তবে রাণাঘাটের বাজারের চেয়ে টাকায় চার আনা ছ'আনাসস্তা পড়ে। এ ধরো কম লাভ নয় একটা হোটেলের ব্যাপারে। বাজার করবার মধ্যেই হোটেলের কাজের আদ্ধেক লাভ। আমার খুব মনে জোর আছে কুসুম, টাকা পয়সা হাতে যদি কখনো পড়ে, তবে হোটেল যা চালাবো, বাজারের সেরা হোটেল হবে, তুইদেখে নিস্।

কুসুম হাজারি ঠাকুরের এ দীর্ঘ বক্তৃতা অবাক হইয়া শুনিতেছিল—সে হাজারিকেবাবার মত দেখে বলিয়াই মেয়ের মত বাবার প্রতি সর্বপ্রকার কাল্পনিক গুণ ও জ্ঞানের আরোপ করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ব্যাপারের সে বিশেষ কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাবাঠাকুর যে বুদ্ধিমান, তাহা সে হাজারির বক্তৃতা হইতে ধারণা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে বলিল—আমার এক জোড়া রুলি ছিল, এক গাছা বিক্রী করে দিয়েছি আমার ছোট ছেলের অসুখের সময় আর বছর। আর এক গাছা আছে। বিক্রী করলে ষাট-সত্তর টাকা হবে। আপনি নেবেন বাবাঠাকুর? ওই টাকা নিয়েহোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি হাসিয়া বলিল—দূর পাগলী! যাট টাকায় হোটেল হবে কি করে?

—কত টাকা হলে হয়?

—অন্তত দুশো টাকার কম তো নয়। তাতেও হবে না।

—আচ্ছা, হিসেব করে দেখুন না বাবাঠাকুর।

—হিসেব করে দেখব কি, হিসেব আমার মুখে-মুখে। ধরো গিয়ে দুটো বড় ডেক্‌চি, ছোট ডেক্‌চি তিনটে। থালা-বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চামচে, চায়ের বাসন।বাইরে গদির ঘরের একখানা তক্তপোশ, বিছানা, তাকিয়া। বাক্স, খেরো বাঁধানো খাতাদু'খানা। বালতি, লণ্ঠন, চাকি, বেলুন—এই সব নানান নট্‌খটি জিনিস কিনতেই তো দুশো টাকার ওপর বেরিয়ে যাবে। পাঁচদিনের বাজার খরচ হাতে করে নিয়ে নামতে হবে। চাকর-ঠাকুরের দু'মাসের মাইনে হাতে রেখে দিতে হয়—যদি প্রথম দু-মাস না হোল কিছু ঠাকুর চাকরের মাইনে আসবে কোথা থেকে? সে-সব যাক্‌-গে, তা ছাড়াতোর টাকা নেবোই বা কেন?

কুসুম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন—ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্যি বাবাঠাকুর। সে ভাগ্যিথাকলে তো হবে, আমার অত টাকা যখন নেই, তখন আর সে কথা বলছি কি করেবলুন! যা আছে, ওতে যদি কখনো-সখনো কোন দরকার পড়ে আপনার মেয়েকেজানাবেন।

হাজারি উঠিল। আর এখানে বসিয়া দেরি করিলে চলিবে না। বলিল—না রেকুসুম, ওতে আর কি হবে। আমি যাই এখন।

কুসুম বলিল—একটু কিছু মুখে না দিলে মেয়ের বাড়ী থেকে কি করে উঠবেনবাবাঠাকুর, বসুন আর একটু। আমি আসচি।

কুসুম এত দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল যে হাজারি ঠাকুর প্রতিবাদ করিবার অবসর পর্যন্ত পাইল না। একটু পরে কুসুম ঘরের মধ্যে একখানা আসন আনিয়াপাতিল এবং মেজের উপর জলের হাত বুলাইয়া লইয়া আবার বাহিরে গেল। কিছুক্ষণপরে একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবিতে পেঁপে কাটা, আমের টিক্‌লি ও দুটি সন্দেশআনিয়া আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া বলিল—একটু জল খান, বসুন এসে, আমি খাবার জল আনি। হাজারি আসনের উপর বসিল। কুসুম ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজা একটা কাঁসার গেলাসে জল আনিয়া রেকাবির পাশে রাখিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাইতে খাইতে হাজারির মনে পড়িল সেদিনকার সেই মাংসের কথা। মেয়ের মতস্নেহযত্ন করে কুসুম, তাহারই জন্য তুলিয়া রাখা মাংস কিনা খাওয়াইতে হইল চক্কত্তিমহাশয়ের গাঁজাখোর শালাকে দিয়া শুধু ওই পদ্ম ঝিয়ের জন্য। দাসত্বের এই তো সুখ!

হাজারি বলিল—তুই আমার মেয়ের মতন কুসুম-মা।

কুসুম হাসিয়া বলিল—মেয়ের মতন কেন বাবাঠাকুর, মেয়েই তো।

—ঠিক, মেয়েই তো। মেয়ে না হোলে বাপের এত যত্ন কে করে?

—যত্ন আর কি করেচি, সে ভাগ্যি ভগবান কি আমায় দিয়েছেন? একে কি যত্ন করা বলে? কাঁথাখানা পেতে শুচ্চেন বাবাঠাকুর?

—তা শুচ্চি বই কি রে। রোজ তোর কথা মনে হয় শোবার সময়। মনে ভাবি কুসুমএখানা দিয়েছে। ছেঁড়ামাদুরের কাঠি ফুটে ফুটে পিঠে দাগ হয়ে গিয়েছিল। পেতে শুয়েবেঁচেছি।

—আহা, কি যে বলেন! না, সন্দেশ দুটোই খেয়ে ফেলুন, পায়ে পড়ি। ও ফেলতেপারবেন না।

কুসুম, তোর জন্যে না রেখে খেতে পারি কিছু মা? ওটা তোর জন্যে রেখেদিলাম।

কুসুম লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হাজারি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলে বলিল—পান আনি, দাঁড়ান।

তাহার পর সামনে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া বলিল—আমার ও রুলিগাছা রইল তোলা আপনার জন্যে, বাবাঠাকুর। যখন দরকার হয়, মেয়ের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু।

সেদিন হোটেলে ফিরিয়া হাজারি দেখিল, প্রায় পনেরো সেরকি আধ মণ ময়দাচাকর আর পদ্ম ঝি মিলিয়া মাখিতেছে।

ব্যাপার কি! এত লুচির ময়দা কে খাইবে?

পদ্ম ঝি কথার সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝাঁজ মিশাইয়া বলিল—হাজারি ঠাকর, তোমারযা যা রাঁধবার আগে সেরে নাও—তারপর এই লুচিগুলো ভেজে ফেলতে হবে।আচার্যপাড়ার মহাদেব ঘোষালের বাড়ীতে খাবার যাবে, তারা অর্ডার দিয়ে গেছে সাড়েন'টার মধ্যে চাই, বুঝলে?

হাজারি ঠাকুর অবাক হইয়া বলিল—সাড়ে ন'টার মধ্যে ওই আধ মণ ময়দা ভেজেপাঠিয়ে দেবো, আবার হোটেলের রান্না রাঁধবো! কি যে বল পদ্মদিদি, তা কি করে হবে? রতন ঠাকুরকে বলো না লুচি ভেজে দিক, আমি হোটেলের রান্না রাঁধবো।

পদ্ম ঝি চোখ রাঙাইয়া ছাড়া কথা বলে না। সে গরম হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল— তোমার ইচ্ছে বা খুশিতে এখানকার কাজ চলবে না। কর্তা মশায়ের হুকুম। আমায় যা বলে গেছেন তোমায় বললাম, তিনি বড় বাজারে বেরিয়ে গেলেন—আসতে রাত হবে।এখন তোমার মর্জি—করো আর না করো।

অর্থাৎ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের এই অবিচারে হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। নিছক অবিচার ছাড়া ইহা অন্য কিছু নহে। রতন ঠাকুরকে দিয়া ইহারাসাধারণ রান্না অনায়াসেই করাইতে পারিত, কিন্তু পদ্ম ঝি তাহা হইলে খুশি হইবে না।সে যে কি বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে পদ্ম ঝিয়ের! উহাকে জব্দ করিবার কোনো ফাঁকই পদ্মছাড়ে না।

ভীষণ আগুনের তাতের মধ্যে বসিয়া রতন ঠাকুরের সঙ্গে দৈনিক রান্না-কার্যতেই প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। পদ্ম ঝি তাহার পর ভীষণ তাগাদা লাগাইল লুচি ভাজাতে হাত দিবার জন্য। পদ্ম নিজে খাটিতে রাজী নয়, সে গেল খরিদ্দারদের খাওয়ার তদারক করিতে। আজ হাটবার, বহু ব্যাপারী খরিদ্দার। রতন ঠাকুর তাহাদের পরিবেশন করিতেলাগিল। হাজারি এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইয়াই আবার আগুনের তাতে বসিয়াগেল লুচি ভাজিতে।

আধঘণ্টা পরে—তখন পাঁচ সের ময়দাও ভাজা হয় নাই—পদ্ম আসিয়া বলিল— ও ঠাকুর, লুচি হয়েচে? ওদের লোক এসেছে নিতে।

হাজারি বলিল—না এখনো হয়নি, পদ্মদিদি। একটু ঘুরে আসতে বল।

—ঘুরে আসতে বললে চলবে কেন? সাড়ে ন'টার মধ্যে ওদের খাবার তৈরি করে রাখতে হবে বলে গেছে। তোমায় বলিনি সেকথা?

—বল্লে কি হবে পদ্মদিদি? মন্তরে ভাজা হবে আধ মণ ময়দা? ন'টার সময় তোউনুনে ব্রহ্মার নেচি ফেলেচিস্ জিগ্যেস্ করো মতিকে।

—সে সব আমি জানিনে। যদি ওরা অর্ডার ফেরত দেয়, বোঝাপড়া কোরো কর্তার সঙ্গে, তোমার মাইনে থেকে আধ মণ ময়দা আর দশ সের ঘি'র দাম এক মাসে তো উঠবে না, তিন মাসে ওঠাতে হবে।

হাজারি দেখিল, কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। সে নীরবে লুচি ভাজিয়া যাইতেলাগিল। হাজারি ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস করে নাই—কাজ করিতে বসিয়া শুধু ভাবেকাজ করিয়া যাওয়াই তাহার নিয়ম—কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক। লুচি ঘিয়ে ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লুচি কাঁচাথাকিয়া যাইবে। এজন্য সে ধীরে ধীরে সময় লইয়া লুচি তুলিতে লাগিল। পদ্ম ঝি একবার বলিল—অত দেরি ক'রে খোলা নামাচ্ছ কেন ঠাকুর? হাত চালাও না—অত লুচি ডুবিয়ে রাখলে কড়া হয়ে যাবে—

হাজারি ভাবিল, একবার সে বলে যে রান্নার কাজ পদ্ম ঝিয়ের কাছে তাহাকেশিখিতে হইবে না, লুচি ডুবাইলে কড়া কি নরম হয় সে ভালই জানে, কিন্তু তখনইসে বুঝিল, পদ্ম ঝি কেন একথা বলিতেছে।

দশ সের ঘি হইতে জ্বল্‌তি বাদে যাহা বাকি থাকিবে পদ্ম ঝিয়ের লাভ। সে বাড়ী লইয়া যাইবে লুকাইয়া। কর্তামশায় পদ্ম ঝিয়ের বেলায় অন্ধ। দেখিয়াও দেখেন না।

হাজারি ভাবিল, এই সব জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খদ্দেরে পয়সাদেবে, তারা কাঁচা লুচি খাবে কেন? দশ সের ঘিয়ের দাম তো তাদের কাছ থেকে আদায়হয়েচে, তবে তা থেকে বাঁচানোই বা কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভাল হয়, তাই তো দেখতে হবে? পদ্ম ঝি বাড়ী নিয়ে যাবে বলে তারা দশ সের ঘিয়ের ব্যবস্থা করে নি।

পরক্ষণেই তাহার নিজের স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া গেল।

এই রেল-বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি যাহাকেবলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খদ্দের যে জিনিসের অর্ডার দিবে, তাহার মধ্যে চুরিসে করিবে না। খদ্দের সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাঁধিবে, খাওয়াইয়া সকলকেসন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।

লুচি ভাজা ঘিয়ের বুদ্বুদের মধ্যে হাজারি ঠাকুর যেন সেই ভবিষ্যৎ হোটেলের ছবিদেখিতে পাইতেছে। প্রত্যেক ঘিয়ের বুদ্বুদটাতে। পদ্ম ঝি সেখানে নাই, বেচু চক্কত্তির গাঁজাখোর ও মাতাল শালাও নাই। বাহিরে গদির ঘরেদিব্য ফর্সা বিছানা পাতা, খদ্দের যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুক, তামাক খাইতে ইচ্ছা করে খাক, বাড়তি পয়সা আরএকটিও দিতে হইবে না। দুইটা করিয়া মাছ, হপ্তায় তিন দিন মাংস বাঁধা-খদ্দেরদের। এসব না করিয়া শুধু ইস্টিশনের প্লাটফর্মে—হি-ই-ই-ন্দু হোটেল, হি-ই-ই-ন্দু হোটেল, বলিয়া মতি চাকরের মত চেঁচাইয়া গলা ফাটাইলে কি খদ্দের ভিড়িবে?

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, তোমার হোল? হাত চালিয়ে নিতে পাচ্ছ না? বাবুদের নোক যে বসে আছে।

বলিয়াই ময়দার বারকোশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা লুচি যতগুলি ছিল, হাজারি প্রায় সব খোলায় চাপাইয়া দিয়াছে—খান পনেরো কুড়ির বেশী বারকোশে নাই। মতি চাকর পদ্ম ঝিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে লাগিল।

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার হাত চলচে না, না? এখনো দশ সের ময়দার তালডাঙায়, ওই রকম করে লুচি বেললে কখন কি হবে?

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, রাত এগারোটা বাজবে ওই লুচি বেলতে আর এক হাতে ভাজতে। তুমি বেলবার লোক দাও।

পদ্ম ঝি মুখ নাড়িয়া বলিল—আমি ভাড়া করে আনি বেলবার লোক তোমারজন্যে! ও আমার বাবু রে! ভাজতে হয় ভাজো, না হয় না ভাজো গে—ফেরত গেলে তখন কর্তামশায় তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এখন।

পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

মতি চাকর বলিল—ঠাকুর, তুমি লুচি ভেজে উঠতে পারবে কি করে? লুচি পোড়াবে না। এত ময়দার তাল আমি বেলবো কখন বলো।

হঠাৎ হাজারির মনে হইল, একজন মানুষ এখনি তাহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া যাইত—কুসুম! কিন্তু সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের ঘরের বৌ—তাহাকে তো এখানেআনা যায় না। যদিও ইহা ঠিক, খবর পাঠাইয়া তাহার বিপদ জানাইলে কুসুম এখনি ছুটিয়া আসিত।

তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই—দেখিয়াছে শুধুলুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাখারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাঙারাঙা লুচির গোছা—তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভীষণ আগুনের তাত, মাজা পিঠ বিষম টন্‌টন্‌ করিতেছে, ঘাম ঝরিয়া কাপড় ও গামছা ভিজিয়া গিয়াছে, এক ছিলিম তামাক খাইবারও অবকাশ নাই—শুধু কাঁচা লুচি কড়ায় ফেলা এবং ভাজিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া পাশের ধামাতে রাখা।

রাত দশটা।

মুর্শিদাবাদের গাড়ী আসিবার সময় হইল।

মতি চাকর বলিল—আমি একবার ইস্টিশনে যাই ঠাকুরমশায়। টেরেনের টাইমহয়েচে। খদ্দের না আনলে কাল কর্তামশায়ের কাছে মার খেতে হবে। একটা বিড়িখেয়ে যাই।

ঠিক কথা, সে খানিকক্ষণ প্লাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' বলিয়া চেঁচাইবে। মুর্শিদাবাদের ট্রেন আসিতে আর মিনিট পনেরোবাকি।

হাজারি বলিল—একা আমি বেলবো আর ভাজবো! তুই কি খেপলি মতি? দেখলিতো এদের কাণ্ড। রতনঠাকুর সরে পড়েছে, পদ্মদিদিও বোধ হয় সরে পড়েছে। আমি একা কি করি?

মতি বলিল—তোমাকে পদ্মদিদি দু-চোখে দেখতে পারে না। কারো কাছে বোলোনা ঠাকুর—এ সব তারই কারসাজি। তোমাকে জব্দ করবার মতলবে এ কাজ করেচে। আমি যাই, নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

মতি চলিয়া গেল। অন্তত পাঁচ সের ময়দার তাল তখনও বাকি। লেচি পাকানো সে-ও প্রায় দেড় সের—হাজারি গুনিয়া দেখিল ষোল গণ্ডা লেচি। অসম্ভব ! একজনমানুষের দ্বারা কি করিয়া রাত বারোটার কমে বেলা এবং ভাজা দুই কাজ হইতে পারে!

মতি চলিয়া যাইবার সময় যে বিড়িটা দিয়া গিয়াছিল সেটি তখনও ফুরায় নাই— এমন সময় পদ্ম উঁকি মারিয়া বলিল—কেবল বিড়ি খাওয়া আর কেবল বিড়ি খাওয়া! ওদিকে বাবুর বাড়ী থেকে লোক দু-বার ফিরে গেল—তখনি তো বলেচি হাজারি ঠাকুরকেদিয়ে এ কাজ হবে না—বলি বিড়িটা ফেলে কাজে হাত দেও না, রাত কি আর আছে?

হাজারি ঠাকুর সত্যই কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিড়ি ফেলিয়া দিল। পদ্ম ঝিয়ের সামনেসে একথা বলিতে পারিল না যে, লুচি বেলিবার লোক নাই। আবার সে লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল একাই।

রাত এগারোটার বেশী দেরি নাই। হাজারির এখন মনে হইল যে, সে আর বসিতেপারিতেছে না। কেবলই এই সময়টা মনে আসিতেছিল দুটি মুখ। একটি মুখ তাহারনিজের মেয়ে টেঁপির—বছর বারো বয়স, বাড়ীতে আছে; প্রায় পাঁচ ছ'মাস তার সঙ্গেদেখা হয় নাই—আর একটি মুখ কুসুমের। ওবেলা কুসুমের সেই যত্ন করিয়া বসাইয়াজল খাওয়ানো...তার সেই হাসিমুখ...টেঁপির মুখ আর কুসুমের মুখ এক হইয়া গিয়াছে...লুচিও ঘিয়ের বুদ্বুদে সে তখনও যেন একখানা মুখই দেখিতে পাইতেছে—টেঁপি ও কুসুমদুইয়ে মিলিয়া এক...ওরা আজ যদি দু'জনে এখানে থাকিত। ওদিকে কুসুম বসিয়া হাসিমুখে লুচি বেলিতেছে এদিকে টেঁপি...

—ঠাকুর!

স্বয়ং কর্তামশায়, বেচু চক্কত্তি। পিছনে পদ্ম ঝি। পদ্ম ঝি বলিল—ও গাঁজাখোরঠাকুরকে দিয়ে হবে না আপনাকে তখুনি বলিনি বাবু? ও গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, দেখছো না? কাজ এগুবে কোত্থেকে!

হাজারি তটস্থ হইয়া আরও তাড়াতাড়ি লুচি খোলা হইতে তুলিতে লাগিল। বাবুদেরলোক আসিয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম ঝি যে লুচি ভাজা হইয়াছিল, তাহাদের ওজন করিয়া দিল কর্তাবাবুর সামনে। পাঁচ সের ময়দার লুচি বাকি থাকিলেও তাহারা লইল না, এতরাত্রে লইয়া গিয়া কোনো কাজ হইবে না।

বেচু চক্কত্তি হাজারিকে বলিলেন—ওই ঘি আর ময়দার দাম তোমার মাইনে থেকেকাটা যাবে। গাঁজাখোর মানুষকে দিয়ে কি কাজ হয়?

হাজারি বলিল—আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। কেউ তো বেলে দিতে আসেনি এক মতি চাকর ছাড়া। সেও গাড়ীর টাইমে ইস্টিশানে খদ্দের আনতে গেল, আমি কি করবো বাবু!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সেসব শুনচি নে ঠাকুর। ওর দাম তুমি দেবে। খদ্দেরঅর্ডার ফেরত দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারিনে, আর মাখা নেচিকাটা ময়দা।

হাজারি ভাবিল, বেশ, তাহাকে যদি এদের দাম দিতে হয়, লুচি ভাজিয়া সে নিজেলইবে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত খাটিয়া ও মতি চাকরকে কিছু অংশ দিবার জন্যলোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া লুচি বেলাইয়া সব ময়দা ভাজিয়া তুলিল। মতি তাহারঅংশ লইয়া চলিয়া গেল। এখনও তিন চার ঝুড়ি লুচি মজুত।

পদ্ম ঝি উঁকি মারিয়া বলিল—লুচি ভাজচো এখনও বসে? আমাকে খানকতক দাও দিকি—

বলিয়া নিজেই একখানা গামছা পাতিয়া নিজের হাতে খান পঁচিশ-ত্রিশ গরম লুচিতুলিয়া লইল। হাজারি মুখ ফুটিয়া বারণ করিতে পারিল না। সাহসে কুলাইল না। অনেক রাত্রে সুপ্তোত্থিতা কুসুম চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের দরজা খুলিয়াসম্মুখে মস্ত এক পোঁটলা-হাতে-ঝোলানো অবস্থায় হাজারি ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়েরসুরে বলিল—কি বাবাঠাকুর, কি মনে করে এত রাত্রে?...

হাজারি বলিল—এতে লুচি আছে মা কুসুম। হোটেলে লুচি ভাজতে দিয়েছিলখদ্দেরে। বেলে দেবার লোক নেই—শেষকালে খদ্দের পাঁচ সের ময়দার লুচি নিলে না, কর্তাবাবু বলেন, আমায় তার দাম দিতে হবে। বেশ আমায় দাম দিতে হয় আমিই নিয়ে নিই। তাই তোমার জন্যে বলি নিয়ে যাই, কুসুমকে তো কিছু দেওয়া হয় না কখনো।রাত বড্ড হয়ে গিয়েচে—ঘুমিয়েছিলে বুঝি? ধর তো মা বোঁচকাটা রাখো গে যাও।

কুসুম বোঁচকাটা হাজারির হাত হইতে নামাইয়া লইল। সে একটু অবাক হইয়াগিয়াছে, বাবাঠাকুর পাগল, নতুবা এত রাত্রে—(তাহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে), এখন আসিয়াছে লুচির বোঁচকা লইয়া।

হাজারি বলিল, আমি যাই মা—লুচি গরম আর টাট্‌কা, এই ভেজে তুলিচি।তুমিখানকতক খেয়ে ফেলো গিয়ে এখনি। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে। আর ছেলেপিলেদেরদাও গিয়ে। কত আর রাত হয়েছে সাড়ে বারোটার বেশী নয়।

হোটেলে ফিরিয়া হাজারি ঠাকুর একটি দুঃসাহসের কাজ করিল।

মতি চাকর পূর্ব হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তুলিয়া বলিল—মতি, আমি রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাচ্চি। এত লুচি কি হবে, বাড়ীতে দিয়ে আসি। তুমিথাকো, আমি কাল সকাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না করবো, কর্তা মশায়কে বোলো।

মতি অবাক হইয়া বলিল—এত রাত্রে লুচি নিয়ে বাড়ী রওনা হবে!

—এত লুচি কি হবে? এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমারজিনিস নিজের বাড়ী দিয়ে আসি। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না,তাদের দিয়ে আসি। ছ'টা পয়সা তো খরচ।

হাজারি আর ঘুমাইল না। টেঁপির জন্য তার মন-কেমন করিয়া উঠিয়াছে। কুসুমযেমন, টেঁপিও তেমন। আরও দু'টি ছেলে আছে ছোট ছোট। তাদের মুখ বঞ্চিত করিয়াএত লুচি এখানে রাখিয়া পদ্ম ঝি আর কর্তামশায়ের বাড়ীতে খাওয়াইয়া কোন লাভনাই।

রাত সাড়ে তিনটার সময় গাংনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাজারি নিজের গ্রামের পথধরিল এবং সাড়ে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বগ্রামে পৌঁছিল।

এড়োশোলা এক সময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—এখন পূর্বের শ্রী নাই। গ্রামের জমিদারকর বাবুরা এখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়াতে গ্রামের মাইনর স্কুলটিরঅবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এখান হইতে বাস উঠাইয়া কেহ রাণাঘাট, কেহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। নিতান্তনিরুপায় যারা তারাই গ্রামে পড়িয়া আছে।

হাজারির বাড়ীতে দু-খানা খড়ের ঘর। ছোট্ট উঠান, একদিকে কাঁঠাল গাছ, অন্যদিকেএকটা সজ্‌নে গাছ এবং একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছটা হাজারির মা নিজেরহাতে পুঁতিয়াছিলেন—বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়, কাশীর পেয়ারার বীজের চারা।

হাজারির ডাকাডাকিতে হাজারির স্ত্রী উঠিয়া দোর খুলিয়া, এ অবস্থায় স্বামীকেদেখিয়া বলিল—এসো, এসো। শেষ রাতের গাড়িতে এলে কেন গো? এই দূরান্তররাস্তা, অন্ধকার রাত—আবার বড্ড সাপের ভয় হয়েছে—সাপের কামড়ে দু-তিনটিমানুষ মরে গিয়েছে এর মধ্যে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—আমাদের গাঁয়ে নয়—নতুন কাওরা পাড়ায় একটা মরেচে আর বামুন পাড়ায়—শুনচি একটা অত বড় বোঁচকাতে কি গো?

হাজারি লুচির আসল ইতিহাস কিছু বলিল না। স্ত্রীর আনন্দপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরেসে কেবল বলিল—পেয়েছি গো পেয়েছি। ভগবান দিয়েছেন, সবাই মিলে খেয়ে নাওমজা করে। টেঁপিকে খুব করে খাওয়াও, ও পেট ভরে খাবে আমি দেখি।

সেদিন সকালের গাড়ীতে হাজারি রাণাঘাটে ফিরিতে পারিল না।

দুপুরের পরে হাজারি কুসুমের বাপের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

এই গ্রামেই গোয়ালপাড়ায় কুসুমের জ্যাঠামশায় হরি ঘোষের বাস। অবস্থা এক সময় যথেষ্ট ভাল ছিল, এখনও বাড়ীতে গোহাল-পোরা গরুর মধ্যে আট-দশটি অবশিষ্ট আছে, দুটি ছোট ছোট ধানের গোলাও বজায় আছে।

হাজারিকে হরি ঘোষ খুব খাতির করিয়া খেজুর পাতার চটে বসিতে দিল। বলিল— কবে আলেন বাবাঠাকুর? সব ভালো?

—তোমরা সব ভাল আছ?

—আপনার ছিচরণের আশিব্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে। রাণাঘাটেই কাজ কচ্চেন তো?

—হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো এলাম।

—আমাদের কুসুমের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

হাজারি পাড়াগাঁয়ের লোক, এখানকার লোকের ধাত চেনে। কুসুমের সঙ্গে সর্বদা দেখাশোনা বা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টানের কোন পরিচয় সে এখানে দিতে চায়না।ইহারা হয়তো সহজ ভাবে সেটা গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়াগেলে লোকে নানারূপ কদর্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইতে। সুতরাংসে বলিল—হ্যাঁ, —দু-একবার হয়েছিল। ভাল আছে।

—এবার যদি দেখা হয়, একবার আসতে বলবেন ইদিকে। তার গাঁয়ে আসবারদিকে তত টান নেই, শহরে দুধ বেচে চালানো যে কি মিষ্টি লেগেছে!

হাজারি কথার গতি অন্য দিকে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—এবার আবাদপত্র কিরকম হোল বল?

—ধানের আবাদ করিচি বারো বিঘে আর বাকি সব তরকারি। কুমড়ো দু-বিঘে, আলু, পেঁয়াজ,—তা এবার আকাশের অবস্থা ভাল না বাবাঠাকুর, ক্ষেতে মাটি ফেটেযাচ্চে!

তরকারির কথায় হাজারির নিজের গোপনীয় উচ্চাশার কথা মনে পড়িল। তরকারি তাহার গ্রাম হইতে কিনিলে রাণাঘাট বাজারের চেয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এখান হইতেই সে আনাজপত্র লইয়া যাইবে।

হরি ঘোষকে বলিল—আচ্ছা, তোমাদের আলু ক'মণ হতে পারে?

—বাবাঠাকুর তার কি কোন ঠিক আছে? তবে ত্রিশ-চল্লিশ মণ খুব হবে।

—তুমি সমস্ত আলু আমায় দিতে পারবে? নগদ দাম দেবো।

হরি ঘোষ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বাবাঠাকুর, আজকাল কাঁচামালেরব্যবসা করচেন নাকি?

—ব্যবসা এখনও করিনি, তবে করবো ভাবচি। সে তোমায় বলব একদিন।

গোয়ালাপাড়া হইতে আসিবার পথে একটা খুব বড় বাঁশবনের মাঝখান দিয়া পথ।এখানে লোকজন নাই, এড়োশোলা গ্রামেই লোকজনের বসত নাই। আগে ছিল—ম্যালেরিয়ায় মরিয়া হাজিয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধুই বড় বড় আম-কাঁঠালেরবাগান ও বাঁশবনের জঙ্গল।

এই বাঁশবনের মধ্যে পুরোনো দিনে পালিত-পাড়া ছিল, হাজারি বাল্যকালেও দেখিয়াছে। পালিতেরা বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল গ্রামের মধ্যে, পূজাপার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব পর্যন্ত হইয়াছে রাজেন পালিতের বাড়ী। এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিতদের ভিটাটাপড়িয়া আছে এই পর্যন্ত। দিনমানেই বোধ হয় বাঘ লুকাইয়া থাকে।

ঝাঁশঝাড়ে কট্-কট্ করিয়া শুকনো বাঁশের শব্দ হইতেছে—ঘন ছায়া, শুকনো বাঁশ-পাতার ও সোলার শব্দ। ফিঙ্গে, শালিখ পাখীর কলরব। হাজারির মনে হইল, আজ যেন তার হোটেলের দাসত্ব-জীবন হইতে মুক্তির দিন। সেই ভীষণ গরম উনুনের সামনেবসিয়া আজ আর তাকে ডেক্‌চিতে ভাত-ডাল রান্না করিতে হইবে না। পদ্ম ঝিয়েরকড়া তাগাদা ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে হইবে না। বাঁশবনের ছায়ায় পূর্ণ শান্তিতে সে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়—তাহা হইলেও কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

এই মুক্তি সে ভাল ভাবেই আস্বাদ করিতে চায় বলিয়াই তো হোটেল খুলিবার কথা এত ভাবে।

সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এইবার কিছু টাকা হইলেই সে রাণাঘাটেরবাজারে হোটেল খুলিয়া দিতে পারে।

হাজারি সত্যই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, টাকা কোথায় ধার পাওয়া যাইতেপারে। এক গ্রামের গসাঁইরা বড়লোক, কিন্তু তাহারা প্রায় সবাই থাকে কলিকাতায়। এখানে বৃদ্ধ কেশব গসাঁই থাকেন বটে—কিন্তু লোকটা ভয়ানক কৃপণ—তিনি কি হাজারির মত সামান্য লোককে বিনা বন্ধকে, বিনা জামিনে টাকা ধার দিবেন?

হাজারির জামিন হইবেই বা কে!

তাহার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। দু'খানা মাত্র চালাঘর। রান্নাঘরখানা গত বর্ষায়পড়িয়া গিয়াছে—পয়সা অভাবে সারানো হয় নাই, উঠানের আমতলায় রান্না হয়—বৃষ্টির দিন এখন ক্রমশ চলিয়া গেল, এখন তত অসুবিধা হয় না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

হাজারি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার ছোট মেয়ে টেঁপি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উলবুনিতেছে। টেঁপি বাবাকে দেখিয়া বলিল—তোমার জন্য আসন বুনচি বাবা—কাল তুমিযদি থাকো, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

হাজারি মনে মনে হাসিল। বেচু চক্কত্তির হোটেলে সে রঙীন পশমের আসন পাতিয়াখাইতে বসিয়াছে—ছবিটি বেশ বটে। পদ্ম ঝি কি মন্তব্য করিবে তাহা হইলে?

মেয়েকে বলিল—দেখি কেমন আসন? বাঃ বেশ হচ্ছে তো, কোথায় শিখলি তুইবুনতে?

টেঁপি বলিল—মুখুয্যে-বাড়ীর নীলা-দি আর অতসী-দির কাছে। আমি রোজ যাইদুপুরে, ওরা আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়।

—ওরা এখনও আছে? হরিচরণবাবু চলে যাননি এখনও?

—ওরা নাকি এ মাসটা থাকবে। থাকলে তো আমারই ভাল—আমি কাজটা শিখেনিতে পারি। কি চমৎকার গান গাইতে পারে অতসী-দি! আজ শুনবে বাবা?

—তুই গান শিখলি কিছু?

টেঁপি লাজুক সুরে বলিল—দু-একটা। সে কিছু নয়। তুমি অতসী-দির গান যদি শোনো, তবে বলবে যে কলের গানের রেকর্ড শুনচি। ওদের বাড়ী খুব বড় কলের গানও আছে। রোজ সন্ধ্যের পর বাজায়। কত রকমের গান আছে—যাবে শুনতে সন্ধ্যের পর? অতসী-দি নিজে কল বাজায়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে-অতসীদিকে বলবো বাবা এসেচে, ভালো ভালো বেছে গান দেবে।

হাজারি বলিল—হ্যাঁরে, হরিচরণবাবুর শরীর সেরেচে, জানিস্?

—তা তো জানিনে, তবে তিনি বৈঠকখানায় বসে রোজই তো সবার সঙ্গে গল্পকরেন। একদিন বৈঠকখানায় কলের গান বাজিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্তন!

সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি বর্তমানে হাজারির তত আগ্রহ নাই, হাজারির উদ্দেশ্য হরিচরণবাবুকে বলিয়া কহিয়া অন্ততশ'দুই টাকা ধার করা যায় কিনা, সেদিকে।

হরিচরণ মুখুয্যে মহাশয় এ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্তলোক। তাঁহারা এ গ্রামের জমিদার—কিন্তু অনেক দিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন। প্রকাণ্ড তিন-মহলা বাড়ী পড়িয়া আছে, দু-একজন বৃদ্ধা পিসী-মাসী ছাড়া বাড়ীতে আরকেহ এতদিন ছিল না।

আজ মাস চার-পাঁচ হইল হরিচরণ মুখুয্যের একমাত্র পুত্র কলিকাতায় মারা যায়বসন্ত রোগে। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই আজ প্রায় তিন মাস হইল হরিচরণবাবুসপরিবারে দেশের বাটীতে আসিয়া যে কেন বাস করিতেছেন—সে খবর হাজারি রাখেনা।তবে ইহা জানে যে, হরিচরণবাবু গ্রামের উত্তর মাঠে একটি দীঘি খনন করিবারজন্য জেলা বোর্ডের হাতে অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন এবং পুত্রের নামে একটিডিস্‌পেন্‌সারী করিয়া দিবেন গ্রামে। হরিচরণবাবু কারো বাড়ী যান না। নিজের বৈঠকখানায়বসিয়া আছেন সব সময়। তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী এখানেই, তাছাড়া চাকর-বাকর ওদু'জন দরওয়ান আছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পর সাহসে ভর করিয়া হাজারি হরিচরণবাবুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানারউঠানে গিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে বড় বড় থামওয়ালা সাদা মার্বেলপাথর বাঁধানো বারান্দা। বারান্দার সামনে একটা মাঝারি গোছের কামরা, পাশে একটা ছোট কামরা, পূর্বে নবীনবাবু বলিয়া ইহাদের এক শরিক বড় বৈঠকখানার পাশে পৃথক ভাবে নিজের জন্য আর একটি বৈঠকখানা তৈরী করিয়াছিলেন—তিনি আজ পঁচিশবৎসর হইল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে, উক্ত বৈঠকখানা ঘর বর্তমানে বিচালিরাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাজারি টেঁপিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। টেঁপি বলিল—বাবা তুমি বোসো, আমি অতসী-দিকে বলিগে তুমি এসেছ কলের গান শুনতে। এখুনি দেবে গান।

বৈঠকখানার সামনে হাজারিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া টেঁপি পাশের ছোট্ট দরজা দিয়াবাড়ীর মধ্যে সরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে তেলের চৌপায়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ইহা সাবেকী কালের বন্দোবস্ত, এখনও ঠিক বজায় আছে। হাজারি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছে ঘরে ঢুকিবেকিনা, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে স্বয়ং হরিচরণবাবু বারান্দায় বাহির হইয়াই সামনে হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—কে?

হাজারি বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু, আমি হাজারি—

—ও, হাজারি! কি মনে করে, এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের মধ্যেএসো। মাস-দুই তোমায় দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে, আমার বড়মেয়ে অতসীর সঙ্গে তার বেশ ভাব।

হরিচরণবাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, গৌরবর্ণ, লম্বা আড়ার চেহারা, বড় বড়চোখ—গলার স্বর গম্ভীর। তিনি খুব শৌখীন লোক ছিলেন। এখনও এই বয়সেও এবং ছেলে মারা যাওয়া সত্ত্বেও বেশ শৌখীনতা ও সুরুচির পরিচয় আছে তাঁর আটপৌরেপোশাকেও।

হাজারি আসলে আসিয়াছে টাকা ধার করিবার কথা বলিতে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরেঢুকিয়া প্রকাণ্ড বড় সেকেলে প্রমাণ সাইজের আয়নাখানায় নিজের আপাদ-মস্তক দেখিয়াইতাহার সাহসটুকু উবিয়া গেল।

হরিচরণবাবুর নির্দেশমত সে একখানা চেয়ারে বসিল।হরিচরণবাবু বলিলেন—চা খাবে হাজারি?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চা আমি—থাক্‌গে, সে কেনআবার কষ্ট—

হরিচরণবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমি তো চা খাবোই এখন, দাঁড়াও আনতে বলি—

এই সময় টেঁপি বৈঠকখানার যে দোর অন্তঃপুরের দিকে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।হরিচরণবাবুকে বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়াও সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল—বাবা দাঁড়াও, অতসী-দি কলের গান বাজাচ্চে—আমি বলেচি আমার বাবা তোমাদের কলের গান শুনতে এসেচে—

হরিচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন—কলের গান শুনতে এসেচ হাজারি! তা আমাকে বলতে হয় এতক্ষণ। শুনতে আসবে এর আর কথা কি? তোমরা দু-পাঁচজন আসো-যাও, বড় আনন্দের কথা। গ্রাম তো লোকশূন্য হয়ে পড়েচে।ওরে খুকি, তোর বাবার জন্যে আর আমার জন্যে দু' পেয়ালা চা আনতে বলে দে তোর অতসী-দিদিকে।

হাজারি মনে মনে টেঁপির উপর চটিয়া গেল। হতভাগা মেয়েটা সব দিল মাটিকরিয়া। কে তাহাকে বলিয়াছিল কলের গান শুনিতে সে যাইতেছে মুখুয্যে বাড়ীতে? অতঃপর টাকার কথা উত্থাপন করা কি ভালো দেখায়? নাঃ, যত ছেলেমানুষ নিয়াহইয়াছে কারবার!

হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এই সময় দু-পেয়ালা চা-হাতে ঘরে ঢুকিল। প্রথমে হাজারির সামনে টেবিলে একটি পেয়ালা নামাইয়া অন্য পেয়ালাটি হরিচরণবাবুর হাতেদিল। অতসীর বয়স আঠারো-উনিশ, বেশ ধপ্‌ধপে ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী—ডাগর ডাগরচোখ—এক কথায় অতসী সুন্দরী মেয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ সহজ অনাড়ম্বর সাজগোজ, হাতে কয়েক গাছি সরু সোনার চুড়ি এবং কানে ইয়ারিং ছাড়া অলঙ্কারেরওকোন বাহুল্য নেই।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা—প্রণাম কর অতসী।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হাজারির সামনে নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলালইল। হাজারি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—থাক্ থাক্, এসো মা, রাজরাণী হও মা—এসো, কল্যাণ হোক্।

অতসীকে হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা গান শুনবেন। গ্রামোফোনটানিয়ে এসো।

অতসীর সঙ্গে টেঁপি খুব ভাব করিয়াছে। টেঁপির বাবাকে অতসী এই প্রথম দেখিল—বন্ধুর পিতা কি রকম দেখিতে, কৌতূহলের সহিত সে চাহিয়া দেখিতেছিল, বাবার কথায়বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্স বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

হরিচরণবাবু চাকরকে বলিলেন—বাজাবে কে? তোর দিদিমণি আসচে না?

—দিদিমণি যে বল্লেন আপনি বাজাবেন—

—আমি ভাল চোখে দেখতে পাব না। তাকেই পাঠিয়ে দিগে যা—।একটু পরে অতসী, টেঁপি এবং পাড়ার আরও দু-তিনটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। কলের গান বাজনা শুরু হইল এবং চলিল ঘণ্টা-দুই। আরও একবার চা দিয়া গেল চাকরে, কিন্তু পরিবেশন করিল অতসী।

সব মিটিয়া চুকিয়া যাইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল।

হাজারি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, গান শুনিতে সে এখানে আসে নাই।

গান বন্ধ হইলে অতসী, টেঁপি ও মেয়ের দল যখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, তখনহাজারি সাহসে ভর করিয়া বলিল—আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল বাবু।

হরিচরণবাবু বলিলেন—কি বলো?

—আমার কিছু টাকা দরকার, যদি আমায় কিছু ধার দিতেন, তাহলে আমার একটামস্ত বড় আশার কাজ মিটতো।

—মেয়ের বিয়ে দেবে?

—আজ্ঞে না বাবু, তা নয়, ব্যবসা করবো।

—কি ব্যবসা?

—বাবু আপনি তো জানেন আমি হোটেলে কাজ করি। আপনার কাছে লুকোবো না। আমি নিজে একটা হোটেল খুলতে চাচ্চি এবার। টাকাটা সেজন্যে দরকার।

—কত টাকা দরকার?

—অন্তত দুশো টাকা আমায় যদি দয়া করে দেন বাবু,আমার খালধারের কাঁঠাল বাগান আমি বন্দক রাখচি আপনার কাছে। এক বছর মধ্যে টাকাটা শোধ করবো।

হরিচরণবাবু ভাবিয়া বলিলেন—বাগান বন্ধক রেখে টাকা আমি দিতাম না, দিতামতো তোমাকে এমনি দিতাম, কিন্তু অত টাকা এমন সময় আমার হাতে নগদ নেই।

হাজারি এ-কথার পরে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, বিশেষত সে জানিতহরিচরণবাবু উদার মেজাজের মানুষ, সত্যবাদী লোক। টাকা হাতে থাকিলে, হাতে টাকানা থাকার কথা বলিতেন না।

অতসী আসিয়া বলিল—কাকা, আপনি একটু বসুন। টেঁপি খেতে বসেচে, মাছাড়লে না। মেয়েরা, যারা গান শুনতে এসেছিল, সবাইকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না।একটু দেরি হবে। না হয় আপনি যান, আমি ঝি'র সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এখন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, একটু বসে যাও নাহাজারি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। কেউ বড় একটা আসে না আমার এখানে—

হাজারি বসিল।

—তুমি কোথায় কোন্‌ হোটেলে কাজ করো?

—আজ্ঞে রাণাঘাটে, বেচু চক্কত্তির হোটেল, রেল-বাজারের মধ্যে।

—কত মাইনে পাও?

—বাবু সে আর বলবার কথা নয়, খাওয়া আর সাত টাকা মাসে। তাই ভাবছিলামপরের তাঁবে থাকবো না। এদিকে বয়স হলো, এইবার একটা হোটেল খুলে নিজেচালাবো।

—হোটেল চালাতে পারবে ?

—তা বাবু আপনার আশীর্বাদে একরকম সবই জানি ও-লাইনের। বাজার আর রান্না, হোটেলের দুটো মস্ত কাজ, এ যে শিখেচে, সে হোটেল খুলে লাভ করতে পারে।আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে ও দুটো কাজ শিখে নিইচি—খদ্দের কি চায় তাওজানি। চাকরি করি রাঁধুনীর বটে বাবু কিন্তু আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, আপনারআশীর্বাদে চোখ-কান খুলে কাজ করি।

—বেশ ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হাজারি তাহার বহুদিনের আশা ও সাধ একটি 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল'প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। চূর্ণীনদীর ধারে বসিয়া অবসর মুহূর্তে তাহার সেস্বপ্ন দেখার কথাও গোপন করিল না। তাহার রান্না খাইয়া কলিকাতার বাবুরা কি রকমসুখ্যাতি করিয়াছে, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তাহাকে ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা, কিছুই বাদদিল না।

হরিচরণবাবু বলিলেন—দেখো হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েচেএকটা কিছু গড়ে তুলবো। এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারাযাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সব-কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর যেন কিছুকরবার নেই, করে কি হবে, কার জন্যে করবো এই সব কথা মনে ওঠে। তা ছাড়াজীবনে কখনোই কিছু দরকার হয়নি। বাবার সম্পত্তি ছিল যথেষ্ট—নতুন কিছু গড়েতুলবো এ ইচ্ছে কোনদিন জাগেনি। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, ওই একটা আশাই তোমায় যুবক করে রেখে দেবে যে! আমার মাথায় এত পাকা চুল ছিল না। খোকা মারা যাওয়ার পরে জীবনের উদ্যম, আশা-ভরসা যেমন চলে গেল, অমনি মাথার চুলও পেকে উঠলো। তবে এখন ইচ্ছে আছে খোকার নামে একটা স্কুল করে দেবো। আবার ভাবি, স্কুলে পড়াবেই বা কে ?আমাদের এ অঞ্চলে তো লোকের বাস নেই। তার চেয়েহয় একটা ডাক্তারখানা করে দিই। উদ্যমই জীবনের সবটুকু, যার জীবনে আশা নেই, যা কিছু করার ছিল সব হয়ে গেছে—তার জীবন বড় কষ্টকর। যেমন ধরো দাঁড়িয়েচে আমার। খোকা মারা না গেলে আজ আমার ভাবনা হে হাজারি! ভেবেছিলুম কয়লার খনি ইজারা নেবো—কত উৎসাহ ছিল। এখন মনে হয় কার জন্যে করবো ?তাই বলছিলুম, তোমায় দেখে হিংসে হয়। তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে— আমার তা নেই। আর এই দেখো, এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি আছি পড়ে, ভালো লাগে কি? ভালো লাগে না, কখনো থাকিনি, কিন্তু বাইরেও আর হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না। ওই মেয়েটা আছে, কলের গান এনেচে একটা—বাজায়, আমি শুনি। ওর মায়ের জন্যে বেছে বেছে ভক্তি আর দেহতত্ত্বের গান কিনে দিইচি, যদি তা শুনেতাঁর মনটা একটু ভাল থাকে। মেয়েমানুষ, কষ্টটা লেগেছে তাঁর অনেক বেশী।

হাজারি এই দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা তেমন বুঝিল না—কেবল বুঝিল, পুত্রশোকেবৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে সহানুভূতিসূচক দু-চার কথা বলিল। বেশী কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া গুছাইয়াবলিতে কখনো সে শেখে নাই, তবুও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের জন্য তাহার সত্যকার দুঃখ হওয়াতে, ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে বানাইয়া কিছু বলিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—আর একটু চা খাবে ?

—আজ্ঞে না। চা খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই, আপনি খান বাবু।

এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—বাবা, যাবে?

হাজারি হরিচরণবাবুর কাছে বিদায় লইয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ভড়েদের বাড়ীর উঠানে রাঙাকাঠ কাটিয়াছে—রাঙাকাঠের গন্ধবাহির হইতেছে। সিধু ভড় দাওয়ায় জাল বুনিতেছিল, বলিল—দা-ঠাকুর কনে ছেলেনএত রাত অব্‌দি?

হাজারি বলিল—বাবুর বাড়ী। বাবু ছাড়েন না কিছুতে, চা খাও, কলের গান শোন, শেষে তো টেঁপিকে না খাইয়ে ছাড়লেন না গিন্নীমা। হাজারির বড় ভাল লাগিয়াছিল আজ সন্ধ্যাটা। বড়লোকের বৈঠকখানায় এমন ভাবে বসিয়া চা সে কখনো খায় নাই, খাতির করিয়া তাহার সঙ্গে কোনো বড়লোকে মনের কথাও কখনো বলে নাই। কলের গান তো আছেই। মেয়েকে বলিল—টেঁপি কি খেলি রে? টেঁপি একটু ভোজনপ্রিয়।খাইতে ভালবাসে আর গরীবের মেয়ে বলিয়াই অতসীর মা তাহাকে না খাওয়াইয়াছাড়েন না। বলিল—পরোটা, মাছের ডালনা, সুজি, পটলভাজা, আলুভাজা—

হাজারির স্ত্রী অনেকক্ষণ রান্না সারিয়া বসিয়া আছে, বলিল—এত রাত্তির পজ্জন্ত ছিলে কোথায় সব? পাড়া বেড়ানো শেষ হয় না যে তোমাদের, বসে বসে কেবল ঘুমআসচে—

টেঁপি বলিল—আমি খেয়ে এসেছি মা, অতসী-দিদির মা ছাড়লেন না কিছুতে।আমি কিছু খাবো না।

—হাঁরে, তুই খেয়ে এলি! ওবেলার সেই বাসি লুচি তোর জন্যে রয়েচে যে! লুচিখাবি না?

অনেকদিন ইহাদের সংসারে এমন সচ্ছলতা হয় নাই যে, লুচি ফেলিয়া ছড়াইয়াছেলেমেয়েরা খাইতে পায়। বলিয়াও সুখ।

টেঁপি বলিল—তুমি খাও মা। আমি খুব খেয়ে এসেচি।সেখানেও পরোটা, সুজি, মাছের ডাল্না, এই সব খাইয়েচে। আজ দিনটা বেশ কাটল—না মা? ভাল খাওয়া সকাল থেকে শুরু হয়েচে আর রাত পর্যন্ত চলেচে।

আহারাদি শেষ করিয়া হাজারি বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

হরিচরণবাবুর কথায় তাহার অনেকখানি উৎসাহ আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

লুচি! টেঁপি কত লুচি খাইতে পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার এই সবলোভাতুর ছেলে-মেয়ের মুখে ভাল খাবার-দাবার সে দিতে পারে না—কিন্তু যাতেপারে সে চেষ্টা করিবার জন্যই তো সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

হরিচরণবাবুর টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহার মত লোভাতুর ছেলে-মেয়ে নাই তাঁহারঘরে, কাহাদের মুখে সুখাদ্য তুলিয়া দিবার আশায় তিনি খাটিবেন?

আজ হরিচরণবাবুর নিকট হইতে সে টাকা ধার পায় নাই বটে, কিন্তু এমন একটাজিনিস পাইয়া আসিয়াছে, যাহার মূল্য টাকা-কড়ির চেয়ে বেশী।

তাহার সংসারে ছেলে-মেয়ে আছে, টেঁপি আছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পায়ে বল আসিবে, মনে জোর পাইবে। হরিচরণবাবুর জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ছেচল্লিশ হইলে কি হয়, টেঁপি যে ছেলেমানুষ। তাহার নিজেরসুখ কিসের? টেঁপিকে একখানা ভাল শাড়ী কিনিয়া দিলে ওর মুখে যে হাসি ফুটিবে, সেই হাসি তাহাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে কর্মের পথে।

আহা, যদি এমন কখনো হয়।

যদি টেঁপিকে একটা কলের গান কিনিয়া দেওয়া যায়? গান এত ভালবাসে যখন..

হয়তো স্বপ্ন...কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ। দেখা যাক্ না কি হয়।

বাঁশঝাড়ে শন্‌শন্ শব্দ হইতেছে। রাত অনেক হইয়াছে। গ্রাম নীরব হইয়া গিয়াছে।এতক্ষণে হাজারি স্ত্রীকে বলিল—ওগো, আমার গামছাখানা বড্ড ময়লা হয়েচে, একটুসোডা দিয়ে ভিজিয়ে দাও তো, কাল খুব সকালে কেচে দিও—আমি কাল সকালেউঠেই রাণাঘাট যাবো।

—সক্কালে কেন, এখুনি কেচে দিই। ভিজে গামছা নিয়ে যাবে কি করে, এখন কেচেহাওয়ায় মেলে দিলে রাত্তিরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

সকালে উঠিয়া হাজারি ঠাকুর রাণাঘাট চলিয়া আসিল। কর্তাবাবু এবং পদ্ম ঝি তাহাকে কি না জানি বলে! একদিন কামাই করিবার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহারপ্রাণ যাইবে।

হইলও তাই।

ঢুকিবার পথেই বসিয়া স্বয়ং বেচু চক্কত্তিমশায়—খোদ কর্তা। হাজারিকে দেখিয়াহাতের হুঁকা নামাইয়া কড়া সুরে বলিলেন—কাল কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি মিথ্যা কথা বলিল না। বাড়ীতে কাহারও অসুখ ইত্যাদি ধরনের বানানো মিথ্যা কথা সে কখনও বলে না। বলিল—আজ্ঞে, অনেক দিন পরে বাড়ী গেলাম কর্তামশায়, ছেলে-মেয়ে রয়েছে—তাই একটা দিন—

—না বলে-কয়ে এভাবে হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার মানে কি? কার কাছে ছুটিনিয়ে গিয়েছিলে?

এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। লুচি দিতে গিয়াছিল বাড়ীতে, তাহা বলিতেওবাধে। সে চুপ করিয়া রহিল।

—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর—পদ্ম ঝি ঠিক কথা বলে—দেখতে ভালমানুষহোলে কি হবে? তুমি এত বড় একটা হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নিউদ্দিশ হয়ে গেলে কাউকে কিছু না বলে?বলি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই মিলে—গাঁজাখোর, নেমকহারাম কোথাকার! চালাকির আর জায়গা পাওনি?

বেচু চক্কত্তির গলার জোর আওয়াজ পাইয়া পদ্ম ঝি ব্যাপার কি দেখিতে আসিলএবং দোরে উঁকি মারিয়া হাজারিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—এই যে! কি মনে করে!আবার যে উদয় হলে? কাল আমি বলি আর দরকার নেই, ও আপদ বিদেয় করে দেনকর্তা, গাঁজা খেয়ে কোথায় নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে ছিল—চেহারা দেখচেন না!

হাজারি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো গজাল-আঁটা ছোট্ট আয়নাখানায় নিজের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিল—কি দেখিল পদ্ম ঝি তাহার চেহারাতে! গাঁজাতো দূরের কথা, একটা বিড়ি পর্যন্ত সকাল হইতে সে খায় নাই!

—যাও, কাল একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, তার মজুরি এক টাকা, আর জলখাবারের চার আনা তোমার এ মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয়, সেই দিনই বিদেয় করে দেবো মনে থাকে যেন—বেচু চক্কত্তি রায় দিলেন।

হাজারি অপ্রতিভ মুখে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল—সেখানেও নিস্তার নাই।কর্তার হাত হইত নিষ্কৃতি পাইলেও, পদ্ম ঝির হাতে অত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। পদ্ম ঝি হাজারির পিছনে পিছনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—করবে না তো তোমার কাজ ওরা—কেন করবে?...একা হাঁড়ি ঠেলো আজকে—যেমন বদ্‌মাইশ তার তেমনি। একাবড় ডেক্‌চি নামাও, ফেন গালো, ভাত বাড়ো খদ্দেরদের—কাল সব কাজ মুখ বুজেও-ঠাকুর করেছে একা—নবাবপুত্তুর গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন আর ওর জন্যে খেটে মরবে সবাই—উড়ঝুড়ে মড়ুইপোড়া বামুন কোথাকার!

পদ্ম ঝি রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এই মাত্র বেচু চক্কত্তি বলিয়াছেন যে, কালহাজারির বদলে ঠিকা ঠাকুর রাখা হইয়াছিল, যাহার মজুরি হাজারির মাহিনা হইতেকাটা যাইবে।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—একা কি রকম? এই তো ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েছেবল্লেন কর্তাবাবু?

পদ্ম ঝি সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল—হইছিল তো। হয়নি তো কি? কর্তামশায় কি মিথ্যে কথা বলেন তোমার কাছে? যদি না-ই বা পাওয়া যেত ঠাকুর, তবে ঠাকুরকে একা খাটতে হোত না? তোমার সঙ্গে কথা

কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার—মুর্শিদাবাদ আসবার সময় হোল। এখুনি ইস্টিশানের খদ্দের সব আসবে। ডাল সাঁতলেফেলল তাড়াতাড়ি, চচ্চড়িটা চড়িয়ে দাও।

মুর্শিদাবাদ ট্রেন সশব্দে আসিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। এইবার কিছু খরিদ্দারের ভিড়হইবে।

হাজারি ছোট ডেক্‌চিটার মধ্যে হাত ডুবাইয়া সাঁতলাইতেছে, এমন সময় বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির চড়া গলার আওয়াজ এবং তর্কবিতর্কের শব্দ শুনিয়া সেরান্নাঘরের দোরের কাছে আসিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিল।

যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে কর্তামশায়ের কথা কাটাকাটি হইতেছে। যতীশ ভট্‌চাজঅনেক দিন হইতে তাদের খরিদ্দার—আগে আগে নগদ পয়সা দিয়া খাইয়া যাইত, আজ মাস-ছয় হইতে মাসিক হারে খায়। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, ম্যালেরিয়া রোগীর মতচেহারা, মাথার চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে, রঙ পূর্বে ফর্সা ছিল, এখন পুড়িয়া আধকালোহইয়া আসিয়াছে প্রায়। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে বিবর্ণকেম্বিসের জুতা।

বেচু চক্কত্তি বলিতেছেন—না, আপনি অন্যস্তর চেষ্টা করুন ভট্‌চাজ্‌ মশাই। আমি পারবো না সোজা কথা। হোটেল খুলিচি দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায়, অন্নছত্তর তো

খুলিনি?

যতীশ ভট্‌চাজ্বলিতেছে—টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না চক্কত্তি মশাই। এক'মাসের বাকি আমি একসঙ্গে দেবো।

—না মশাই—আপনি অন্যস্তর চেষ্টা করুন। যা গিয়েচে, গিয়েচে—আর আপনাকে খাইয়ে আমি জড়াতে রাজী নই।

যতীশ ভট্‌চাজ্বেশ নরম সুরে বলিল—না না, যাবে কেন? বিলক্ষণ! পাই-পয়সা শোধ ক'রে দেবো। তবে পড়ে গিইচি একটু ফেরে কর্তামশাই, ('খুব খোশামোদ জুড়ে দিয়েচে'!) তা এই ক'টা দিন যেমন খাচ্চি তেমনি খেয়ে যাই—সামনের মাসের পয়লাদোস্‌রা—

—না মশাই, সামনের মাসের পয়লা দোস্‌রার এখনো ঢের দেরি। ও-সব আরচলবে না। মাপ করবেন, আপনি অন্যস্তরে দেখুন—

যতীশ ভট্‌চাজের চেহারা দেখিয়া হাজারির মনে হইল, লোকটা খুব ক্ষুধার্ত, সকালহইতে কিছু খায় নাই। এত বেলায় না খাওয়াইয়া কর্তামশাই তাড়াইয়া দিতেছেন, কাজটা কি ভালো? হয়ত কিছু কষ্টে পড়িয়া থাকিবে, নতুবা দুমুঠা খাইবার জন্য লোকেএত খোশামোদ করে না।

হাজারির ইচ্ছা হইল, একবার সে বলে—কর্তামশাই আমি আজ খাবো না—কালদেশে একটা নেমন্তন্ন ছিল, খেয়ে শরীর খারাপ আছে। আমার ভাতটা না হয় ভট্‌চাজ্মশাই খেয়ে যান—কিন্তু কথাটা বলিলে কর্তামশায়ের অপমান করা হইবে, বিশেষকরিয়া পদ্ম তাহা হইলে তাহাকে আস্ত রাখিবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ শেষ পর্যন্ত না খাইয়া চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিল—আহা, পুরোনো খদ্দের—ওকে এক থালা ভাত দিলে কি ক্ষেতি হতো হোটেলের—আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এলে কাউকে ফেরাবোনা—এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পয়সা—তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার খরিদ্দারগণ আসিয়া পড়িয়াছে। খাইবার ঘরে বেশ ভিড়। মতি চাকর আজ দশ-বারোটি লোক জুটাইয়া আনিয়াছে। পদ্ম আসিয়া বলিল—দশ থালা ভাত বাড়ো—দু'থালা নিরামিষ্যি। আলুর ডাল্‌না দিও।

আধঘণ্টা পরে মুর্শিদাবাদ ট্রেনের খরিদ্দার বিদায় হইলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বনগাঁয়ের ট্রেনের সময় কতকগুলি লোক খাইতে আসিল। বেলা দেড়টা, এ সময় নূতন লোক প্রায়ই আসে না, পদ্ম ঝি যখন হাঁকিল,

পাঁচ থালা ভাত ঠাকুর—হাজারি তাহাকেডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—ডাল একেবারেই নেই—দু'জনের মত হবে কি না—

পদ্ম ঝি ডেক্‌চির কাছে আসিয়া নীচু হইয়া দেখিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—ওমা, এতো একেবারেই নেই বল্লে হয়! এখন খদ্দের খাওয়াবো কি দিয়ে?তোমার দোষ, যখন ডাল কমে আসচে, এখনও দু'খানা টেরেন্ বাকি, তখন একটু ফেন মিশিয়ে সাঁতলে নিলে না কেন? কর্তার তোমায় বলে দেওয়া হয়েছে! ফেন আছে?

হাজারি বলিল—আছে।

—আছে তো দু'বাটি দ্যাও ডালে ফেলে—দিয়ে একটু নুন দিয়ে গরম করে নাও।হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচো কি?

হাজারি এ ধরনের কাজ কখনো করে নাই। করিতে তাহার বাধে। সে সত্যই ভালরাঁধুনী। ইচ্ছা করিয়া হাতের ভাল রান্নাটা নষ্ট করিতে বা এভাবে খরিদ্দার ঠকাইতেতাহার মন সরে না। কিন্তু পদ্ম ঝির হুকুম না মানিয়া উপায় কি? বাধ্য হইয়া ডালেফেন মিশাইয়া খরিদ্দার বিদায় করিতে হইল।

ছুটি পাইল সেদিন প্রায় বেলা আড়াইটায়।

একটুখানি গড়াইয়া লইয়া রোদ একটু পড়িয়া আসিলে সে চূর্ণীনদীর তীরে তাহারঅভ্যাসমত বেড়াইতে চলিল। আজ ক'দিন নদীর ধারে যায় নাই—তার সেই পরিচিত নির্জন নিমগাছটার তলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়া ওপারের খেয়াঘাটের দিকে এবং শান্তিপুর যাইবার রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে নাই। বেশ লাগে জায়গাটা।

আর ওখানে গিয়া বসিলেই হাজারির মাথায় হোটেল-সংক্রান্ত নানা রকম নতুন কথা আসে, অন্য কোথাও তেমন হয় না।

আজ জায়গাটাতে গিয়া বসিতেই হাজারির প্রথমে মনে হইল, হোটেল চলে রান্নারগুণে। যাহারা পয়সা দিয়া খাইতে আসিবে, তাহারা চায় ভাল জিনিস খাইতে—ফেন্- মিশানো ডাল খাইতে তাহারা আসে না।

পদ্ম ঝিয়ের অনাচারের দরুন বেচু চক্কত্তির হোটেল উঠিয়া যাইবে। তাহার নিজের হোটেল ততদিনে খোলা হইয়া যাইবে। তাহার রান্নার গুণেই হোটেল চলিবে। হঠাৎহাজারি লক্ষ্য করিল, যতীশ ভট্‌চাজ্ চূর্ণীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় পারহইয়া ওপারে যাইবে।

—ও ভট্‌চাজ্ মশায়—ভট্‌চাজ্ মশায়—

যতীশ চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া হাজারির কাছে আসিল।

—কোথায় যাবেন?

—যাচ্ছি একটু ফুলে-নব্‌লা, আমার ভায়রাভাই থাকে, তারই ওখানে। দেখলে তোহাজারি তোমাদের চক্কত্তি মশায়ের কাণ্ডটা আজ! বলি টাকা কি আমি দিতাম না? দুপুরবেলা না খাইয়ে কিনা বল্লে অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন গিয়ে। ভাতবেচা বামুন যদি ছোটলোক না হয়, তবে আর কে হবে! বিড়ি আছে? দাও তো একটা—

হাজারির নিকট হইতে বিড়ি লইয়া ধরাইয়া বলিল—দুশো ঝাঁটা মারি শহরেরমাথায়। আর থাকচি নে। যাচ্ছি ফুলে-নব্‌লা, আমার বড় ভায়রাভাই পার্বতী চক্কত্তি সেখানে একজন নামকরা লোক। পার্বতী দাদা একবার বলেছিল ওদের জমিদারীকাছারীতে একটা চাকরি করে দেবে। পালচৌধুরীদের জমিদারী। মস্ত কাছারী। সেখানেইযাচ্ছি। একটা হিল্লে হয়ে যাবেই।

হাজারি বলিল—একটা কথা বলি ভট্‌চাজ্ মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—

যতীশ ভট্‌চাজ্বলিল—কি? টাকাকড়ি এখন কিছু নেই আমার কাছে তা বলে দিচ্ছি। তবে দেনা আমি রাখবো না—খাওয়ার টাকা আগে শোধ দিয়ে তখন অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও চক্কত্তি মশাইকে।

হাজারি বলিল—টাকাকড়ির কথা বলিনি। বলছিলাম, আপনি আহার করেচেন?

যতীশ ভট্‌চাজ্কিছুমাত্র না ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল—না। কোথায় করবো? অত বেলায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেল থেকে ফিরে আর ভাত কে আমার জন্যে নিয়ে বসেছিল?

হাজারি খপ্ করিয়া যতীশ ভট্‌চাজের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে চলুন ভট্‌চাজ্ মশায়—আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াবো আজ। আসুন আমার সঙ্গে —

যতীশ ভট্‌চাজ্বলিল—কোথায়? কোথায়? আরে না, না হাজারি, আর ও-সবথাক, আমি জল-টল খেয়ে—আর এমন অবেলায়—

হাজারি নাছোড়বান্দা। তাদের হোটেলের একজন পুরানো খদ্দের আজ পয়সা নাইবলিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাণাঘাট হইতে যাইতেছে—কি জানি কেন, এব্যাপারটার জন্য হাজারি যেন নিজেকেই দায়ী করিয়া বসিল।

যতীশ ভট্‌চাজ্বলিল—আমি তোমাদের হোটেলে আর যাবো না কিন্তু হাজারি। আচ্ছা তুমি যখন ছাড়চো না তখন বরং একটু জল-টল খাওয়াও।

—হোটেলে নিয়েই বা যাবো কেন? আসুন না, জল-টল নয়, ভাত খাওয়াবোরেঁধে।

যতীশ ভট্‌চাজ্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, ফুলে-নব্‌লা যেতে পারবো না আজ তাহলে। আজ সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

নিকটেই কুসুমের বাড়ী, একবার হাজারি ভাবিল ভট্‌চাজ্‌কে সেখানে লইয়া যাইবে কি না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করিল। ভদ্রলোককে নতুবা কোথায় বসাইয়া সে খাওয়ায়?

কুসুমের বাড়ীর দোরে কড়া নাড়িতেই কুসুম আসিয়া দোর খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়াহাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যতীশ ভট্‌চাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে লজ্জিতহইয়া নীচুসুরে বলিল—বাবাঠাকুর কি মনে করে? উনি কে সঙ্গে?

—ওঁর জন্যেই আসা। উনি বামুন মানুষ, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমার চেনাশুনা—আমাদের হোটেলের পুরোনো খদ্দের। পয়সা ছিল না বলে খেতে দেয়নি কর্তামশাই। উনি না খেয়ে শান্তিপুর চলে যাচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা—ধরে আনলুম। ওঁকে কিছু না খাইয়ে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাইরের ঘরটা খুলে দাও গিয়ে—

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দোর খুলিতে গেল। যতীশ ভট্‌চাজ্ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারি তাহাকে ডাক দিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীরভিতর যাইতেই কুসুম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—কি করবেন বাবাঠাকুর, রান্না করবেন? সবযোগাড় করে দিই! আর ততক্ষণ ঘরে যা-কিছু আছে, ও বাবাঠাকুরকে দিই, কি বলেন?

হাজারি বলিল—রান্না করে খাওয়াতে গেলে চলবে না কুসুম। উনি থাকতেপারবেন না; ফুলে-নব্‌লা যাবেন। আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আনি—এখানেএকটু বসবার জন্যে নিয়ে এলাম।

কুসুম হাসিয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিকিনি! আমি সবযোগাড় করচি জলখাবারের। আমার ঘরে সব আছে, ঘরে থাকতে বাজারে যাবেন খাবার আনতে কেন? আমার বাড়ীতে যখন ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়েচে, তখনআমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে খেতে দেব—কিন্তু বাবাঠাকুর, সেই সঙ্গে আপনিও—মনে থাকে যেন। হাজারি প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ করার পূর্বেই কুসুম ঘরের মধ্যে চলিয়াগেল—অগত্যা হাজারি বাহিরের ঘরে যতীশ ভট্‌চাজের কাছে ফিরিয়া আসিল।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ বলিল—তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী নাকি হে?

—না, আত্মীয় নয়, এরা হোল ঘোষ-গোয়ালা। এই বাড়ীতে আমার ধর্মমেয়েরবিয়ে হয়েছে, ওই যে দোর খুলে দিলে, ওই মেয়েটি!

পনেরো মিনিট আন্দাজ পরে ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া শিকল নড়িয়া উঠিতে হাজারি বাহিরের বাড়ীর অন্দরের দিকে দাওয়ায় গিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া দাওয়ার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। দু'খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পাতা—দু'বাটি জ্বাল দেওয়া দুধ, দুখানা থালে ফলমূল কাটা, বড় বাতাসা, ছানা, দুটি মুখ-কাটা ডাব। ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজা দুটি কাঁসার গ্লাসে দু'গ্লাস জল।

হাসিমুখে কুসুম বলিল—ওঁকে ডাকুন, সেবা করতে বলুন। যা বাড়ীতে ছিল একটুমুখে দিয়ে নিন্‌ দু'জনে।

—তাতো হোল—কিন্তু আমি আবার কেন কুসুম?

—মেয়ের বাড়ী যে—না খেয়ে যাবার কি জো আছে? ডাকুন ওঁকে।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ খাইতে বসিয়া যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, দেখিয়া মনে হইল, সে বড়ই ক্ষুধার্ত ছিল। তাহার থালায় একটু কিছু পড়িয়া রহিল না। কুসুম পান সাজিয়াবাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিল, খাওয়ার পরে। যতীশ ভট্‌চাজ্‌ বিদায় লইবার সময় বলিল—তোমার মেয়েটিকে একবার ডাকো হাজারি, আশীর্বাদ করে যাই।

কুসুম আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দু'জনকেই প্রণাম করিল। যতীশ ভট্‌চাজ্‌ বলিল—মা শোনো, সারাদিন সত্যিই খাইনি। ভারি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম তোমার এখানে। তুমি বড় ভাল মেয়ে, ছেলেপিলে নিয়ে সুখে থাকো, আশীর্বাদ করি।

হাজারি যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

পথে আসিয়া বলিল—ভট্‌চাজ মশাই, একটা হোটেল নিজে খুলবো অনেক দিনথেকে ইচ্ছা আছে। আপনি কি বলেন?

—অনায়াসে করতে পারো। খুব লাভের জিনিস—তোমার হবেও। তোমার মনটা বড় ভালো। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?

—তাই নিয়েই তো গোলমাল। নইলে এতদিন খুলে দিতাম—দেখি, চেষ্টায় আছি—ছাড়চি নে—ওই যে আমার মেয়ে দেখলেন, ওই কুসুম, ও একবার টাকা দিতে চেয়েছিল। তা কি নেওয়া ভাল? ও গরীব বেওয়া লোক, কেন ওর সামান্য পুঁজি নিতে যাবো? তাই নিইনি। নিলে ও এখুনি দেয়—তবে সে টাকা খুব সামান্য। তাতে হোটেল খোলাহবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ চূর্ণীর খেয়ার ধারে আসিয়া বলিল—আচ্ছা, চলি হাজারি—তুমিহোটেল খুললে তোমার হোটেলে আমি বাঁধা খদ্দের থাকব, সে তুমি ধরে নিতেপারো। আর কোথাও যাবো না—তোমার মত রান্না ক'টা ঠাকুর রাঁধতে পারে হে? বেচুচক্কত্তির হোটেলে আমি যে যেতাম শুধু তোমার নিরিমিষ রান্না খাওয়ার লোভে! ভালচলবে তোমার হোটেল। এদিগরে তোমার মত রাঁধতে পারে না কেউ, বলে যাচ্ছি।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ তো চলিয়া গেল, কিন্তু হাজারির মনে তাহার শেষ কথাগুলি একটা খুব বড় বল ও প্রেরণা দিয়া গেল।

সে জানে, তাহার হাতের রান্না ভাল—কিন্তু খরিদ্দারের মুখে সে কথা শুনিলে তবে নাতৃপ্তি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়াছিল বটে—কিন্তু সে যাইবার সময় যাহা দিয়া গেল, হাজারির মনের আনন্দ ও উৎসাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা খুব মূল্যবানও সার্থক প্রতিদান।

হাজারি যখন হোটেলে ফিরিল, তখন বেলা বেশী নাই। রতন ঠাকুর ডাল-ভাতচাপাইয়া দিয়াছে, মতি চাকর বা পদ্ম ঝি কেহই নাই। গদির ঘরে বেচু চক্কত্তি কাহাদেরসঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল।

হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকিলে কিন্তু হাজারির মনে নতুন বলের সঞ্চার হয়। বরং ছুটিপাইয়া বাহিরে গেলেই যত দুর্ভাবনা আসিয়া জোটে—প্রকাণ্ড উনুনের উপরে ফুটন্ত ডেক্‌চির সামনে বসিয়া হাজারি নিজেকে বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করে। তখন নামনে থাকে কুসুমের কথা, না মনে থাকে অন্য কোনো কিছু। অবসাদ আসে কাজ হাতে নাথাকিলে, এ বরাবর দেখিয়া আসিতেছে সে।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর ফিরিল।

হাজারিকে চুপি চুপি বলিল—একটি কথা আছে। আমার দেশের একজন লোক এসেছে—আমার কাছে থেকে চাকরি খুঁজবে। বড় গরীব—তাকে বিনি টিকিটে খাওয়ারঘরে ঢুকিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমার যদি মত হয়, তবে তাকে বলি।

হাজারি বলিল—নিয়ে এসো, তার আর কি। গরীব মানুষ খাবে, আমার কোনঅমত নেই। রতন ঠাকুর খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল। রাত্রে তাহার লোক যখন খাইতেআসিল, রতন ঠাকুর হাজারিকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে লোকটাকে চিনাইয়া দিতে, হাজারি পরিতোষ করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

পদ্ম ঝিয়ের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া লোকটা বিনা টিকিটে খাইয়া চলিয়াগেল—কেহ কিছু ধরিতেও পারিল না।

এই রকম চলিল, এক-আধ দিন নয়, দশ-বারো দিন! একদিন আবার তাহার অন্যএক সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বিনামূল্যে খাইতে দিতে হইল।

ব্যাপারটি সামান্য, হাজারি কিন্তু একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা পাইল ইহা হইতে। এত সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যেও চুরি তো বেশ চলে! বেচু চক্কত্তির টিকিট ও পয়সাতে ঠিক মিল আছে, সুতরাং তার দিক দিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই—পদ্ম ঝি যে পদ্ম ঝি, সে পর্যন্তবিন্দুবিসর্গ জানিল না ব্যাপারটার। ভাত তরকারির কিছু মাপ থাকে না যে কম পড়িবে। সুতরাং কে ধরিতেছে? কেন? এ ধরনের চুরি ধরিবার কি উপায় নাই কোনো?

কয়দিন ধরিয়া হাজারি চূর্ণীর ঘাটে নির্জনে বসিয়া শুধু এই কথা ভাবে। ঠাকুরেঠাকুরে ষড়যন্ত্র করিয়া যদি বাহিরের লোক ঢুকাইয়া খাওয়ায়, তবে সে চুরি ধরিবারউপায় কি? অনেক ভাবিয়া একটা উপায় তাহার মাথায় আসিল একদিন বিকালে।থালায় নম্বর যদি দেওয়া থাকে, তবে থালা এঁটো হইলেই ধরা পড়িবে অমুক নম্বরেরথালার খদ্দের বিনা টিকিটে খাইয়াছে—না পয়সা দিয়া খাইয়াছে।

মাঝে মাঝে তদারক করিলেই জিনিসটা ধরা পড়িবে। তা ছাড়া থালা মাজিবারসময় ঝি বা চাকরের নিকট হইতে এঁটো থালার নম্বরগুলি জানিয়া লইলেই হইবে।

হাজারি খুব খুশী হইল। ঠিক বাহির করিয়াছে বটে—একটা ফাঁক অবিশ্যি আছে, সেও জানে—যদি কলাপাতায় খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিনা নম্বরী থালা সেই লোকটাবাহির হইতে আনে—তাহাতে নিস্তার নাই, কারণ ঝি-চাকরের চোখে তখনই ধরা পড়িবে। এঁটো থালা সেই লোকটা কিছু মাজিতে বসিতে পারে না হোটেলের মধ্যেই। কলার পাতায় কেহ খাইতেছে, ইহা চোখে পড়িলে তখনি ঝি-চাকরে সন্দেহ করিবে বলিয়া হঠাৎ কেহ সাহস করিবে না কাহাকেও পাতায় ভাত দিতে।

দুশো-আড়াইশো টাকা যদি যোগাড় করা যায়, তবে এই রেল-বাজারেই আপাততহোটেল খুলিয়া দেওয়া যায়। টাকা দেয় কে?

যতীশ ভট্‌চাজের কথা তাহার মনে পড়িল।

বেচারী বড় কষ্টে পড়িয়াছে। শেষে কিনা ভায়রাভাইয়ের বাড়ী চলিয়াছে আশ্রয়প্রার্থনা করিতে! লোকে কি সোজা কষ্ট পাইলে তবে কুটুম্বস্থানে যায় চাকুরির উমেদারহইয়া!

যদি সে হোটেল খোলে, যতীশ ভট্‌চাজ্‌কে আনিয়া রাখিবে। বৃদ্ধ মানুষ, দুটি করিয়াখাইতে পারিবে আর কিছু হাতখরচ মিলিবে। ইহার বেশী তাহার আর কিসেরই বাদরকার!

প্রতিদিনের মত আজও বেলা পড়িয়া আসিল। গত দু'বৎসর যেরূপ হইয়াআসিতেছে, সেই একই ঘোড়ানিম গাছ, সেই একই চূর্ণীর খেয়াঘাট, পালেদের সেইএকই কয়লার ডিপোতে মুটে ও সরকার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে—সবইপুরাতন।

দিন যায়, কিন্তু তাহার সাধ পূর্ণ হইবার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে।

সামান্য মাইনে হোটেলের— কি হইবে ইহাতে? বাড়ীতে টেঁপিকে একখানা ভাল শখের কাপড় দেওয়া যায় না, পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া যায় না।

টেঁপির মা গরীব ঘরের মেয়ে। যেমন বাপের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখেনাই, স্বামীর ঘরে আসিয়াও তাই। সংসারে গভীর খাটুনি খাটিয়া ছেলেমেয়ে মানুষকরিতেছে—মুখ ফুটিয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে কোনো আদর-আবদার করে নাই—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিতেছে, আধপেটা খাইয়া নিজে, ছেলেমেয়েদের জন্যদু-মুঠা বেশী ভাত জল দিয়া রাখিয়া দিতেছে হাঁড়িতে, তাহারা সকাল বেলা খাইবে।কখনো কোনোদিন সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, অদৃষ্টকে নিন্দা করে নাই।

হাজারি সব বোঝে।

তাই তো সে আজকাল সর্বদা একমনে উপায় চিন্তা করে—কি করিয়া সংসারেরউন্নতি করা যায়। চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে রাঁধুনীবৃত্তি করিলে কখনও যে উন্নতি করা যাইবে না। আর পদ্ম ঝির ঝাঁটা খাইয়া মাঝে পড়িয়া হাড় কালি হইয়া যাইবে।

ভগবান যদি দিন দেন, তবে তাহার আজীবনের সংকল্প সে কার্যে পরিণত করিবে।হোটেল একখানা খুলিবে।

কুসুমের সঙ্গে এই যে আলাপ হইয়াছে, হাজারি এটাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়ামনে করে। কুসুম চমৎকার মেয়ে—প্রবাস-জীবনে কুসুমের সাহচর্য, তাহার মধুর ব্যবহার—হোক না সে গোয়ালার মেয়ে—কিন্তু বড় ভাল লাগে, আরও ভাল লাগে এইজন্য যে ঠিক কুসুমের মত স্নেহপ্রবণ কোনো আত্মীয়া মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

অনেকখানি যে নির্ভর করা যায় কুসুমের ওপর, সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মনেহয়, এ কাজের ভার কুসুমের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সে প্রতারণা করিবে তোনা-ই, বরং প্রাণপণ-যত্নে কাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন আপনার লোকেকরিয়া থাকে।

হাজারি যদি নিজের দিন ফিরাইতে পারে, তবে কুসুমের দিনও সে অমনরাখিবে না।

টেঁপিও তার মেয়ে, কিন্তু টেঁপি বালিকা, কুসুম বুদ্ধিমতী। ও যেন তার বড় মেয়ে—যে বাপের দুঃখকষ্ট সব বোঝে এবং বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে, মনপ্রাণ দিয়াচেষ্টা করে। মেয়েও বটে, বন্ধুও বটে।

সকালে সেদিন রতন ঠাকুর আসিল না।

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল, ও-ঠাকুর আজ আর আসবে না, কাল বলে গিয়েচে; তরকারীগুলো তুমি কুটে নাও, নিয়ে রান্না চাপিয়ে দাও, আমি আঁচ দিয়ে দিচ্চি।

হাজারি প্রমাদ গণিল। আজ হাটবার, দুপুরে অন্তত একশো দেড়শো হাটুরে খরিদ্দারখাইবে; একহাতে তাহাদের রান্না করা এবং খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

পদ্ম ঝিয়ের কথামত সে বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল—বেলা সাড়ে-আটটার সময় সবে ডাল-ভাত নামিয়াছে—এমন সময় একজন খরিদ্দার টিকিট লইয়াখাইতে আসিল।

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, সবে ডাল-ভাত নেমেছে, কি দিয়ে খাবেন?

লোকটি রাগিয়া বলিল—ন'টা বেজেচে, মোটে ডাল-ভাত? কি রকম ঠাকুর তুমি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে এতক্ষণ তিনটে তরকারি হয়ে গিয়েচে।এ রকম করলেই তোমাদের হোটেল চলেচে!

হাজারি বলিল—ন'টা তো বাজেনি বাবু, সাড়ে আটটা।

লোকটার মেজাজ রুক্ষ ধরনের। বলিল—আমি বলচি ন'টা, তুমি বলচো সাড়ে-আটটা! আবার মুখে মুখে তর্ক? আমি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

—সে কথা তো হয়নি বাবু। ঘড়ি কেন দেখতে জানবেন না, আপনারা বড়লোক।কিন্তু ন'টা বাজলে কেষ্টনগরের গাড়ী আসে। সে গাড়ী তো এখানো আসেনি?

—আবার তর্ক? এক চড় মারবো গালে—

বোধ হয় লোকটা মারিয়াই বসিত, ঠিক সেই সময় পদ্ম ঝি গোলমাল শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?

লোকটা পদ্ম ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমারসঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করচে, কি জানোয়ার! হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে এসে আবারলম্বা লম্বা কথা, আজ দিতাম তোমাকে একটি চড় কষিয়ে, টের পেতে তুমি মজা—

পদ্ম ঝি বলিল—যাক বাবু, আপনি ক্ষ্যামা দেন। ওর কথায় চট্‌লে কি চলে? আসুন, আপনি খাবেন এখানে?

—খাবো কি, তোমাদের ঠাকুর বলচে এখনও কিছু রান্না হয়নি। তাই বলতেগেলাম তো আমার সঙ্গে তর্ক। রান্না হয়নি তো টিকিট বিক্রি করেছিলে কেন তোমরা? দেখাবো তোমাদের মজা! যত বদমায়েশ সব!

পদ্ম ঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—ঠাকুর, তুমি কি রকম মানুষ? বাবুর সঙ্গে মুখোমুখি তক্‌কো করা তোমার কি দরকার ছিল? রান্না কেনই বা হয় না? যা হয়েচে তাই দিয়েভাত দাও, আর মাছ ভেজে দাও। যান বাবু আপনি গিয়ে বসুন।

খানিক পরে লোকটা খাওয়া ফেলিয়া বলিল—মাছটা এক্কেবারে পচা। রামো রামো, কেন মরতে এ হোটেলে খেতে এসেছিলুম— ছি ছি—এই ঠাকুর এদিকে এসো—

পদ্ম ঝি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু, কি হয়েছে?

—কি হয়েচে? যত সব ন্যাকামি! মাছ একদম পচা, লোকজনকে মারবার মতলব তোমাদের—না? আজই রিপোর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের নামে—

রিপোর্টের কথা শুনিয়া পদ্ম ঝির মুখ শুকাইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি বলিল—বাবু,আপনার পায়ে পড়ি বসুন, না খেয়ে উঠবেন না, আমি দই এনে দিচ্চি। একদিন যা হয়েগিয়েছে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে নিন বড়বাবু।

সে তাড়াতাড়ি দই ও বাতাসা আনিয়া দিল। লোকটি খাইয়া উঠিয়া যাইবার সময়বেচু চক্কত্তি বিনীত সুরে নিতান্ত কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, বাবু একটা কথা আছে, আপনারটিকিটের পয়সাটা তো নিতে পারি নে। আপনার খাওয়াই হোল না। পয়সা ক'আনাআপনি নিয়ে যান।

লোকটা বলিল—না না, থাক। পয়সা দিতে হবে না ফেরত—কিন্তু এরকম আরযেন কখনও না হয়।

বেচু চক্কত্তি জোর করিয়া লোকটার হাতে পয়সা কয়েক আনা গুঁজিয়া দিল।

একটু পরে গদির ঘরে হাজারি ঠাকুরের ডাক পড়িল। হাজারি গিয়া দেখিল সেখানে পদ্ম ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বেচু চক্কত্তি বলিল—ঠাকুর, খদ্দেরদের সঙ্গে ঝগড়া করতে কদ্দিন শিখেচ?

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—ঝগড়া? কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম বাবু?

পদ্ম ঝি বলিল—ঝগড়া করছিলে না তুমি ওই বাবুর সঙ্গে? সে মুখোমুখি তক্‌কো কি! বাবু তো চড় মারবেনই। আমি গিয়ে না পড়লে দিত কষিয়ে দু-চার ঘা। আগেকি বলেচে না বলেচে আমি তো শুনিনি, গিয়ে দেখি বাবু রেগে লাল হয়ে গিয়েচেন।ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? তখনও সমানে ঝগড়া চালাচ্চে—

বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের যাই কেন বলুন না তাই শুনে যেতে হবে, এ তুমি বুড়োহয়ে মরতে চল্লে, আজও শিখলে না তুমি?

—বাবু, আপনি শুনে বিচার করুন। ঝগড়া তো আমি করিনি—উনি বলেন ন'টা বেজেচে, আমি বল্লাম সাড়ে-আটটা বেজেচে, এই উনি আমায় বল্লেন, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার সব মিথ্যে কথা ঠাকুর। ও কথায় কখনো ভদ্দর লোকচটে না। তুমি বেয়াদপের মত তক্‌কো করেচো তাই বাবু চটে গিয়েচেন। আমি গিয়েস্বকর্ণে শুনিচি তুমি যা তা বলচো।

অবশ্য এখানে পদ্ম ঝিয়ের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলিতে পারে না, এ কথা হাজারি ভাল করিয়া জানিত। বেচু চক্কত্তি মহাশয় কাহারও কথা শুনিবেন না, পদ্ম ঝি যাহা বলিবে তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেনই। সে অগত্যা চুপ করিয়ারহিল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—পচা মাছ কে এনেছিল?

হাজারি উত্তর দেবার পূর্বেই পদ্ম ঝি বলিল—ও-ই গিয়েছিল বাজারে। ওইএনেচে।

হাজারি বিস্ময়ে কাঠ হইয়া গেল। কি সর্বনেশে মিথ্যে কথা! পদ্ম ঝি খুব ভাল করিয়াই জানে, কাল রাত্রে প্রায় দেড়পোয়া আন্দাজ পোনা মাছ উদ্বৃত্ত হইলে পদ্ম ঝি-ই তাহাকে বলিয়াছিল, মাছগুলা ঢাকিয়া রাখিতে এবং পরদিন কড়া করিয়া আর একবারভাজিয়া লইয়া মাছের ঝোল করিতে; তাহা হইলে খরিদ্দার টের পাইবে না যে মাছটাবাসি। বাসি মাছ ভাজা সে খরিদ্দারকে দিতে যায় নাই, পদ্ম ঝি নিজেই ভাজা মাছদিবার কথা বলিয়াছিল!

কিন্তু এ সব কথা বেচু চক্কত্তিকে বলিয়া কোন লাভ নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তোমার আট-আনা জরিমানা হোল। মাইনের সময় কাটাযাবে—যাও।

হাজারি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, কি অসহ্য অবিচার! সে বাজারে গিয়াছিল ইহা সত্য, মাছকিনিয়াছিল তাহাও সত্য, কিন্তু সে মাছ পচা নয়, সে মাছ খরিদ্দারের পাতে দেওয়াইহয় নাই, অথচ পদ্ম ঝি দিব্য তাহার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিল আর সেই মিথ্যা অপরাধে তাহার হইল জরিমানা!

পদ্ম দিদি তাহার সঙ্গে যে কেন এমন করিয়া লাগে—কি করিয়াছে সে পদ্ম দিদির?

রতন ঠাকুর আজ নাই, খাটুনি সবই তাহার ওপর। আট-দশজন লোক ইতিমধ্যেটিকিট কিনিয়া খাবার ঘরে ঢুকিল, চাকরে জায়গা করিয়া দিল। হাজারি তাড়াতাড়ি আলু ভাজিয়া ইহাদের ভাত দিল। তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল, শুধু আলু ভাজা আর ডাল দিয়া খাওয়া যায়?ইহারা সকলেই রেলের যাত্রী। স্টেশন হইতে তাহাদেরহোটেলের চাকর বলিয়া আনিয়াছে যে একমাত্র তাহাদেরই হোটেলে এত সকালে সবহইয়া গিয়াছে—মাছের ঝোল, অম্বল পর্যন্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে ডাল আর আলুভাজা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এ কি অন্যায়—ইত্যাদি।

পদ্ম ঝি দরজার কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল—ও ঠাকুর, দাও না মাছ ভেজে, বাবুরা বলচেন শুনতে পাও না? বাবুরা খাবেন কি দিয়ে?

অর্থাৎ সেই পচা মাছ ভাজা আবার দাও। আজকার মাছ এখনও কোটা হয় নাইপদ্ম তাহা জানে।

হাজারি ঠাকুর কিন্তু পচা মাছ আর খরিদ্দারদের পাতে দিবে না। সে বলিল—ভাজামাছ আর নেই। যা ছিল ফুরিয়ে গিয়েচে।

পদ্ম ঝি বলিল—তবে একটু বসুন বাবুরা, একখানা তরকারী করে দিচ্চে, বসুনআপনারা, উঠবেন না।

শিক্ষামত মতি চাকর আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, বনগাঁয়ের গাড়ী আসবার যে সময়হোল, রান্নাবান্না কিছু হোল না, এখনো? ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে যে!

খরিদ্দারেরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহারাও সেই গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে যাইবে। একজন বলিল—ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে?

মতি চাকর বলিল—হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ। গাড়ী গাংনাপুর ছেড়েচে—এল বলে।

মাছভাজা খাওয়া মাথায় থাকুক—তাহারা উঠিতে পারিলে বাঁচে। গাড়ী ফেল হইয়াগেলে অনেকক্ষণ আর গাড়ী নাই।

পদ্ম ঝি বলিল—আহা-হা উঠবেন না বাবুরা, ধীরে-সুস্থে খান। মাছ ভেজে দাওঠাকুর, আমি তাড়াতাড়ি কুটে দিচ্চি। বসুন বাবুরা।

খরিদ্দারেরা উঠিয়া পড়িল—ধীরভাবে বসিয়া খাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চলিয়া যাইতেই পদ্ম ঝি বলিল—যাক্, এইবার মাছগুলো কুটি। এত সকালেকোন্ হোটেলে রান্না হয়েচে? ছ'খানা মাছের দাগা বেঁচে গেল।

এই জুয়াচুরিগুলা হাজারি পছন্দ করে না।

শুধু এখানে বলিয়া নয়, রেল বাজারের সব হোটেলেই এই ব্যাপার সে দেখিয়াআসিতেছে। খরিদ্দারকে খাওয়াইতে বসাইয়া দিয়া বলে—বাবু, গাড়ীর ঘণ্টা পড়েগেল। খরিদ্দার আধপেটা খাইয়া উঠিয়া যায়, হোটেলের লাভ।

ছিঃ, ন্যায্য পয়সা গুনিয়া লইয়া এ কি জুয়াচুরি?

হাজারি ঠাকুর এতদিন এখানে কাজ করিতেছে, কখনো মুখ দিয়া একথা বাহির করে নাই যে ট্রেনের সময় হইয়া গেল!

অনেক সময় ট্রেনের সময় না হইলেও ইহারা মিথ্যা করিয়া ধুয়া তুলিয়া দেয়, যাহাতে খরিদ্দার ব্যস্ত হইয়া পড়ে—অধিকাংশই পাড়াগেঁয়ে লোক, রেলের টাইম-টেবিলমুখস্থ করিয়া তাহারা বসিয়া নাই, ইহাদের ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

মতি চাকরকে শিখানো আছে, সে সময় বুঝিয়া রেল গাড়ীর ধুয়া তুলিয়া দিবে—আজ পাঁচ-বছর হাজারি দেখিয়া আসিতেছে এই ব্যাপার।

নিজের হোটেল যখন সে খুলিবে, ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্য এসব হীন ও নীচকৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায্য পয়সা লইবে, ন্যায্যমত পেট ভরিয়া খাইতেদিবে। এই সব নিরীহ পল্লীবাসী রেলযাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা না লইলে যদি তাহার হোটেল না চলে, না হয় না-ই চলিল হোটেল।

ফাঁকি দেওয়া যায় না হাটুরে খরিদ্দারদের।

আজ মদনপুরের হাট—এখানকারও হাট। পাড়াগাঁ হইতে দুধ ও তরিতরকারীলইয়া বহুলোক আসে—তাহারা অনেকে এখানে খায়। বার বার যাতায়াত করিয়াতাহারা চালাক হইয়া গিয়াছে—মতি চাকর প্রথম প্রথম দু-একবার ইহাদের উপর কৌশল খাটাইতে গিয়া বেকুব বনিয়াছে।

তাহারা বলে—হোক্ হোক্ গাড়ীর ঘণ্টা, লাও তুমি। না হয় পরের গাড়ীডায়যাবানি। তা বলে সারাদিন খাটবার পরে ভাত ফেলে তো উঠতি পারিনে? হ্যাদে লিয়েএসো আর দু-হাতা ডাল—ও ঠাকুর—

হাটুরে লোকজন খাইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা একটা।

ইহাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত। ইহারা চাষা লোক, খায় খুব বেশী। তা ছাড়া খুবশৌখীন রকমের খাদ্য না পাইলেও ইহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু পেট ভরা চাই।

সাধারণ বাবু-খরিদ্দারদের জন্য যে চাল রান্না হয়, ইহাদের সে চাল নয়। মোটা নাগ্‌রা চালের ভাত ইহাদের জন্য বরাদ্দ। ফেন মিশানো ডাল ও একটা চচ্চড়ি। ইহাদের সাধারণত দেওয়া হয় চিংড়ি মাছ বা কুচা মাছ। পোনা মাছ ইহাদের দিয়া পারা যায় না। কুচো চিংড়ি কিছু বেশী দিতেও গায়ে লাগে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় হাজারির নিজের গ্রামের লোকও থাকে—তাহাদের মুখে বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, কিন্তু আজতাহার স্বগ্রাম হইতে কেহ আসে নাই।

রতন ঠাকুর নাই—একা হাতে এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেশন করিয়া হাজারি নিতান্ত ক্লান্ত দেহে যখন খাইতে বসিবার যোগাড় করিতেছে তখন বেলা প্রায় তিনটারকম নয়। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ পূর্বেই থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, বেচুচক্কত্তি গদিতে বসিয়া এবেলার ক্যাশ মিলাইতেছে—এই সময় পাশের হোটেলের বংশীধর ঠাকুর আসিয়া বলিল—ও ভাই হাজারি, দুটো ভাত হবে?

বংশীধর মেদিনীপুর জেলার লোক, তবে বহুকাল রাণাঘাটে থাকায় কথায় বিশেষ কোন টান লক্ষ্য করা যায় না। সে বলিল, আমার এক ভাগ্নে এসেচে হঠাৎ এখন এই তিনটের গাড়ীতে। আজ হাটবার, হাটুরে খদ্দেরদের দল সব খেয়ে গিয়েচে, আমাদের খাওয়াও চুকেচে, তাই বলি দেখে আসি যদি—

হাজারি বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দ্যাও গিয়ে, ভাত যা আছে খুব হয়ে যাবে।

বংশীধরের ভাগিনেয় আসিল। চমৎকার চেহারা, আঠারো-উনিশের বেশী বয়সনয়। তাহাকে আসন করিয়া ভাত দিতে গিয়া হাজারি দেখিল ডেক্‌চিতে যা ভাত আছে, তাহাতে দু-জনের কুলায় না। বংশীধরের ভাগিনেয়টি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবান ছেলে, নিশ্চয়ই দুটি বেশী ভাত খায়—তাহারই পেট ভরিবে কিনা সন্দেহ।

হাজারি উহাকেই সব ভাতগুলি বাড়িয়া দিল—ডাল তরকারি যাহা ছিল তাহাও দিল, সে খাইতে খাইতে বলিল—মাছ নেই?

—না বাবা, মাছ সব ফুরিয়ে গিয়েচে। আজ এখানকার হাটবার, বড্ড খদ্দেরের ভিড়। মাছের টান, ডাল তরকারির টান, সবেরই টান। তোমার খাওয়ার বড্ড কষ্ট হোল বাবা, তা বোসো দু-পয়সার দই আনিয়ে দিই।

—না না থাক্, আপনার দই আনাতে হবে না।

—না বাবা বসো। বংশীধরের ভাগ্নে যা, আমার ভাগ্নেও তাই। পাশাপাশি হোটেলএতদিন কাজ করচি।

হাজারি নিজে গিয়া দই আনিয়া দিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মামা, এখানে কোন চাকরি খালি আছে?

—কি চাক্‌রি বাবা?

—এই ধরুন হোটেলের রাঁধুনীগিরি কি এম্‌নি। কাজের চেষ্টায় ঘুরচি। এখানে কিছুহবে মামা?

মামা বলিয়া ডাকিতে ছেলেটির উপর হাজারির কেমন স্নেহ হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল—না বাবা, আমার সন্ধানে তো নেই, কিন্তু একটা কথা বলি। হোটেলেররাঁধুনীগিরি করতে যাবে কেন তুমি? দিব্যি সোনার চাঁদ ছেলে। এ লাইনে বড় কষ্ট, এ তোমাদের লাইন নয়। পড়াশুনা কদ্দূর করেচ?

ছেলেটি অপ্রতিভের সুরে বলিল—না মামা, বেশী করি নি। আমাদের গাঁয়েরছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর বাবা মারা গেলেন, আরলেখাপড়া হোল না।

তোমার নামটি কি?

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত হাজারির মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, চমৎকার ছেলেটি, ইহার সঙ্গে টেঁপির বিবাহ দিলে বড় সুন্দর মানায়!....

কিন্তু তাহা কি ঘটিবে? ভগবান কি এমন পাত্র টেঁপির ভাগ্যে জুটাইয়া দিবেন?

ছেলেটি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল—আপনার খাওয়া হয়েচে মামা?

—এইবার খেতে বসবো বাবা। আমাদের খাওয়া এইরকম। বেলা তিনটের এদিকে বড় একটা মেটে না, সেইজন্যই তো বলচি বাবা এসব ছ্যাঁচ্‌ড়া লাইন, তোমাদের জন্যেনয় এসব। রান্নার কাজ বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ।

ছেলেটি একটু হতাশ সুরে বলিল—তবে কোন্ লাইন ধরবো বলুন মামা? কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম। আজ ছ'মাস ধরে ঘুরচি। কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। আপনি বলচেন রাঁধুনীর কাজ—কলকাতায় একটা হোটেলের বাইরে লেখা ছিল—দুজন চাকর চাই। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম, বল্লে—কি? আমি বল্লাম—চাকরের কাজ খালি আছে দেখে এসেচি। বল্লে—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এ কাজ তোমার জন্যে নয়। কত করে বল্লাম, কিছুতেই নিলে না।

হাজারি অবাক হইয়া শুনিতেছিল। বলিল—বলো কি?

তারপর শুনুন। কোথাও চাকুরি জোটে না। কলকাতায় শেষকালে খেতে পাইনে এমন হোল। দু-একদিন তো না খেয়েই কাটলো। তারপর ভাবলাম, আমার এক মামা রাণাঘাটে হোটেলে কাজ করেন সেখানেই যাই। তাই আজ এলাম—উনি আমার আপন মামা নয়। মায়ের জ্ঞাতি ভাই। তা এখানেও আপনি বলচেন এ লাইন আমার জন্যে নয়—তবে কোথায় যাবো আর কি-ই বা করবো?

ছেলেটির হতাশার সুর এবং তাহার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী হাজারির মনে বড় লাগিল। সে তখনও ভাবিতেছিল—আহা, ছেলেমানুষ! আমার বড় ছেলে সন্তু বেঁচে থাকলে এত বড়টা হোত। টেঁপির সঙ্গে ভারি মানায়! সোনার চাঁদ হেন ছেলে! নাই বা হোল চাক্‌রি! ও গিয়ে টেঁপিকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে হয়ে আমার গাঁয়ের ভিটেতে গিয়ে বসুক—ওকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজে রোজগার করেওদের খাওয়াবো। জমিজমাও তো আছে কিছু।

খাওয়া শেষ করিয়া বংশীধরের ভাগিনেয়টি চলিয়া গেল বটে কিন্তু হাজারির প্রাণেযেন কি এক অনির্দেশ্য নূতন সুরের রেশ লাগাইয়া দিয়া গেল। তরুণ মুখের ভঙ্গি, তরুণ চোখের চাহনি হইতে এত প্রেরণা পাওয়া যায়?..জীবনে এ সব নবীন অভিজ্ঞতাহাজারির।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের গাছতলায় নির্জনে বসিয়া সে কত স্বপ্ন দেখিল। নতুন সবস্বপ্ন। টেঁপির সহিত বংশীধরের ভাগিনেয়টির বিবাহ হইতেছে। বাধা কিছুই নাই, তাহাদেরই পাল্‌টি ঘর।

টেঁপির ক্ষুদ্র, কোমল হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ হাতে তুলিয়া দিয়াছে...দুই হাত একত্র মিলাইয়া হাজারি মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করিতেছে।...টেঁপির মার চোখ দিয়াআনন্দে জল পড়িতেছে—কি সুন্দর সোনার চাঁদ জামাই!

কেন সে হোটেলের রাঁধুনীগিরি করিতে যাইবে ছেলেবয়সে? হাজারির নিজেরহোটেলে জামাই থাকিবে ম্যানেজার, চক্কত্তি মহাশয়ের মত গদিতে বসিয়া খরিদ্দারকে টিকিট বিক্রয় করিবে—হিসাবপত্র রাখিবে।

দ্বিগুণ খাটিবার উৎসাহ আসিবে হাজারির—জামাইও যা ছেলেও তাই। অত বড় অত সুন্দর, উপযুক্ত ছেলে। টেঁপির সারাজীবনের আনন্দ ও সাধের জিনিস। ওদেরদুজনের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রাণপণে খাটিবে। তিন মাসের মধ্যে হোটেল দাঁড়করাইয়া দিবে।

বেলা পড়িল। চূর্ণীর খেয়ায় লোক পারাপার হইতেছে, যাহারা শহরে কেনাবেচাকরিতে আসিতেছিল—এই সময় তাহারা বাড়ী ফেরে।

একবার কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া হোটেলে ফিরিতে হইবে—গাছতলায় বসিয়াআর বেশীক্ষণ আকাশ-কুসুম ভাবিলে চলিবে না। রতন ঠাকুর সম্ভবত এবেলাও দেখা দিতেছে না, তাহাকে একাই সব কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু সত্যই কি আকাশ-কুসুম? হোটেল তাহার হইবে না? টেঁপির সঙ্গে ওইছেলেটির—

যাক্, বাজে ভাবনায় দরকার নাই। দেরি হইয়া যাইতেছে।

পদ্ম ঝি বৈকালের দিকে হাজারিকে বলিল—হ্যাঁগো ঠাকুর, আজ মাছের মুড়োটা কি হল গা? আজ ত কর্তাবাবুর জ্বর। তিনি বেলা এগারোটার মধ্যেই চলে গিয়েছেন—অত বড় মুড়োটার কি একটা টুকরোও চোখে দেখতে পেলাম না—

হাজারি মাছের মুড়োটা লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল। বড় মাছের মুড়োসাধারণত কর্তার বাসায় যায়, কিন্তু আজ কর্তার অসুখ—তিনি বেশীক্ষণ হোটেলেছিলেন না—মুড়োটা পদ্ম ঝি নিজের বাড়ী লইয়া যাইত—হাজারি কখনও মুড়ো নিজে খায় নাই—রতন ঠাকুর খাইয়াছে, পদ্ম ঝি ত প্রায়ই লইয়া যায়—হাজারির দাবি কি থাকিতে পারে না মুড়োর উপর? তাই সে সেটাকুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল যখন ছুটি করিয়া চূর্ণীর ঘাটে বেড়াইতে যায় তখন।

পদ্ম ঝিয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাজারি বলিল—কেন গা পদ্মদিদি, এতক্ষণ পরেমুড়োর খোঁজ হল?

—এতক্ষণ পরেইহোক আর যতক্ষণ পরেইহোক—কি হল মুড়োটা?

—আমায় কি একদিন খেতে নেই? তোমরা ত সবাই খাও। আমি আজ খেয়েছি।

—কই মুড়োর কাঁটাচোকড়া ত কিছু দেখলাম না? কোথায় বসে খেলে?

হাজারির বিব্রত ভাব পদ্ম ঝিয়ের চোখ এড়াইল না। সে চড়াগলায় বলিল—খাওনি তুমি। খেলে কিছু বলতাম না। তুমি সেটা লুকিয়ে বিক্রী করেছ—কেমন ঠিক কথাকি না? কিচোর, জুয়াচোর কোথাকার—হোটেলের জিনিস নুকিয়ে নুকিয়ে বিক্রী? আচ্ছা, তোমার চুরির মজা টের পাওয়াচ্ছি—আসুক কর্তা—

হাজারি বলিল—না পদ্ম দিদি, বিক্রী করব কাকে? রাঁধা মুড়ো কে নেবে? সত্যি আমি খেয়েছি।

—আবার মিথ্যে কথা? আমি এতকাল হোটেলে কাজ করে হাতে ঘাটা পড়িয়েফেলনু, মাছের মুড়োর কাঁটাচোকড়া আমি চিনিনে—না? অত বড় মুড়োটা চার আনার কম বিক্রী করনি। জমা দাও সে পয়সা গদিতে, ওবেলা নইলে দেখো কি হাল করি কর্তার সামনে।

—আচ্ছা নিও চার আনা পয়সা—আমি দেব। একটু মুড়ো খেয়ে যদি দাম দিতেহয়—তাই নিও।

পদ্ম ঝি একটুখানি নরম হইয়া বলিল—তা হলে বেচেছিলে ঠিক?

—না পদ্ম দিদি।

তবে কি করলে ঠিক করে বল—

—তোমার ত পয়সা পেলেই হল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

দরকার আছে তাই বলছি—কোথায় গেল মুড়োটা? বলো—নইলে কর্তার সামনে তোমার অপমান করব। বলো এখনো—

—আমি খেয়েছি।

—আবার? আমার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ঠাকুর? আমি এবার বুঝতেপেরেছি মুড়ো কোথায় গেল। তোমার সেই—

হাজারি জানে পদ্ম কি বলিতে যাইতেছে—সে পদ্ম ঝিয়ের মুখের কথা চাপা দিবারজন্য তাড়াতাড়ি বলিল—পদ্ম দিদি, তোমাদের ত খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছি গরীব বামুন।কেন আর ও সামান্য জিনিস নিয়ে বকাঝকা কর?

এ কথায় পদ্ম ঝি নরম না হইয়া বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। বলিল—নিজে খেলে কিছু বলতাম না ঠাকুর—কিন্তু হোটেলের জিনিস পর দিয়ে খাওয়ানো সহ্যি হয় না।এর একটা বিহিত না করে আমি যদি ছাড়ি তবে আমার নামে কুকুর পুষো, এইবলে দিচ্ছি সোজা কথা।

হাজারি ভয়ে ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল—নিজের জন্য নয়, কুসুমের জন্য। পদ্ম ঝিয়ের অসাধ্য কাজ নাই—সে না জানি কি করিয়া বসিবে— কুসুমের শাশুড়ীর কানে হয়ত কত রকমের কথা উঠাইবে, তাহার উপরে যদি কুসুমের বাপের বাড়ী অর্থাৎ তাহার স্বগ্রামে সে কথা গিয়া পৌঁছায়—তবে উভয়েরই লজ্জায় মুখ দেখানো ভারহইয়া উঠিবে সেখানে। অথচ কুসুম নিরপরাধিনী। পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিয়া চিন্তিয়া রতন ঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। তাহার আত্মীয়কে বিনাপয়সায় খাওয়ানোর ষড়যন্ত্রের মধ্যে হাজারি ছিল—সুতরাং রতন হাজারির দিকেটানিত। সে বলিল—তুমি কিছু ভেবো না হাজারি-দা, পদ্ম দিদিকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। মুড়ো বাইরে নিয়ে যাবে, তা আমায় একবারখানি জানালে হতনি? তোমায় কতবুঝিয়ে পারব আমি?

কিছু পরে সন্ধ্যার দিকে বেচু চক্কত্তি আসিলেন। চাকর হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাকসাজিয়া আনিল। হুঁকা হাতে লইয়া বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ধুনো গঙ্গাজল দে আগে— আর পদ্মকে বাজারের ফর্দ দিতে বলে দে—

কয়লাওয়ালা মহাবীর প্রসাদ বসিয়া ছিল পাওনার প্রত্যাশায়—তাহাকে বলিলেন— সন্ধ্যের সময় এখন কি? ওবেলা ত সাড়ে বার আনা নিয়ে গিয়েছ, আবার এবেলাদেওয়া যায়?কাল এসো। তোমার কি?

একটি রোগা কালো মত লোক হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু সেদিন কুমড়ো দিয়েলাম—তার পয়সা।

—কুমড়ো? কে কুমড়ো নিয়েছে?

—আজ্ঞে, বাবু, আপনাদের হোটেলে দিয়ে গিয়েলাম—ছ'আনা দাম বলেলাম, তা তিনি বললেন—পাঁচগণ্ডা পয়সা হবে। তা বলি, ভদ্দর নোকের কথা—তাই দ্যান।তিনি বললেন—আজ নয়, বুধবারে এসে নিয়ে যেওয়ানে—তাই এ্যালাম—

—ছ'আনা পয়সার কুমড়ো ধারে নিয়েছে কে—খাতায় কি বাজারের ফর্দের মধ্যেত ধরা নেই, এ ত বাপু আশ্চর্য কথা!—আমরা ধারে জিনিসপত্তর খরিদ করি নে। যাকিনি তা নগদ। কে তোমার কাছে কুমড়ো নিলে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

বেচু রতন ও হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা কুমড়ো কেনাত দূরের কথা—গত পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কুমড়ার তরকারিই রাঁধে নাই, বলিল—কোন কুমড়া চক্ষেও দেখে নাই এই কয়দিনে।

কথাবার্তার মধ্যে পদ্ম ঝি বাজারের ফর্দ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কুমড়াওয়ালা বলিয়াউঠিল—এই যে! ইনিই তো নিয়েলেন! সেই কুমড়ো মা ঠাক্‌রণ।—বললেন বুধবারে আসতি—তাই আজ এ্যালাম। বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কুমড়ো কে নিয়েলেন—

পদ্ম ঝি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁ, কুমড়ো নিয়েছিলামতা কি হবে? পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে কি পালিয়ে যাব? দিয়ে দাও ত কর্তাবাবু ওর পয়সা মিটিয়ে—আমি এর পরে—বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া কুমড়োওয়ালাকে পয়সা মিটাইয়া দিলেন, সে চলিয়া গেল।

রতনঠাকুর আড়ালে গিয়া হাজারিকে বলিল—হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল পদ্মদিদিকিন্তু কর্তাবাবুর দরদটা একবার দেখেছ ত হাজারি-দা?

—ও আর দেখাদেখি কি, দেখেই আসছি। আমি যদি কুমড়ো নিতাম তবে পদ্মদিদি আজ রসাতল বাধাত—কর্তাবাবুও তাতে সায় দিত। এ ত আর তুমি আমি নই? এ হোটেলে পদ্মদিদিই মালিক। তুমি এইবার একবার বল পদ্মদিদিকে মুড়োর কথাটা। নইলে ও এখুনি লাগাবে কর্তাকে—

রতন পদ্ম ঝিকে আড়ালে বলিল—ও পদ্মদিদি, গরীব বামুন তোমাদের দোরে করেখাচ্ছে কেন আর ওকে নিয়ে অমন করো? একটা মুড়ো যদি সে খেয়েই থাকে— এতদিন খাটছে এখানে, তা নিয়ে তাকে অপমান কোরো না। সবাই ত নেয়—কেউ তনিতে ছাড়ে না—আমি নিইনে, না তুমি নাও না? বেচারীকে কেন বিপদে ফেলবে?

পদ্ম ঝি বলিল—ও খায়নি—ও এখান থেকে বের করে ওর সেই পেয়ারেরকুসুমকে দিয়ে এসেছে—আমি কচি খুকী? কিছু বুঝি নে? নচ্ছার বদমাইশ লোককোথাকার—

রতন হাসিয়া বলিল—যা বোঝে সে করুক গিয়ে পদ্মদিদি— তোমার আমার কি? সে মুড়ো নিজে খায়,—পরকে দেয়—তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি কিছু বোলোআজ আর ওকে।

পদ্ম ঝি কুমড়ার ব্যাপার লইয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল—নতুবা সে রতনেরকথা এত সহজে রাখিত না। বলিল—তাহলে বারণ করে দিও ওকে—বারদিগর যেনএমন আর না করে। তাহলে আমি অনথ বাধাবো—কারোর কথা শুনবো না।

সে রাত্রে হোটেলের কাজকর্ম চুকাইয়া হাজারি চূর্ণীর ধারে বেড়াইতে গেল। দিব্যজ্যোৎস্নারাত—প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ কি সর্বনাশই আর একটু হইলে হইয়াছিল! তাহার নিজের জন্য সে ভাবে না, ভাবে কুসুমের জন্য। কুসুম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সেখানে তার বদনাম রটিলে উভয়েরইসেখানে মুখ দেখানো চলিবে না। আর তাহার এই বয়সে এই বদনাম রটিলে লোকেইবা বলিবে কি?

কুসুমকে সে মেয়ের মত দেখে—ভগবান জানেন। ওসব খেয়াল তাহার থাকিলেএই রাণাঘাট শহরে সে কত মেয়ে জুটাইতে পারিত। এই রাধাবল্লভতলার মাটি ছুঁইয়াসে বলিতে পারে জীবনে কোনদিন ওসব খেয়াল তার নাই। বিশেষত কুসুম। ছিঃছিঃ—টেঁপির সঙ্গে যাহাকে সে অভিন্ন দেখে না—তাহার সম্বন্ধে রতন ঠাকুরের কাছে পদ্ম ঝি যে সব বিশ্রী কথা বলিয়াছে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাত প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। শহর নিশুতি হইয়া গিয়াছে, কেবল কুণ্ডুদের চূর্ণীরধারের কাঠের আড়তে হিন্দুস্থানী কুলীরা ঢোলক বাজাইয়া বিকট চিৎকার শুরু করিয়াছে—ওই উহাদের নাকি গান! যখন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস আসিয়া দাঁড়ায় স্টেশনে তখন সে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে—আর এখন স্টেশন পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ এত রাত্রে কোন ট্রেন আসে না। রাত চারটা হইতে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হইবে।

হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া মতি চাকরের ঘুম ভাঙাইতে তাহারপ্রবৃত্তি হইল না। বড় গরম—স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে না হয় বাকি রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়াযাক্।আজ রাত্রে ঘুম আসিতেছে না চোখে।

ভোরে উঠিয়া হোটেলের সামনে আসিয়া হাজারি দেখিল হোটেলের দরজা এখনও বন্ধ। সে একটু আশ্চর্য হইল। মতি চাকর তো অনেকক্ষণ উঠিয়া অন্যদিন দরজাখোলে। ডাকাডাকি করিয়াও কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর গদির ঘরের জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিতে গিয়া হাজারি লক্ষ্য করিল—বাসনেরঘরের মধ্যে অত আলো কেন?

ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল বাসনের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কেহই নাই।

মতি চাকরেরও সাড়াশব্দ নাই কোনদিকে। এরকম তো কখনো হয় না।

এমন সময় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের চাকর নিমাই গয়লাপাড়া হইতে চায়ের দুধলইয়া ফিরিতেছে দেখা গেল—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে একটা চায়ের স্টলও আছে।খুব সকাল হইতেই সেখানে চা বিক্রী শুরু হয়।

হাজারির ডাকে নিমাই আসিল। দুজনে ঘরের মধ্যে ঝুঁকিয়া দেখিল মতি চাকরখাবার ঘরে শুইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। উভয়ের ডাকে মতি ধড়মড় করিয়াউঠিল।

হাজারি বলিল—মতি দোর খোলা কেন?

মতি বলিল—তা তো আমি জানি নে! তুমি রাত্তিরে ছিলে কোথায়? দোর খুললেকে?

তিনজনে ঘরের মধ্যে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিল। হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা, সর্বনাশ! থালা বাসন কোথায় গেল? একখানাও তো দেখছি নে!

—সে কি!

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো ঘরেই বাসনের সন্ধান পাওয়াগেল না। নিমাই বলিল—চায়ের দুধটা দিয়ে আসি হাজারি-দা, বাসনে সব চক্ষুদানদিয়েছে কে। তোমাদের কর্তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর আসিল। সে-ই গিয়া বেচু চক্কত্তিকে ডাকিয়া আনিল। পদ্মঝিও আসিল। চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া পাশের হোটেল হইতে যদু বাঁড়ুয্যে আসিলেন, বাজারের লোকজন জড়ো হইল—থানায় খবর দিতে তখনি এ. এস. আই. নেপালবাবুও দুজন কনস্টেবল আসিল। হৈ হৈ বাধিয়া গেল। বেচু চক্কত্তি মাথায় হাত দিয়া ততক্ষণবসিয়া পড়িয়াছেন, প্রায় ষাট-সত্তর টাকার থালা বাসন চুরি গিয়াছে!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

—ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে বাবু। বড্ড গরম হচ্ছিল—তাই ঘাটের ধার থেকে ফিরেওখানেই রাত কাটালাম।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—অত রাত্রে প্ল্যাট্‌ফর্মে শুয়েছিলে? কোন্ প্ল্যাট্‌ফর্মে?

—আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্ল্যাট্‌ফর্মের বেঞ্চির ওপর। —তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল?

—না বাবু, তখন অনেক রাত।

—কত?

—দেড়টার বেশী।

—এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

—রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি দুবেলাই চূর্ণীর খেয়াঘাটে গিয়ে বসি। কালওসেখানে ছিলাম।

—আর কোনো দিন হোটেল ছেড়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে শুয়েছিলে?

—মাঝে মাঝে শুই, তবে খুব কম।

এই সময় বেচু চক্কত্তিকে পদ্ম ঝি চুপি চুপি কি বলিল। বেচু চক্কত্তি নেপালবাবুকেবলিলেন, দারোগাবাবু, একবার ঘরের মধ্যে একটা কথা শুনে যান দয়া করে—

ঘরের ভিতর হইতে কথা শুনিয়া আসিয়া নেপালবাবু বলিলেন—হাজারি ঠাকুর, তুমি কুসুমকে চেনো?

হাজারির মুখ শুকাইয়া গেল। ইহার মধ্যে ইহারা কুসুমের কথা আনিয়া ফেলিলকেন? কুসুমের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক?

হাজারির মুখের ভাব নেপালবাবু লক্ষ্য করিলেন।

হাজারির উত্তর দিতে একটু দেরি হইতেছিল, নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেনকথার জবাব দাও?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে মুখে আঁচল চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাজারিবুঝিল কুসুমের কথা সে-ই কর্তাকে বলিয়াছে নতুবা তিনি অতশত খোঁজখবর রাখেন না। কর্তামশায় দারোগাকে বলিয়াছেন কথাটা—সে ওই পদ্ম ঝিয়ের উস্‌কানিতে!

—কুসুম থাকে কোথায়?

—গোয়ালাপাড়ায়, বড় বাজারের দিকে।

—সে কি করে?

—দুধ-দই বেচে। গরীব লোক।

বয়েস কত?

—এই চব্বিশ-পঁচিশ—

পদ্ম ঝি একটু মুচকি হাসিল এই উত্তর শুনিয়া, হাজারির তাহা চোখে এড়াইল না।দারোগাবাবুর প্রশ্নের গতি তখনও সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের মুখের মুচকি হাসি দেখিয়া সে বুঝিল কেন ইহারা কুসুমের কথা এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

—তোমার সঙ্গে কুসুমের কত দিনের আলাপ?

—সে আমার গাঁয়ের মেয়ে। সে যখন ছেলেমানুষ তখন থেকে তাকে জানি। তারবাবা আমার বন্ধুলোক—আমাদের পাড়ার পাশেই—

—কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই দেখাশোনা করো—না?

মাঝে মাঝে দেখা করি বৈকি—গাঁয়ের মেয়ে, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার—

নেপালবাবু হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই দরকার। এখানে তার শ্বশুরবাড়ী?

—আজ্ঞে হাঁ।

—স্বামী আছে?

—না, আজ বছর চার-পাঁচ মারা গিয়েছে—শাশুড়ী আছে বাড়ীতে। এক দেওর-পোআছে।

—তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আসে?

লজ্জায় ও সঙ্কোচে হাজারি যেন কেমন হইয়া গেল। এসব কথা এখানে কেন?

পদ্ম ঝি খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই মুখে আঁচল চাপা দিল। নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—আঃ, হাসি কিসের? এটা হাসির জায়গা নয়। চুপ্‌—

কিন্তু দারোগাবাবু ধমক দিলে কি হইবে—পদ্ম ঝিয়ের হাসি সংক্রামক হইয়াউঠিয়া উপস্থিত লোকজন সকলেরই মুখে একটা চাপা হাসির ঢেউ আনিয়া দিল। অন্যলোকের হাসি হাজারি তত লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের হাসিতে সে কিসের একটাপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঠাওর করিয়া মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল—দারোগাবাবু, সে গরীব লোক, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, সে আমাকে বাবা বলে ডাকে—আমার সে মেয়ের মত—তাইমাঝে মাঝে কোনদিন একটু-আধটু তরকারী কি রাঁধা মাংস তাকে দিয়ে আসি। কততো ফেলা-ঝেলা যায়, তাই ভাবি যে একজন গরীব মেয়ে—

—বুঝেছি, থাক্‌ আর তোমায় লেকচার দিতে হবে না। কাল রাত্রে তুমি সেখানেগিয়েছিলে?

—আজ্ঞে না বাবু।

—আজ সকালে গিয়েছিলে?

—না বাবু, সকালে প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকেই হোটেলে এসেছি।

—হুঁ।

দারোগাবাবু অন্য সকলের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল মতি চাকর ও হাজারিকে বলিলেন—আমার সঙ্গে তোমাদের থানায় যেতে হবে। কনস্টেব্‌লদেরবলিলেন—এদের ধরে নিয়ে চল।

মতি কান্নাকাটি করিতে লাগিল—একবার বেচু চক্কত্তি, একবার দারোগাবাবুর হাতেপায়ে পড়িতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে থানায়লইয়া গিয়া কি ফল? —ইত্যাদি।

হাজারির প্রাণ উড়িয়া গেল থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া।

এই এ কি বিপদে ভগবান তাহাকে ফেলিলেন?

থানা-পুলিশ বড় ভয়ানক ব্যাপার, মোকর্দমা হইলে উকীল দিবার ক্ষমতা হইবে নাতাহার, বিনা কৈফিয়তে জেল খাটিতে হইবে—কত বছর তাই বা কে জানে? না খাইয়া স্ত্রীপুত্র মারা পড়িবে। জেলখাটা আসামীকে ইহার পর চাকুরিই বা দিবে কে?

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার, যদি ইহারা কুসুমকে ইহার মধ্যে জড়ায়।জড়াইবেই বোধ হয়। হয়তো কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে চাহিবে।

নিরপরাধিনী কুসুম! লজ্জায় ঘৃণায় তাহা হইলে সে হয়তো গলায় দড়ি দিবে।আরও কত কি কথা লোকে রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা গেলেতো তাহার নিজেরও আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

কখনও সে একটা বিড়ি-দেশলাই কাহারও চুরি করে নাই জীবনে—সে করিবে হোটেলের বাসন চুরি! নিজের মুখের জিনিসে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে কুসুমকেমাঝে মাঝে দিয়া আসে বটে—চুরির জিনিস নয় সে সব। সে খাইত, না হয় কুসুমখায়।

থানায় গিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই হাজারি ও মতি বসিয়া রহিল। হাজারি শুনিল বেচুচক্কত্তি ও পদ্ম ঝি দু-জনেই বলিয়াছে উহাদের উপরই তাহাদের সন্দেহ হয়। সুতরাংপুলিশ তো তাহাদের ধরিবেই।

থানার বড় দারোগা থানায় ছিলেন না— বেলা একটার সময় তিনি আসিয়া চুরিরসব বিবরণ শুনিয়া হাজারি ও মতিকে তাহার সামনে হাজির করিতে বলিলেন। হাজারি হাত জোড় করিয়া দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—হোটেলে কতদিন কাজ করচ?

—আজ্ঞে বাবু, ছ' বছর।

—বাসন চুরি করে কোথায় রেখে দিয়েচ?

—দোহাই বাবু—আমার বয়েস ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ হোল—কখনো জীবনে একটা বিড়ি কারো চুরি করিনি—

দারেগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আর ওই চাকরবেটা দুজনে মিলে যোগসাজসে চুরি করেচ। স্বীকার করো—

—বাবু আমি এর কোনো বার্তা জানি নে। আমি সে রাত্তিরে হোটেলেই ছিলাম না।

—কোথায় ছিলে?

—ইস্টিশানের প্ল্যাট্‌ফর্মে শুয়ে ছিলাম সারারাত।

—কেন?

—বাবু, আমি খাওয়া-দাওয়া করে চূর্ণীর ঘাটে বেড়াতে যাই রোজ। বড্ড গরম ছিলবলে সেখানে একটু বেশী রাত পর্যন্ত ছিলাম—ফিরে এসে দেখি দরজা বন্ধ, তাই ইস্টিশানে—

এই সময় নেপালবাবু ইংরাজিতে বড় দারোগাকে কি বলিলেন। বড় দারোগা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ও। আচ্ছা—তুমি কুসুম বলে কোনো মেয়েমানুষের বাড়ী যাতায়াতকরো?

বাবু, কুসুম আমার গাঁয়ের মেয়ে। গরীব বিধবা, তাকে আমি মেয়ের মতো দেখি—সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে, বাবার মত ভক্তিছেদ্দা করে। যদি সেখানে গিয়ে থাকি, তাহলে তাতে দোষের কি আছে বাবু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। একথা লাগিয়েচে আমাদের হোটেলের পদ্ম ঝি—সে আমাকে দুচোখ পেড়ে দেখতেপারে না—কুসুমকেও দেখতে পারে না। আমাদের নামে নানারকম বিচ্ছিরি কথা সে-ইরটিয়েচে। আপনিই হাকিম—দেবতা। আর মাথার ওপর চন্দ্র সূয্যি রয়েচেন—আমারপঞ্চাশ বছর বয়েস হোতে গেল—আমার সেদিকে কখনো মতি-বুদ্ধি যায়নি বাবু। আমিতাকে মেয়ের মত দেখি—তাকে এর জন্যে জড়াবেন না—সে গেরস্তর বৌ—মরে যাবে ঘেন্নায়।

বড় দারোগা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক। হাজারির চোখমুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটা মিথ্যা বলিতেছে না।

বড় দারোগা মতি চাকরকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জেরা করিলেন। তাহার কাছেওবিশেষ কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না—তাহার সেই এক কথা, ঘরের মধ্যে অঘোরেঘুমাইতেছিল, সে কিছুই জানে না।

বড় দারোগা বলিলেন—দু-জনকেই হাজতে পুরে রেখে দাও—এম্‌নি এদের কাছেকথা বেরুবে না—কড়া না হোলে চলবে না এদের কাছে।

হাজারি জানে এই কড়া হওয়ার অর্থ কি। অনেক দুঃখ হয়তো সহ্য করিতে হইবে আজ। সব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত আছে যদি কুসুমের নাম ইহারা আর না তোলে।

বেলা দুইটার সময় একজন কনস্টেবল আসিয়া কিছু মুড়ি ও ছোলা-ভাজা দিয়াগেল। সকাল হইতে হাজারি কিছুই খায় নাই— সেগুলি সে গোগ্রাসে খাইয়া ফেলিল।

বেলা চারটার সময় রতন ঠাকুর হোটেল হইতে হাজারির জন্য ভাত আনিল।

বলিল—আলাদা করে বেড়ে রেখেছিলাম, লুকিয়ে নিয়ে এলাম হাজারি-দা। কেউ জানে না যে তোমার জন্যে ভাত আনচি।

বড় দারোগার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া রতন ঠাকুর হাজতের মধ্যে ভাত লইয়াআসিয়াছিল। কিন্তু মতির ভাত আনিবার কথা তাহার মনে ছিল না—হাজারি বলিল—ওই ভাত দু-জনে ভাগ করে খাবো এখন।

রতন বলিল—হোটেলে মহাকাণ্ড বেধে গিয়েছে। একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, সে কাজের বহর দেখে এবেলাই পালিয়েচে। খদ্দের অনেক ফিরে গিয়েচে। পদ্ম বলচেতুমি আর মতি দুজনে মিলে এ চুরি করেচ। কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস না করিয়ে পদ্মছাড়বে না বলচে। সেখানে বাসন চুরি করে তুমি রেখে এসেচ। কর্তারও তাই মত।তুমি ভেবো না হাজারি-দা—মোকদ্দমা বাধে যদি আমি উকিল দেবো তোমার হয়ে। টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুমি এ কাজ করনি আমি তা জানি আর কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কি ধরনের লোক।

হাজারি রতনের হাত ধরিয়া বলিল—ভাই আর যা হয় হোক্—কুসুমের বাড়ী যেনখানাতল্লাস না হয় এটা তোমাকে করতে হবে। কোনো উকীলের সঙ্গে না হয় কথাবলো, আমার দুমাসের মাইনে পাওয়া আছে—আমি না হয় তোমাকে দেবো।

রতন হাসিয়া বলিল—তোমায় সেই মাইনে আবার দেবে ভেবেচ কর্তাবাবু? তা নয়—সে তুমি দ্যাও আর নাই দ্যাও—আমি উকীল দেবো, তুমি ভেবো না। কত পয়সা তো রোজগার করলাম জীবনে হাজারি-দা—এক পয়সা তো দাঁড়াল না। সৎকাজেদু'পয়সা খরচ হোক্।

হাজারি বলিল —মতিকে তাহলে ভাত দিয়ে এসো, সে অন্য ঘরে কোথায় আছে।

রতন বলিল—মতিকে আমার সন্দেহ হয়।

—না বোধ হয়। ও যদি চুরি করবে তো অমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোত পারে নাকডাকিয়ে? আর ও সেরকম লোক নয়।

রতন ভাতের থালা লইয়া চলিয়া গেল।

আরও পাঁচ-ছ'দিন হাজারি ও মতি হাজতে আটক থাকিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—সুতরাং চুরিচার্জশীট দেওয়া সম্ভব হইল না।

ছ'দিনের দিন দুজনেই খালাস পাইল।

মতি বলিল—হাজারি-দা, এখন কোথায় যাওয়া যায়? হোটেলে কি আমাদের আরনেবে?

হাজারিও জানে হোটেলে তাহাদের চাকুরি গিয়েছে। কিন্তু সেখানে দু'মাসের মাহিনাবাকি–বেচু চক্কত্তির কাছে গিয়া মাহিনা চাহিয়া লইতে হইবে।

বেলা তিনটে। এখন হোটেলে গেলে কর্তামশাই থাকিবেন না—সুতরাং হাজারিসন্ধ্যার পর হোটেলে যাইবে ঠিক করিল। কতদিন চূর্ণীর ধারে যায় নাই—রাধাবল্লভতলায়গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সে আপন মনে চূর্ণীর ধারে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসিয়া হাজারির মনে পড়িল, সে এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায় নাই। রতন হাজতে রোজ ভাত দিয়া যাইত, আজ দুদিন সে আর আসে নাই—কেনআসে নাই কে জানে, হয়তো পদ্ম জানিতে পারিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে—কিংবাহয়তো তাহাদের ভাত আনিয়া দেওয়ার অপরাধে তাহারও চাকুরি গিয়াছে।

একটা পয়সা নাই হাতে যে কিছু কিনিয়া খায়। হাজতের ভাত হাজারি এক দিনও খায় নাই—আজও একজন কনস্টেবল ভাত আনিয়াছিল, সে বলিয়াছিল— তেওয়ারিজিআমায় দুটি মুড়ি বরং এনে দিতে পারো, আমার জ্বর হয়েছে ভাত খাবো না।

বেলা বারোটার সময় সামান্য দুটি মুড়ি খাইয়াছিল—আর কিছু পেটে যায় নাইসারাদিন। সন্ধ্যার পরে হোটেলে গিয়া দুটি ভাত খাইবে এখন, সেই ভালো।

হাজারির সন্দেহ হয় বাসন আর কেহ চুরি করে নাই, পদ্ম ঝির নিজেরই কাজ।ক'দিন হাজতে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া তাহার মনে হইয়াছে, পদ্ম অন্য কোনো লোকেরযোগসাজসে এই কাজ করিয়াছে। ও অতি ভয়ানক চরিত্রের মেয়েমানুষ, সব পারে।গত বৎসর খদ্দেরদের কাপড়ের ব্যাগ যে চুরিহইয়াছিল—সেও পদ্ম ঝিয়ের কাজ—এখন হাজারির ধারণা জন্মিয়াছে।

এরকম ধারণা সে বিদ্বেষবশত করিতেছে না, গত ছ' বৎসর হাজারি পদ্ম ঝিয়েরএমন অনেক কাণ্ড দেখিয়াছে যাহা সে প্রথম প্রথম তত বুঝিত —কিন্তু এখন দুয়েদুয়ে যোগ দিয়া সে অনেকটাই বুঝিয়াছে।

বৃদ্ধ বেচু চক্কত্তি পদ্ম ঝিয়ের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে—দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না, হোটেলটির যে কি সর্বনাশ করিতেছে পদ্ম দিদি, তাহা তিনি এখন নাবুঝিলেও পরে বুঝিবেন।

রতন ঠাকুরও সেদিন ভাত দিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে।

—হাজারিদা, হোটেলের অর্ধেক জিনিস পদ্মদিদির ঘরে—আজকাল বাজারেরজিনিস পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করেছে। সেদিন দেখলে তো কুমড়োর কাণ্ড?চুষে খাবেএমন সাজানো হোটেলটা বলে দিচ্চি। পদ্ম দিদির কেন অত টান বাড়ীর ওপরে—তাওআমি জানি। তবে বলিনে, যাহোক্ আট টাকা মাইনের চাকরিটা করি—এ বাজারে হঠাৎ চাক্‌রিটা অনর্থক খোয়াবো?

সন্ধ্যার পরে হাজারি হোটেলের গদিঘর দিয়া ঢুকিতে সাহস না করিয়া রান্নাঘরেরদিকের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিল। ভাবিয়াছিল রান্নাঘরে রতন ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে—কিন্তু একজন অপরিচিত উড়িয়া ঠাকুরকে ভাত রাঁধিতে দেখিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল, সেইপথেই বাহির হইয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছে—এমন সময় খরিদ্দারদের খাবার ঘর হইতে পদ্ম ঝি বলিয়া উঠিল—কে ওখানে? কে যায়?

হাজারি ফিরিয়া বলিল—আমি পদ্মদিদি—

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আমি? কে আমি?—ও, হাজারি ঠাকুর!...তুমি কি মনে করে? চলে যাচ্চ কোথায় অত তাড়াতাড়ি? ঢুকলেই বাকেন আর বেরুচ্ছই বা কেন?

—আজ হাজত থেকে খালাস পেয়েচি পদ্মদিদি। কোথায় আর যাবো, যাবার তো জায়গা নেই কোথাও—হোটেলেই এলাম, খিদে পেয়েচে—দুটো ভাত খাবো বলে।রান্নাঘরে এসে দেখি রতন ঠাকুর নেই, তাই সামনে দিয়ে গদিঘরে যাই—

—তা যাও গদিঘরে। এই খদ্দেরের খাবার ঘর দিয়েই যাও—

হাজারি সঙ্কুচিত অবস্থায় হোটেলের খাবার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিয়া গদির ঘরেগেল। পদ্ম ঝি গেল পিছু পিছু।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এই যে, হাজারি যে! কি মনে করে?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে কর্তামশায়, পুলিশে ছেড়ে দিল আজ—তাই এলাম। যাবোআর কোথায়? আপনার দরজায় দুটো করে খাই। তা ছেড়ে আর কোথায় যাবো বলুন?

বেচু চক্কত্তি কোনো উত্তর দিবার আগেই পদ্ম ঝি আগাইয়া আসিয়া বেচু চক্কত্তিকেবলিল—ওকে আর একদণ্ড এখানে থাকতে দিও না কর্তাবাবু—এখুনি বিদেয় করো।বাসন ও আর মতি যোগসাজসে নিয়েচে। পাকা চোর, পুলিশে কি করবে ওদের?

হাজারি এবার রাগিল। পদ্ম ঝিকে কখনও সে এ সুরে কথা বলে নাই। বলিল—তুমি দেখেছিলে বাসন নিতে পদ্ম দিদি?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার ও চোখ-রাঙানির ধার ধারে না পদ্ম, তা বলে দিচ্ছিহাজারি ঠাকুর। অমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বোলো না—বাসন তোমাকে নিতে দেখলে হাতের দড়ি তোমার খুলতো না তা জেনে রেখো।

হাজারি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে ততক্ষণ। নীচু হওয়াই তাহার অভ্যাস—যাহারা বড়, তাহাদের কাছে আজীবন সে ছোট হইয়াই আসিতেছে—আজ চড়া গলায়তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সাহস তাহার আসিবে কোথা হইতে?

সেরকম সুরে বলিল—না না, রাগ করছো কেন পদ্ম দিদি—আমি এমনিই বলচি, বাসন নিতে যখন তুমি দ্যাখোনি—তখন আমি গরীব বামুন, তোমাদের দোরে দুটোকরে খাই—কেন আর আমাকে—

এইবার বেচু চক্কত্তি কথা বলিলেন।

একটু নরম সুরে বলিলেন—যাক্, যাক্, কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমারবাসন তাতে ফিরবে না। দুজনেই থামো। তারপর তুমি বলছ কি এখন হাজারি?

—বলচি, কর্তা, আমায় যেমন পায়ে রেখেছিলেন, তেমনি পায়ে রাখুন। নইলে না খেয়ে মারা যাবো। বাবু, চোর আমি নই, চোর যদি হতাম, আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম না আর।

পদ্ম ঝি বলিল—চোর কিনা সে কথায় দরকার নেই—কিন্তু তোমার এখানে জায়গাআর হবে না। তা হলে খদ্দের চলে যাবে।

বেচু বলিলেন—তা ঠিক। খদ্দের চলে গেলে হোটেল চালাবো কি করে আমি?

হাজারি এ যুক্তির অর্থ বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ঠাকুর চোর হইলে সে না হয় হোটেলের জিনিস চুরি করিতে পারে, কিন্তু খরিদ্দারদের গায়ের শাল খুলিয়া বা তাহাদের পকেট মারিয়া লইতেছে না তো—তবে খরিদ্দাদের আসিতে আপত্তি কি?

কিন্তু হাজারি এ প্রশ্ন উঠাইতে পারিল না। তাহার জবাব হইয়া গেল। সে কিছু খাইয়াছে কি না এ কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে সে বলিল—তা হলে আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, দু'মাসের তোবাকি পড়ে রয়েচে, হাওলাত নেই কিছু। খাতা দেখুন।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সে এখন হবে না, এর পরে এসো।

পদ্ম একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলে। সে বলিল—ওর আশা ছেড়ে দাও, মাইনে পাবে না।

—কেন পাব না?

পদ্ম ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—সে তক্‌কো তোমার সঙ্গে করবার সময় নেই এখন।পাবে না মিটে গেল। নালিশ করো গিয়ে—আদালত তো খোলা রয়েচে।

হাজারি চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

বেচু চক্কত্তির দিকে চাহিয়া বিনীত সুরে বলিল—কর্তামশায়, আজ আপনার দোরে ছ'বছর খাটচি। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই—বাড়ীতে দু'মাস খরচ পাঠাতেপারিনি, বাড়ী যাবার রেলভাড়া পর্যন্ত আমার হাতে নেই—আমায় কিছু না দিলে নাখেয়ে মরতে হবে।

বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওই নিয়ে যাও। এখানে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না—খদ্দের আসতে আরম্ভকরচে, বাইরে যাও গিয়ে—

হাজারি আধুলিটা কুড়াইয়া লইয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিল। তারপর হাত জোড় করিয়া মাজা হইতে শরীরটা খানিকটা নোয়াইয়া বেচু চক্কত্তিকে প্রণাম করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, তাহলে বাবু, মাইনের জন্যে কবে আসবো?

—এসো—এসো এর পরে যখন হয়। সে তখন দেখা যাবে—

ইহা যে অত্যন্ত ছেঁদো কথা হাজারির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বরং পদ্ম ঝি যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। মাহিনা ইহারা তাহাকে দিবে না। তাহার মাথায় আসিলএকবার শেষ চেষ্টা করিবে। মরীয়ার শেষ চেষ্টা। বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়াসে পিছন দিয়া হোটেলের রান্নাঘরে আসিল। সেখানে পদ্ম ঝি একটু পরে আসিতেইসে হাত জোড় করিয়া বলিল—পদ্মদিদি, গরীব বামুন—চাক্‌রি করচি এতকাল, একখানারেকাবী কোন দিন চুরি করিনি। আমি বড় গরীব। তুমি একটু বলে কর্তামশাইকে আমার মাইনের ব্যবস্থা করে দেও—নইলে বাড়ীতে ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। এই আধুলিটা সম্বল, দোহাই বলছি রাধাবল্লভের—এতে আমি কি খাবো, আর রেলভাড়া কি দেবো, বাড়ীর জন্যেই বা কি নিয়ে যাবো!

—আমি হোটেলের মালিক নই যে তোমায় টাকা দেবো। কর্তামশায় যা বলেচেন তার ওপর আমার কি কথা আছে?

—দয়া করে পদ্মদিদি তুমি একবার বলো ওঁকে। না খেয়ে মারা যাবে ছেলেপিলে।

—কেন তোমার পেয়ারের কুসুমের কাছে যাও না, পদ্মদিদিকে কি দরকার এরবেলা?

হাজারির ইচ্ছা হইল আর একদণ্ড সে এখানে দাঁড়াইবে না। সে চায় না যে এই সবজায়গায় যার-তার মুখে কুসুমের নাম উচ্চারিত হয়, বিশেষত পদ্ম ঝিয়ের মুখে। সে চুপ করিয়া রহিল। পদ্ম রান্নাঘর হইতে চলিয়া গেল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া সে চলিয়াই যাইতেছিল, পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—যাচ্ছ যে? খাওয়া হয়েছে তোমার?

হাজারি অবাক হইয়া পদ্ম ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল। কখনো সে এমন কথাতাহার মুখে শোনে নাই। আমতা আমতা করিয়া বলিল—না—খাওয়া—ইয়ে—না হয়নি ধরো।

—তা হোলে বোসো। এখনও মাছটা নামেনি। মাছ নামলে ভাত খেয়ে তবেযেওদাঁড়িয়ে কেন?বসো না পিঁড়ি একখানা পেতে।

হাজারি কলের পুতুলের মত বসিল। পদ্মদিদি তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে।পদ্মদিদির দরদ!...সাত বছরের মধ্যে একদিনও যা দেখে নাই!...আশ্চর্য কাণ্ডই বটে!

মাছ নামিলে নতুন ঠাকুর হাজারিকে ভাত বাড়িয়া দিল। পদ্ম ঝিকে আর এদিকেদেখা গেল না—সে এখন খরিদ্দারদের খাওয়ার ঘরে ব্যস্ত আছে। নতুন ঠাকুর যদিওহাজারিকে চেনে না তবুও ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, হাজারি হোটেলের পুরোনো ঠাকুর—চাকুরিতে জবাব হইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে হাজারিকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইল।

যাইবার সময় হাজারি পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—পদ্মদিদি, চললাম তবে। কিছু মনেকোরো না।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ, দাঁড়াও ঠাকুর। এই দুটো টাকা রাখো, কর্তামশায় দিয়েচেন মাইনের দরুন। এই শেষ কিন্তু—আর কিছু পাবে না বলে দিলেনতিনি।

হাজারি টাকা দুইটি লইয়া আগের আধুলিটির সঙ্গে চাদরের খুঁটে রাখিল কিন্তু সেখুব অবাক হইয়া গিয়াছে—সত্যই অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

-আচ্ছা, তবে আসি।

—এসো। খাওয়া হয়েছে তো? আচ্ছা।

রাত সাড়ে ন'টার কম নয়।

এত রাত্রে সে কোথায় যায়?

চাকুরি গেল। তবুও হাতে আড়াইটা টাকা আছে।

বাড়ী যাওয়া কি হইবে? চাকুরি খুঁজিতে হইবেই তাহাকে। বাড়ী গিয়া বসিয়াথাকিলে চলিবে না। চাকুরি চলিয়া যাইবে—একথা হাজারি ভাবে নাই। সত্য সত্যইচাকুরি গেল শেষকালে!

সে জানে রাণাঘাটের কোনো হোটেলে তাহার চাকুরি আর হইবে না। যদু বাঁড়ুয্যেএকবার তাহাকে হোটেলে লইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সে চুরির অপবাদে হাজত বাস করিয়া আসিয়াছে, কেহই তাহাকে চাকুরি দিবে না।

হাজারি দেখিল সে নিজের অজ্ঞাতসারে চূর্ণী নদীর ধারে চলিয়াছে—তাহার সেই প্রিয় গাছতলাটিতে গিয়া বসিবে—বসিয়া ভাবিবে। ভাবিবার অনেক কিছু আছে।

কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা নদীর ধারে বসিয়া থাকিয়াও ভাবনার কোনো মীমাংসা হইল না। আজ রাত্রে অবশ্য স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে শুইয়া থাকিবে—কিন্তু কাল যায় কোথায়?

আড়াই টাকার মধ্যে দুটি টাকা বাড়ী পাঠাইতে হইবে। টেঁপি—টেঁপির মুখে হয়তো তাহার মা দুটি ভাত দিতে পারিতেছে না।

এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য।

না—কালই টাকা দুটি পাঠাইবে ডাকে। মনি অর্ডার ফি দিবে আধুলিটা হইতে।পুরো দু'টাকা বাড়ী যাওয়া চাই।

স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য ঘুম হইল। ফরিদপুর লোকালের শব্দে খুব ভোরে ঘুম গেল ভাঙিয়া। তবুও সে শুইয়াই রহিল। আজ আর তাড়াতাড়িবড় উনুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে না—উঠিয়া কি হইবে?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে শুইয়াই রহিল। ডাউন দার্জিলিং মেল আসিল, চলিয়া গেল।বনগাঁ লাইনের ট্রেন ছাড়িল। রোদ উঠিয়াছে, প্ল্যাট্‌ফর্ম ঝাঁট দিতে আসিয়াছে ঝাড়ুদার।আর একখানা গাড়ীর ডাউন দিয়াছে আড়ংঘাটার দিকে। মুর্শিদাবাদ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার।

এই কোন্ নিদ্ যাতা রে, এই উঠো—হঠ্ যাও—ঝাড়ুদার হাঁকিল। হাজারি উঠিয়া হাই তুলিয়া কলে গিয়া হাতমুখ ধুইল।

সে কোথায় যায়—কি করে?গত ছ'সাত বছরের মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় জীবন সেকখনো যাপন করে নাই—কাজ, কাজ, উনুনে ডেক্‌চি চাপাও, কর্তামশায়ের চায়েরজল গরম কর আগে, বাজারে আজ কার পালা? হৈ চৈ—ঝাড়া বকুনি—পদ্ম ঝিয়েরচেঁচামেচি...

বেশ ছিল। পদ্ম ঝিয়ের বকুনিও যেন এখন সুমিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। পদ্মখারাপ লোক নয়—কাল রাত্রে খাইতে বলিয়াছিল, টাকা দিয়াছে। রতন ঠাকুরও বড়ভাল লোক। বংশী ঠাকুরের ভাগিনেয়টিও বড় ভাল। সবাই ভাল লোক। বংশীর সেইভাগিনেয় তাহার টেঁপির উপযুক্ত বর। দুজনে সুন্দর মানাইত। ছেলেটিকে বড় পছন্দহইয়াছিল। আকাশকুসুম। মিথ্যা আশা, টেঁপিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেতবে তার বিয়ে।

গত ছ'বছরে হাজারির একটা বড় কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে—সকালে বিকালে চাখাওয়া।

এখন চা খাইতে হইবে পয়সা খরচ করিয়া—সেজন্য হাজারি চা খাওয়ার ইচ্ছাকেদমন করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত আবশ্যক। আজসাত আট দিন কুসুমের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। চুরির জন্য হাজতে যাওয়ার সংবাদবোধ হয় কুসুম শোনে নাই—কে তাহাকে সে খবর দিয়াছে? চা ওখানেই খাওয়া চলিতে পারে। কুসুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও করা দরকার। তাহার নিজের মাথায় কিছুই আসিতেছে না।

কুসুম কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলিল— আপনি জ্যাঠামশায়? এমন অসময় যে! এতদিন আসেননি কেন?

—চলো, ভেতরে বসি। অনেক কথা আছে।

কুসুম ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। হাজারি বসিয়া বলিল—মা কুসুম, একটু চা খাওয়াবে?

—এখুনি করে দিচ্চি জ্যাঠামশায়, একটু বসুন আপনি।

চা শুধু নয়—চায়ের সঙ্গে আসিল একখানা রেকাবিতে খানিকটা হালুয়া। হাজারিচা খাইতে খাইতে বলিল—কুসুম মা, আমার চাকরি গিয়েছে।

কুসুম বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

—চুরি করেছিলাম বলে।

—চুরি করেছিলেন!

—ওরা তাই বলে। পাঁচ-ছ'দিন হাজতে ছিলাম।

—হাজতে ছিলেন! হ্যাঁ, মিথ্যে কথা!

কুসুম দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারির সামনে মাটির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কৌতূহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—না কুসুম, মিথ্যে নয়, সত্যিই হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হিসেবে।

—হাজতে থাকতে পারেন জ্যাঠামশায়—কিন্তু চুরি আপনি করেননি— করতেপারেন না। সেইটেই মিথ্যে কথা, তাই বলচি।

—আমি চুরি করতে পারি নে?

—কক্ষনো না জ্যাঠামশায়। আপনাকে আমি জানি নে? চিনি নে?

—তোমার মা, এত বিশ্বাস আছে আমার ওপর!

কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে কান্না চাপিবারচেষ্টা করিতেছে।

হাজারি বাঁচিল। কুসুম সত্যই তার মেয়ে বটে। তাহার বড় ভয় ছিল কুসুম জিনিসটাকি ভাবে লইবে! যদি বিশ্বাস করিয়া বসে যে সত্যই সে চোর। জগতে তাহা হইলেহাজারির একটা অবলম্বন চলিয়া গেল।

—আপনি এখন কোথা থেকে আসচেন জ্যাঠামশায়?

—কাল রাত্রে স্টেশনে ছিলাম—যাবো আর কোথায়?সেখান থেকে উঠে আসচি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করাটা দরকার মা, হয়তো আবার কতদিন—

—কেন, আপনি যাবেন কোথায়?

—একটা কিছু হিল্লে লাগাতে তো হবে—বসে থাকলে চলবে না বুঝতেই পারো।দেখি কি করা যায়।

—এখানে আর কোনো হোটেলে—

—চুরির অপবাদ রটেচে যখন, তখন এখানকার কোনো হোটেলে নেবে না। দেখি, একবার ভাবচি গোয়াড়ি যাই না হয়—সেখানে অনেক হোটেল আছে, খুঁজে দেখি।সেখানে।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন।আপাতোক্ আপনি নেয়ে আসুন, তেল এনে দিই। তারপর রান্নার যোগাড় করে দিচ্চি, এখানে দুটি ভাতেভাত চড়িয়ে খান।

—না মা, ওসব হাঙ্গামে আর দরকার নেই—থাক্, খাওয়ার জন্যে কি হয়েচে— আমি তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই বসে। ভাবলাম কুসুমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করিগিয়ে, তাই এলাম। একটা বুদ্ধি দাও তো মা খুঁজে—একার বুদ্ধিতে কুলোয় না—তারপর বুড়োও হয়ে পড়েচি তো!

কুসুম হাসিয়া বলিল—পরামর্শ হবে এখন। না যদি খান, তবে আমিও আজসারাদিন দাঁতে কুটো কাটবো না বলে দিচ্চি কিন্তু জ্যাঠামশায়। ওসব শুনবো না—আগেনেয়ে আসুন—তারপর ভাত চাপান, আমিও আপনার প্রসাদ দুটি পাই। মেয়ের বাড়ী এসেচেন, যতই গরীব হই, আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেচেন বুঝি—ভারি টান তো মেয়ের ওপর!

অগত্যা হাজারি চূর্ণীর ঘাটে স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া দেখিল গোয়ালঘরের এক কোণ ইতিমধ্যে কুসুম কখন লেপিয়া পুঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া ইট দিয়া উনুন পাতিয়াফেলিয়াছে।

একটা পেতলের মাজা বোগনো দেখাইয়া বলিল—এতেই হবে জ্যাঠামশায়, নানতুন হাঁড়ি কাড়বেন?

—না নতুন হাঁড়ির দরকার নেই। ওতেই বেশ হবে এখন।

ভাত নামিবার কিছু পূর্বে একটি ছেলে গোয়ালঘরের দোরে আসিয়া উঁকি মারিয়াইঙ্গিতে কুসুমকে বাহিরে ডাকিল। হাজারি দেখিল, তাহার হাতে একখানা গামছায় বাঁধাহাটবাজার—অন্য হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ঝোলানো।

—একটুখানি দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, মাছ কুটে আনি।

হাজারি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিল কুসুমের কাণ্ড দেখিয়া। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে ডাকিয়া কুসুম কখন বাজার করিতে দিয়াছে—থাক্ দিয়াছে দিয়াছে— কুসুম গরীব মানুষ, এত বড় মাছ কিনিতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? নাঃ, বড় ছেলেমানুষএখনও। এদের জ্ঞানকাণ্ড আর হবে কবে?

কুসুম হাজারির তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার রান্না ইলিশ মাছ একদিন খেতে যদি সাধ হয়ে থাকে তবে মেয়েকে অমন করে বকতে নেই জ্যাঠামশায়!

হাজারি অপ্রসন্নমুখে বলিল—নাঃ, যত সব ছেলেমানুষের ব্যাপার!

আহারাদির পর হাজারির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুসুম খাইতে গেল। গতরাত্রেভাল ঘুম হয় নাই—ইতিমধ্যে হাজারি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন ঘুম ভাঙিলতখন প্রায় বিকাল হইয়া গিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কাল ঘুম হয়নি মোটেই ইস্টিশানের বেঞ্চিতেশুয়ে—তা বুঝতে পেরেচি। ঘুমিয়েচেন ভাল তো? চা করে আনি, উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

চায়ের সঙ্গে কোথা হইতে কুসুম গরম জিলিপি আনাইয়া দিল। বলিলেও শোনেনা, বলিল—এই তো ওই মোড়ে হারান ময়রার দোকানে এ সময় বেশ গরম জিলিপি ভাজে, চায়ের সঙ্গে বেশ লাগবে—শুধু চা খাবেন?

ইহার উপর আর কত অত্যাচার করা চলিতে পারে। আজই এখান হইতে সরিয়া নাপড়িলে উপায় নাই। হাজারি ঠিক করিল চা খাইয়া আর একটু বেলা গেলেই এখানহইতে রওনা হইবে।

কুসুম পান সাজিয়া আনিয়া হাজারির সামনে মেঝেতে বসিল।তারপর এখন কিকরবেন ভেবেচেন?।

—ওই তো বল্লাম গোয়াড়ি গিয়ে চাকরির চেষ্টা করি।

—যদি সেখানে না পান?

—তবে কলকাতা যাবো। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতায় যাতায়াত অভ্যাসনেই—অত বড় শহরে থাকাও অভ্যাস নেই—ভয় করে।

—আমার একটা কথা শুনবেন জ্যাঠামশায়?

—কি?

—শোনেন তো বলি।

—বলো না মা কি বলবে?

—আমার সেই গহনা বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি করে আপনাকে দুশো টাকা এনে দিই।আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পসার জমে—এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কত্তির হোটেলের পাশেইখুলুন। পদ্ম চোখ টাটিয়ে মরুক। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায়—আপনার উন্নতিহবে—কোথায় যাবেন এ বয়সে পরের চাক্‌রি করতে!

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কি চমৎকার, এই অদ্ভুত মেয়ে কুসুম! মেয়েইবটে তাহার। কিন্তু তাহা হইবার নয়—নানা কারণে। কুসুমের টাকায় রাণাঘাটে হোটেলখুলিলে পাঁচজন পাঁচরকম বদনাম রটাইবে

উভয়ের নামে। তাহার উপকার করিয়ানিরপরাধিনী কুসুম কলঙ্ক কুড়াইতে যাইবে কেন? ওই পদ্ম ঝি-ই সাতরকম রটাইয়াবেড়াইবে গাত্রদাহের জ্বালায়।

তা ছাড়া যদি লোকসানই হয়, ধরো—(যদিও হাজারির দৃঢ় বিশ্বাস সে হোটেল খুলিলে লোকসান হইবে না) তাহা হইলে কুসুমের টাকাগুলি মারা পড়িবে। না, তারদরকার নাই।

—মা কুসুম, একবার তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার ও টাকা নেওয়া হবে না। আবার কেন সে কথা?...আমাকে এই গাড়িতে গোয়াড়ি যেতে হবে, উঠি।

কুসুম গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা, কথা দিয়ে যান যদি গোয়াড়িতেচাকুরি না জোটাতে পারেন তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন?

—তোমার কাছে মা? কেন বলো তো?

—এসে ওই টাকা নিতে হবে। হোটেল খুলতে হবে। ও টাকা আপনার হোটেলেরজন্যে তোলা আছে। শুধু আপনার ভালোর জন্যেই বলচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়।আমার স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু'পয়সা আমিও পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বা?

হাজারি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা কথা দিয়ে গেলাম। তবে আসি মা আজ। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।

—মনে রাখবেন মেয়ের কথা।

—তুমিও মনে রেখো তোমার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথা—

—ইস্! আমার জ্যাঠামশায় বুড়ো বৈকি?

—না, ছেচল্লিশ বছর বয়েস হয়েচে—বুড়ো নয় তো কি?

—দেখায় না তো বুড়োর মত। বয়েস হলেই হোলো? আসবেন আবার কিন্তু তাহলে।

—আচ্ছা মা।

হাজারি পুঁটুলি লইয়া বাটীর বাহির হইল। কুসুম তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্তআসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

রাণাঘাট হইতে বাহির হইয়া হাজারি হাঁটাপথে চাকদার দিকে রওনা হইল। প্রথমেডাকঘর হইতে বাড়ীতে দু'টি টাকা মনিঅর্ডার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু ডাকঘরে গিয়া দেখিল মনিঅর্ডার নেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাকঘর খোলা না থাকার জন্য পরে হাজারি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। চাকদাযাইবার মাঝপথে সেগুন-বাগানের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। একটা সেগুন গাছের তলায় দুখানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজন নামিয়া গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। হাজারি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সম্মুখের পূর্ণিমায় কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানের মেলা উপলক্ষ্যেউহারা মেলায় দোকান করিতে যাইতেছে। হাজারি তাহাদের সঙ্গ লইল।

রাত্রে আহারাদির পরে সবাই গাছতলায় শুইয়া রাত্রি কাটাইল—দোকানের মালিকেরনাম প্রিয়নাথ ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, মনোহারি দোকান লইয়া ইহারা মেলায় যাইতেছে। হাজারির পরিচয় পাইয়া ধর মহাশয় প্রস্তাব করিল মেলায় কয়দিন তাহারাকেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, এই কয়দিন হাজারি যদি রান্না করিয়া সকলকে খাওয়ায় তবে সে দৈনিক খোরাকি ও মেলা অন্তে কয়দিনের মজুরি স্বরূপ দুই টাকা পাইবে।

প্রিয়নাথ ধরের দোকান তিনখানি—একখানি তার নিজের, অপর দুইখানি তাহার জামাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের। কম মাহিনায় যে ওস্তাদ রাঁধুনী পাইয়াছে, হাজারির প্রথমদিনের রন্ধনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। সকলেই খুব খুশি।

মেলায় পৌঁছিয়া কিন্তু হাজারি দেখিল, রান্নার চেয়েও অধিকতর লাভের একটিব্যবসা এই মেলাতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে জিনিসপত্র কিনিয়াআনিয়া তেলেভাজা কচুরি সিঙ্গাড়ার দোকান খুলিয়া বসিল ধর মহাশয়ের বাসারএকপাশে। বিনামূল্যে কচুরি খাইবার লোভে ধর মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না।

কয়দিন দোকানে অসম্ভব রকমের বিক্রী হইল। মূলধন ছিল আগের সেই দুই টাকা—শেষে খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে হাজারি ধর মহাশয়ের তহবিল হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইল।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট উঠানো হইল। মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধরমহাশয়ের তহবিলের দেনা শোধ করিয়া ও সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়া হাজারি দেখিল সাড়ে তেরো টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ধর মহাশয়দের রান্নার মজুরি দুই টাকা লইয়া মোট সাড়ে পনেরো টাকা।

প্রিয়নাথ ধর বলিলেন—ঠাকুর মশায়, আপনার রান্না যে এত চমৎকার, তা যখন আপনাকে সেগুন বাগানে প্রথম কাজে লাগালুম, তখন ভাবিনি। আমি বড়লোক নই, বাড়ীতে মেয়েরাই রাঁধে, না হোলে আপনাকে আমি ছাড়তুম না কিছুতেই।

বাড়ীতে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাজারির মন খানিকটা সুস্থ হইল। এখনসংসারের ভাবনা সম্বন্ধে মাসখানেকের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে। এই এক মাসের মধ্যে নতুন কিছু অবশ্যই জুটিয়া যাইবে।

কালীগঞ্জ হইতে যশোর যাইবার পাকা রাস্তা বাহিয়া হাজারি আবার পথ চলিল।এই পথের দুধারে বনজঙ্গল বড় বেশী—পূর্বে গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাওয়াতে অনাবাদী মাঠ ও বিধ্বস্ত পুরাতন গ্রামগুলি বনে-জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলা কালীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়াছে, যখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়-হয়, তখনএকটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের ছায়ায় সে আশ্রয় লইল। অল্প দূরে একখানা ক্ষুদ্র চাষাদের গ্রাম। একটি ছোট ছেলে গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল গ্রামখানার নাম নতুন পাড়া। বেশীর ভাগ গোয়ালাদের বাস।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমেই যে খড়ের বড় আটচালা ঘরখানা দেখিল তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক কাহাকেও দেখিল না। একদিকে বড় গোয়াল, অনেকগুলি বলদ গরুবিচালির জাব খাইতেছে।

একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। হাজারি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—খুকী শোনো—বাড়ীতে কে আছে? মেয়েটি ভয় পাইয়া কোনো উত্তর না দিয়াই বাড়ীরভিতর ঢুকিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে বাড়ীর মালিক আসিল। তাহার নাম শ্রীচরণঘোষ। হাজারিকে সে খুব খাতির করিয়া বসাইল, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাংরান্না-খাওয়া করিতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা জলচৌকি ও এক বালতিজল আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল।

ইহারাও গোয়ালঘরের একপাশে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। সেখানে বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কুসুমের কথা। কুসুমও তাহাকে সেদিনগোয়ালঘরেই রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল—কুসুমও গোয়ালার মেয়ে।

বোধ হয় সেই জন্যই—ইহারা গোয়ালা শুনিয়াই—হাজারি ইহাদের বাড়ী আসিয়াছিল—মনের মধ্যে কোন্ গোপন আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। হঠাৎ সেআশ্চর্য হইয়া গোয়ালঘরের দরজার দিকে চাহিল।

একটি অল্পবয়সী বৌ আধঘোমটা দিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিয়া একচুব্‌ড়ি শাক লইয়ালাজুক ভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছে। শাকগুলি সদ্য জল হইতে ধুইয়া আনা— চুব্‌ড়ি দিয়া জল ঝরিয়া গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। হাজারি ব্যস্তহইয়া বলিল—এসো মা এসো—কি ওতে?

বউটি লাজুক মুখে একটু হাসিয়া বলিল—চাঁপানটে শাক। এখানে রাখি?

বউটি কুসুমের অপেক্ষাও বয়সে ছোট। হঠাৎ একটা অকারণ স্নেহে হাজারির মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—রাখো মা রাখো—

—খানিকটা পরে বউটি আবার ঘরের মধ্যে গোটাকতক কাঁঠাল-বীচি লইয়া ঢুকিল।এবার সে যেন অনেকটা নিঃসঙ্কোচ, পিতার বয়সী এই শান্ত, প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের নিকটসঙ্কোচ করিতে তাহার বাধিতেছিল হয়তো।

হাজারিকে বলিল—কাঁঠাল-বীচি খান?

—খাই মা, কিন্তু ওগুলো কেটে দেবে? আমি ডাল চড়িয়েচি, আবার কুটি কখন?

বউটি এক পাথরের বাটিতে কাঁঠাল-বীচি আনিয়াছিল। বাটিটা নামাইয়া ছুটিয়া গিয়াএকখানা বঁটি লইয়া আসিল এবং বীচিগুলি কুটিতে আরম্ভ করিল। হাজারির মন তৃষিতছিল, ইহারা সবাই মেয়ের মত, সবাই ভালবাসে, সেবা করে, মনের দুঃখ বোঝে।

হাজারি কোন কথা বলিবার আগেই বউটি বলিল—আপনার গাঁয়ে আমি কতগিইচি।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—আমার গাঁ কোথায় তুমি কি করে জানলে? তুমিসেখানে কি করে গেলে?

—গঙ্গাধর ঘোষ আমার পিসেমশাই—

—ওহো—তুমি জীবনের ভাইঝি! তা হলে কুসুমকে তো চেনো—

—কুসুমদিদিকে তার বিয়ের আগে অনেকবার দেখেচি, বিয়ের পরে আর কখনও দেখিনি। সে আজকাল কোথায় থাকে জানেন নাকি?

—সে থাকে রাণাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। তবে তোমাকে মা বলে খুব ভাল করেচি, কুসুম আমার মেয়ে।

বউটি বীচি কোটা বন্ধ রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর হইতেই প্রণাম করিল।

—এসো মা চিরজীবী হও, সাবিত্রী-সমান হও।

বউটি হাসিয়া বলিল—আপনি যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, তখনই আপনাকে দেখেআমি চিনেচি। আমি শাশুড়ীকে গিয়ে বল্লাম আমার পিসিমার গাঁয়ের মানুষ উনি—তখন শাশুড়ী গিয়ে শ্বশুরকে জানালেন।

—বেশ মা বেশ। আসবো যাবো, আমার আর একটি মেয়ে হোল, তার সঙ্গে দেখাশুনা করে যাবো। ভালই হোল।

বউটি সলজ্জভাবেবলিল—আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দেবো না—থাকতে হবে এখন এখানে—

—না মা, আমার থাকা হবে না।

—না তা হবে না। যান দিকি কেমন করে যাবেন? আমি জোর করতে পারিনেবুঝি?

—অবিশ্যি পারো মা, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, আবার সুদিন পেলে এসেদু'দিন থেকে যাবো—

বউটি হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন, কি হয়েছে আপনার?

হাজারির স্বভাবদুর্বল মন, সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া গলিয়া গেল। সে তাহার চাকুরি যাওয়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গেল—ডাল নামাইয়া চচ্চড়িরাঁধিবার ফাঁকে ফাঁকে। একটু গর্ব করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না।

—রান্না যা করতে পারি মা, তোমার কাছে গোমর করে বলচি নে, অমন রান্না রাণাঘাটের কোনো হোটেলে কোনো বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে না। হয় না হয়—মা— এই তোমাদের এখানে এই যে চচ্চড়ি

রাঁধচি, তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেখাবো; আমি জোর করে বলতে পারি এরকম চচ্চড়ি কখনও খাওনি, আর কখনও খাবে না।

বউটি বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাজারির দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল।বলিল—তা হলে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে খুড়োমশাই—

—একদিনের কর্ম নয় সে। শেখালেও শিখতে পারা কঠিন হবে—তোমায় ফাঁকিদেওয়া আমার ইচ্ছে নয় মা। এ শেখা এক আধ দিনে হয় কখনো?

—তা আপনি যদি অমন রাঁধুনী, আপনার আবার চাক্‌রির ভাবনা কি? কত বড়লোকের বাড়ী ভাল মাইনে দিয়ে রাখবে—

—অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় মা, কিছুতেই কিছু হয় না। হাতে টাকা থাকে দু'দিনচেষ্টা-চরিত্তির করে বেড়াতে পারি। বেড়াবো কি, রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে কি না।

—ক'টাকা লাগবে বলুন!

—কেন, তুমি দেবে নাকি?

—যদি দিই?

—সে আমি নিতে পারি নে। কুসুম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আমি নেবো কেন? তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুলি পুঁজি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতিকরতে চাই নে।

—আচ্ছা, আপনাকে যদি টাকা ধার দিই? আপনাকে বলি শুনুন খুড়োমশায়।আমার মার কাছ থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম। এখানে রাখবার জো নেই। একটা কথা বলবো?

এদিক ওদিক চাহিয়া সুর নীচু করিয়া বলিল—ননদ আর জা ভাল লোক নয়। এখুনি যদি টের পায় নিয়ে নেবে। আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেনকত করে বলুন?

এই কুসীদ-লোভী সরলা মেয়েটির প্রতি হাজারির প্রৌঢ় মন করুণায় ও মমতায়গলিয়া গেল। সে আরও খানিক মজা দেখিতে চাহিল।

—এমনি টাকা দেবে মা? আমায় বিশ্বাস কি?

—তা বিশ্বাস না করলে কি এ কারবার চলে? আর আপনি তো চেনা লোক। আপনার গাঁ চিনি, বাড়ী চিনি।

—চিন্‌লেই হোল? একটা লেখাপড়া করে নেবে না? কত টাকা দিতে চাও?

—আমার কাছে আছে আশি টাকা। সবই দিতে পারি আপনি যদি নেন। সুদ কতদেবেন?

কত করে চাও?

—আপনি যা দেবেন। টাকায় দু পয়সা করে রেট্, আপনি এক পয়সা দেবেন, কেমনতো? আপনার পায়ে পড়ি খুড়োমশায়, টাকাগুলো আলাদা আমার তোরঙ্গতে তোলা আছে। কেউ জানে না। আপনাকে এনে দিই, টাকাগুলো খাটিয়ে দিন আমায়। কাকে বিশ্বাস করে দেবো, কে নিয়ে আর দেবে না।

—কই, লেখাপড়ার কথা বল্লে না তো?

—আমি লেখাপড়া জানি নে— কি লেখাপড়া করে নেবো! আপনি চান একটা কিছুলিখে দিয়ে যান। কিন্তু তাতে লোক-জানাজানি হবে। সে কাজের দরকার নেই। আপনিনিয়ে যান। আমি দিচ্চি মিটে গেল। এর আর লেখাপড়া কি?

ইতিমধ্যে রান্নাবান্না শেষ হইয়া গেল। বউটি একঘটি দুধ আনিয়া বলিল—এইউনুনটা পেড়ে দুধটুকু জ্বাল দিয়ে খেতে বসুন—বেলা কি কম হয়েছে?

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। হাজারির কথা মিথ্যা নয়—গোয়ালাবাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, এরকম রান্না খাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য জিনিস যে খাইতেএমনধারা হয় তাহা শোনেও নাই।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া হাজারি যাইবার জন্য তৈরী হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল আর একবার বউটির সঙ্গে দেখা করে। পল্লীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পর্দা নাই সে জানে, বিশেষত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির মেয়েদের মধ্যে। মেয়েটিকে তাহারভাল লাগিয়াছিল উহার সরলতার জন্য এবং বোধ হয় টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথাটা আরএকবার বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ইতিমধ্যে একটা মতলব মাথায় আনিয়াফেলিয়াছে। কুসুম এবং এই মেয়েটি যদি তাহাকে টাকা দেয় তবে সে তাহার চিরদিনেরস্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। ইহাদের টাকা সে নষ্ট করিবে না—বরং অনেকগুণ বাড়াইয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। খাইতে বসিয়া হাজারি এসব কথাভাবিয়া দেখিয়াছে।

ইহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হইলে একটা পুকুরের ধারদিয়া যাইতে হয়—একটা বড় তেঁতুল গাছ এবং তাহার চারিপাশে অন্যান্য বন্য গাছের ঝোপ জায়গাটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে বাহির হইতে হঠাৎ সেখানে কেহ থাকিলে তাহাকে দেখা যায় না।

পুকুরের পাড় ছাড়াইয়া হাজারি হঠাৎ দেখিল মেয়েটি তেঁতুলগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়াআছে যেন তাহারই অপেক্ষায়।

—চল্লেন খুড়োমশায়?

—হ্যাঁ যাই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

—আপনি এই পথ দিয়ে যাবেন জানি, তাই দাঁড়িয়ে আছি। দুটো কথা আপনাকে বলবো। আপনার হাতের রান্না চচ্চড়ি খেয়ে ভাল লেগেছে খুড়োমশায়। আমরাও তোরাঁধি, রান্নার ভাল মন্দ বুঝি। অমন রান্না কখনো খাইনি। আর একটা কথা হচ্ছে,আমার টাকাটার কথা মনে আছে তো? কি করলেন তার? জানেন তো মেয়েরাশ্বশুরবাড়ীর লোকদের চেয়ে বাপের বাড়ীর লোকদের বেশী বিশ্বাস করে? এদের হাতে ও টাকা পড়লে দু'দিনে উড়ে যাবে।

—টাকা তোমার এখুনি নিতে পারবো না মা। কিন্তু আবার আমি এই পথে আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন হয়তো টাকার দরকার হবে, টাকা তখনহয়তো নিতে হবে।

—কত দিনের মধ্যে আসবেন?

—তা বলতে পারিনে, ধরো মাস দুই। পুজোর পরে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—কথা রইল তাহলে?

—ঠিক রইল। এসো এসো, লক্ষ্মী ছোট্ট মা আমার—সাবিত্রী-সমান হও, আশীর্বাদকরি তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হাজারি আবার পথ চলিতে লাগিল। গোয়ালাবাড়ীর সবাই এবেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, বউটি তো বিশেষ করিয়া। কিন্তুথাকিবার উপায় নাই, একটা কিছু যোগাড় না করা পর্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই।

মেয়েটি খুব আশ্চর্য ধরনের বটে। নির্বোধ হয় তো—কুসুমের মত বুদ্ধিমতী নয়ঠিকই, তবুও বড় ভাল মেয়ে।

পথের দুধারে বনজঙ্গল ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে—পথ নদীয়া জেলা হইতে যতযশোর জেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেছে এই বন ক্রমশ বাড়িতেছে। স্থানে স্থানেবনজঙ্গল এত ঘন যে হাজারির ভয় করিতে লাগিল দিনমানেই বুঝি বাঘের হাতে পড়িতে হয়। লোকের বসতি এসব স্থানে বেশী নাই, ভয় করিবারই কথা।

সন্ধ্যার পূর্বে বেলের বাজারে আসিয়া পৌঁছিল। আগে যখন রেল হয় নাই, তখনবেলের বাজার খুব বড় ছিল, হাজারি শুনিয়াছে তাহার গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মুখে।এখনও পূর্ব অঞ্চল হইতে চাকদহে গঙ্গায় শবদাহ করিতে আসে বহুলোক—তাহাদের জন্যই বেলের বাজার এখনও টিকিয়া আছে।

হাজারি বেলের বাজার দেখিয়া খুশী হইল ও আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও দেখে নাই। চমৎকার জায়গা বটে। এইতাহা হইলে বেলে! তাহার এক মামাতো ভাই যশোর অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে শব লইয়া চাকদহে এই পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে বেলের বাজারের কাছে ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হয়—এ গল্প উক্ত মামাতোভাইয়ের মুখেই দু-তিনবার সে শুনিয়াছে।

হাজারি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের দোকানগুলি দেখিতে লাগিল। সর্বসুদ্ধ ন'খানাদোকান, ইহারই মধ্যে চাল ডাল মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান সব। একজন দোকানদারকে বলিল—একটু তামাক খাওয়াতে পারেন মশায়?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই ঠাকুর মশায়। আসুন, কোথায় যাওয়া হবে?—বসুন, ওরে বামুনেরহুঁকোতে জল ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

দোকানখানি কিসের তাহা হাজারি বুঝিতে পারিল না। এক পাশে চিটা গুড়ের ক্যানেস্ত্রা চাল পর্যন্ত একটার গায় একটা উঁচু করিয়া সাজানো আছে—আর এক পাশে বড় বড় বস্তা। দোকানদার বৃদ্ধ, বয়স পঁয়ষট্টি হইতে সত্তর হইবে, রোগা একহারাচেহারা, গলায় মালা।

—নিন্ ঠাকুর মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। কোথায় যাওয়া হবে?

—যাচ্ছি কাজের চেষ্টায়, রাণাঘাটে হোটেলে সাত বছর রেঁধেছি, বেচু চক্কত্তিরহোটেলে। নাম শুনেছেন বোধ হয়। ভাল রাঁধুনী বলে নাম আছে কিন্তু— চাকুরিটুকু গিয়েছে—এখন বলি যাই তো একবার এই দিক পানে—যদি কোথাও কিছু জোটে।

দোকানদার পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রমের চোখে হাজারিকে দেখিল। নিতান্ত গ্রাম্যঠাকুর পূজারী বামুন নয়—রাণাঘাটের মত শহর বাজারের বড় হোটেলে সাত-আট বছর সুখ্যাতির সঙ্গে রান্নার কাজ করিয়াছে, কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কত বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে—না, লোকটা সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়।

হাজারি বলিল—রাত হয়ে আসচে, একটু থাকার জায়গার কি হয় বলতে পারেন?

দোকানদার অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল—এইখানেই থাকুন, এর আর কি! আমার ওই পেছন দিকে দিব্যি চালা রয়েচে, একখানা তক্তপোশ রয়েচে। চালায় রান্না করুন, তক্তপোশে শুয়ে থাকুন।

কথায় কথায় হাজারি বলিল—আচ্ছা এখানে গঙ্গাযাত্রী দিনে কত যাতায়াত করে?

—সে দিন আর নেই বেলের বাজারের। আগে আট দশ দল, এক এক দলে দশবারো জন করে মানুষ, এ নিত্য যেত। এখন কোনোদিন মোটেই না, কোনোদিন তিনটে, বড্ড জোর চারটে। আগে লোকের হাতে পয়সা ছিল, মড়া গঙ্গায় দিত—আজকাল হাতে নেই পয়সা—ম'লে নদীর ধারে, খালের ধারে, বিলের ধারে পুড়োয়।

হাজারি ভাবিতেছিল বেলের বাজারে একখানা ছোটখাটো হোটেল চলিতে পারে কিনা। তিন দল গঙ্গাযাত্রীতে ত্রিশটি লোক থাকিলে যদি সকলে খায়, তবে ত্রিশজন খরিদ্দার। ত্রিশজন খরিদ্দার রোজ খাইলে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে খরচ-খরচা বাদে। সেই জায়গায় কুড়ি জন হোক, দশ জন হোক রোজ—তবুও পরের চাকুরির চেয়ে ভাল। পরের চাকুরি করিয়া পাইতেছে সাত টাকা আর অজস্র অপমান-বকুনি। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা দশ জন খরিদ্দার যে হোটেলে রোজ খায়, সেখানেঅন্তত বারো-তেরো টাকা মাসে লাভ থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে গোপালনগরের দিকে রওনা হইল। হাতের পয়সা এখনও যথেষ্ট—পাঁচ টাকা আছে, কোনো ভাবনা নাই। কাল রাত্রে দোকানদার চালডাল হাঁড়ি কিনিয়া আনিতে চাহিয়াছিল, হাজারি তাহাতে রাজী হয় নাই। নিজে পয়সাখরচ করিয়াছে।

দুপুরের রৌদ্র বড় চড়িল। নির্জন রাস্তা, দুধারে কোথাও ঘন বনজঙ্গল, কোথাওফাঁকা মাঠ, লোকালয় চোখে পড়ে না, এক-আধখানা চাষাদের গ্রাম ছাড়া। ঘণ্টা দুইহাঁটিবার পরে হাজারির তৃষ্ণা পাইল। কিছুদূরে একটা ছোট পুকুর দেখিয়া তাহার ধারেবসিতে যাইবে এমন সময় একখানা খালি গরুর গাড়ী পুকুরের পাশের মেটে রাস্তা দিয়ানামিতে দেখিল। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল—কাছে কোনো গ্রাম আছে বাপু? একটুজল খাবো। ব্রাহ্মণ।

গাড়োয়ান বলিল—আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর মশায়, কাছেই ছিনগর-সিম্‌লে, আমি বামুন বাড়ী যাবো।তেনাদের গাড়ী—গাড়ীতে আসুন।

হাজারি শ্রীনগর-সিম্‌লে গ্রামের নাম শুনিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে দেখিলএ তো গ্রাম নয়—বিজন বন। এতখানি বেলা চড়িয়াছে, এখনও গ্রামের মধ্যে সূর্যেরআলো প্রবেশ করে নাই; শুধু আম-কাঁটালের প্রাচীন বাগান, বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল।

একটা গৃহস্থ-বাড়ীর উঠানে গরুর গাড়ী গিয়া থামিল। গাড়োয়ানের ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে গৃহস্বামী আসিলেন, ম্যালেরিয়া-শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল প্রায় উঠিয়াগিয়াছে, বয়স ত্রিশও হইতে পারে পঞ্চাশও হইতে পারে। তিনি বাহিরে আসিয়াইহাজারিকে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—কে রে সঙ্গে?

গাড়োয়ান বলিল—এজ্ঞে উনি পাকা রাস্তায় মুদির পুকুরের ধারে বসেছিলেন, বল্লেন একটু জল খাবো—তা বল্লাম চলুন আমার সঙ্গে—আমার মনিবেরা ব্রাহ্মণ—সেখানে জল খাবেন, তাই সঙ্গে করে আনলাম।

গৃহস্বামী আগাইয়া আসিয়া হাজারিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। বসুন, বিশ্রাম করুন। ওরে চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোশে মাদুরটা পেতে দে,—আসুন।

এসব পল্লী-অঞ্চলে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। আধঘণ্টা পরে হাজারি হাতপা ধুইয়া বসিয়া গাছ হইতে সদ্য পাড়া কচি ডাবের জল পান করিয়া সুস্থ ও খোশমেজাজেহুঁকা টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর নাম বিহারীলাল বাঁড়ুয্যে। চাকুরি জীবনে কখনো করেন নাই, যথেষ্টধানের আবাদ আছে, গরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, আম-কাঁটালের বাগান আছে।এসব কথা গৃহস্বামীর নিকট হইতেই হাজারি গল্পচ্ছলে শুনিল।

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিতেছিলেন, শ্রীনগর-সিম্‌লে মস্ত গ্রাম ছিল, রাজধানী ছিল কেষ্ট নগরের রাজাদের পূর্বপুরুষের। জঙ্গলের মধ্যে রাজার গড়খাই আছে, পুরোনো ইটের গাঁথুনি আছে, দেখাবো এখন ওবেলা। না না, আজ যাবেন কি? ওসব হবে না। দু'দিনথাকুন, আমাদের সবই আছে, আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে, তবে মানুষজনের মুখদেখতে পাইনে এই যা কষ্ট। ছেলেবেলাতেও দেখেছি গাঁয়ে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন দাঁড়িয়েচে সাত-ঘর মোট—তার মধ্যেও দু-ঘর আছে বারোমাস বিদেশে। আপনার নিবাস কোথায় বল্লেন?

—আজ্ঞে, এঁড়োশোলা—গাংনাপুর থেকে নেমে যেতে হয়।

—তবে তো আপনি আমাদের এদেশেরই লোক। আসুন না আমাদের গাঁয়ে? জায়গা দিচ্ছি, জমি দিচ্ছি, ধান করুন, পাট করুন, বাস করুন এখানে। তবুও এক ঘর লোক বাড়ুক গ্রামে। আসুন না?

হাজারি শিহরিয়া উঠিল। সর্বনাশ! এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করিতেআসিবে—সেইটুকু অদৃষ্টে বাকি আছে বটে! শহর বাজারে থাকিয়া সে শহরের কল-কোলাহল কর্মব্যস্ততাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—এই বনের মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইতে হয় যে বৃদ্ধ বয়সে। ছেচল্লিশ বৎসর বয়স তার—দিন এখনও যায় নাই, এখনও যথেষ্টউৎসাহ শক্তি তার মনে ও শরীরে। তা ছাড়া সে বোঝে হোটেলের কাজ, একটা হোটেলখুলিতে পারিলে তাহার বয়স দশ বছর কমিয়া যাইবে—নব যৌবন লাভ করিবে সে। চাষবাসের সে কি জানে?

হোটেলের কথা হাজারি এখানে বলিল না। সে জানে হোটেলওয়ালা বামুন বলিলেঅনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখে—বিশেষত এই সব পাড়াগাঁয়ে।

শ্রীনগরে হাজারির মোটেই মন টিকিতেছিল না—এত বনজঙ্গলের অন্ধকার ওনির্জনতার মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৈকালের দিকেই সে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পথে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল—বাপ রে! কুড়িবিঘে ধানের জমি দিলেও এ গাঁয়ে নয় রে বাবা! মানুষ থাকে এখানে? মানুষজনেরমুখ দেখার যো নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই— কুঁড়ের মত বসে থাকো আর গোলারধানের ভাত খাও—সর্বনাশ!...আর কি জঙ্গল রে বাবা!...

রাস্তার ধারে একটা লোক কাঠ ভাঙিতেছিল। হাজারি তাহাকে বলিল—সামনে কিবাজার আছে বাপু?

লোকটা একবার হাজারির দিকে নীরবে চাহিয়া দেখিল। পরে বলিল—আপনি কিআলেন সিম্‌লে থে?

—হ্যাঁ।

—ওখানে আপনাদের এত্ম্য-কুটুম্ব আছেন বুঝি? আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই। কোথায় যাবেন আপুনি?

হাজারি জানে পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে এই সব শ্রেণীর লোক তাহাকে অকারণে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া মারিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব। হাজারিও পূর্বে এইরকম ছিল—কিন্তু রাণাঘাট শহরে এতকাল থাকিয়া বুঝিয়াছে অপরিচিত লোককে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই বা করিলে লোকে চটে। হাজারি বর্তমান প্রশ্নকর্তারহাত এড়াইবার জন্য সংক্ষেপে দু-একটি কথার উত্তর দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাস করিল—সামনে কি বাজার পড়বে বাপু?

—এজ্ঞে যান, গোপালনগরের বড় বাজার পড়বে—কোশ দুই আর আছেন।

গোপালনগরের নাম হাজারির কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এদিকের বড় গঞ্জ গোপালনগর, সকলেই নাম জানে।

মধ্যাহ্নভোজনটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, রাত্রে খাইবার আবশ্যক নাই। একটুআশ্রয় পাইলেই হইল। সুতরাং হাজারির মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। এ কয়দিন সে যেননূতন জীবন যাপন করিতেছে—সকালে উঠিবার তাড়া নাই, পদ্ম ঝিয়ের মুখনাড়ানাই—বেচু চক্কত্তির কাছে বাজারের হিসাব দিতে যাওয়া নাই—দশ সের কয়লা জ্বলাঅগ্নিকুণ্ডের তাতে বসিয়া সকাল হইতে বেলা একটা এবং ওদিকে সন্ধ্যা হইতে রাতবারোটা পর্যন্ত হাতাখুন্তি নাড়া নাই, বাঁচিয়াছে সে!

পথের ধারে একটা গাছতলায় পাকা বেল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাজারি সেটাসংগ্রহ করিয়া লইল। কাল সকালে খাওয়া চলিবে।

সব ভাল—কিন্তু তবুও হাজারির মনে হয়, এ ধরনের ভবঘুরে জীবন তাহারপছন্দসই নয়। বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি হইবে? চাকুরি জোটে তো ভাল, নতুবা এ ধরনের জীবন সে কতকাল কাটাইতে পারে?...একমাসও নয়। সে চায় কাজ, পরিশ্রম করিতে সে ভয় পায় না, সে চায় কর্মব্যস্ততা, দু-পয়সা উপার্জন, নাম, উন্নতি। ইহারউহার বাড়ী খাইয়া বেড়াইয়া, পথে পথে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

গোপালনগর বাজারে পৌঁছিতে বেলা গেল। বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি ছোটবড় দোকান, ভাল ব্যবসার জায়গা বটে। হাজারি একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনেরটিউবওয়েলে হাতমুখ ধুইয়া লইল। নিকটে একটা কালীমন্দির—মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া সম্ভবত মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হুঁকা টানিতেছে দেখিয়া হাজারি তামাক খাইবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একবার তামাক খাওয়াবেন?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—বসুন, এই নিন।

—আপনি কি মন্দিরে মায়ের পূজো করেন?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্চে?

—আমার বাড়ী গাংনাপুরের সন্নিকটে এঁড়োশোলা। রাঁধুনীর কাজ করি—চাকুরিরচেষ্টায় বেরিয়েচি। এখানে কেউ রাঁধুনী রাখবে বলতে পারেন?

—একবার এই বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন। ওঁরা বড়লোক, রাঁধুনীওঁদের বাড়ীতে থাকেই—বাবুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে আছে, যদি এ সময় নতুন লোকের দরকার-টরকার পড়ে—ওঁরা জাতে তিলি, বাজারের সেরা ব্যবসাদার, ধনী লোক।

হাজারি কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া দেখিল একজন শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার লোক গদির উপর বসিয়া আছে। সেই লোকটিই যে দোকানের মালিক, ইহা কেহ বলিয়া না দিলেও বোঝা যায়। হাজারিকে ঢুকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—আসুন, কি চাই? ওদিকে যান—ওহে, দেখ ইনি কি নেবেন—

বলিয়া লোকটি দোকানের অন্য যে অংশে অনেকগুলি কর্মচারী কাজ-কর্ম ও কেনা-বেচাকরিতেছে সে দিকটা দেখাইয়া দিল।

হাজারি বলিল—বাবু, দরকার আপনার কাছে। আমি রান্না করি, ব্রাহ্মণ—শুনলাম আপনার বাড়ীতে রাঁধুনী রাখবেন—তাই—

—ও! আপনি রান্না করবেন? রাঁধতে জানেন ভাল? কোথায় ছিলেন এর আগে?

—আজ্ঞে রাণাঘাট হোটেলে ছিলাম সাত বছর।

—হোটেলে? হোটেলের কাজ আর বাড়ীর কাজ এক নয়। এ খুব ভাল রান্না চাই। আপনি কি তা পারবেন? কলকাতা থেকে কুটুম্ব আসে প্রায়ই—

হাজারি হাসিয়া ভাবিল—তুমি আর কি রান্না খেয়েছ জীবনে, কাপড়ের দোকান করেই মরেছ বই তো নয়। তেমন রান্না কখনো চোখেও দেখনি।

মুখে বলিল—বাবু, একদিনের জন্যে রেখে দেখুন না হয়। রান্না ভাল না হয়, এমনিচলে যাব। কিছু দিতে হবে না।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসাদার, লোক চেনে। হাজারির কথার ধরন দেখিয়াবুঝিল এ বাজে কথা বলিতেছে না। বলিল—আচ্ছা আপনি আমাদের বাড়ী যান। এইসামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে

দেখবেন বড় বাড়ী—ওরে নিতাই, তুই বাপুএকবার যা তো, ঠাকুর মশায়কে বাড়ীতে শশধরের হাতে তুলে দিয়ে আয়। বলগে, ইনি আজ থেকে রাঁধবেন। বুঝলি? নিয়ে যা—মাইনে-টাইনে কিন্তু, ঠাকুর মশায়, পরেকাজ দেখে ধার্য হবে। হাঁ—সে দু-চারদিন পরে তবে—নিয়ে যা।

প্রথম দিনের কাজেই হাজারি নাম কিনিয়া ফেলিল। বাড়ীর কর্তা দশ টাকা বেতন ধার্য করিয়া দিলেন। তাহার গৃহিণী অসুস্থ প্রায় বারোমাস, উঠিতে বসিতে পারিলেওসংসারের কাজকর্ম বড় একটা দেখেন না—দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারাথাকে শ্বশুরবাড়ী। একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে, আর একটি আট বছরের ছোট মেয়ে।

বাড়ীর সকলেই ভাল লোক—এতদিন চাকুরি করিয়া হাজারির যে খারাপ ধারণাহইয়াছিল পরের চাকুরি সম্বন্ধে, এখানে আসিয়া তাহা চলিয়া গেল। ইহারা জাতিতেগন্ধবণিক, বাড়ীর সকলেই ব্রাহ্মণকে খাতির করিয়া চলে—হাজারির মৃদু স্বভাবেরজন্যও সে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

মাসখানেক কাজ করিবার পর হাজারি প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই বাড়ী যাইবারছুটি চাহিল।

অনেকদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই—টেঁপিকে কত কাল দেখে নাই। দোকানেরমালিক ছুটিও দিলেন।

গোপালনগর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী আসিতে প্রায় তিন আনা ট্রেনভাড়া লাগে।মিছামিছি তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া লাভ নাই। হাঁটাপথে মাত্র সাত-আট ক্রোশ হাজারিদের গ্রাম—হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

টেঁপি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবা এসো, এসো। কোত্থেকে এলে এখন?

তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বসিয়া গেল।হাজারির মনে হইল তার সারা দেহ-মন জুড়াইয়া গেল টেঁপির হাতের পাখার বাতাসে। টেঁপির জন্য খাটিয়া সুখ—যত কষ্ট যত দুঃখ রাণাঘাট হোটেলের—সব সে সহ্য করিয়াছে টেঁপির জন্য। ভবিষ্যতে আরও করিবে।

যদি বংশীধর ঠাকুরের ভাগিনেয় সেই ছেলেটির সঙ্গে—

যাক্ সে সব কথা।

টেঁপি বলিল—বাবা, অতসীদিদি একদিন তোমার কথা বলছিল—

—আমার কথা? হরিচরণবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ বাবা, বলছিল তুমি অনেকদিন আসোনি। চল না আজ, যাবে? ওখানে গিয়ে চা খাবে এখন। কলের গান শুনবে।

এই সময় টেঁপির মা ঘাট হইতে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিল। হাসিমুখে বলিল—কখনএলে?

হাজারি বলিল—এই তো খানিকক্ষণ। ভাল তো সব? টাকা পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ। ভাল কথা, ওদের বাড়ীর সতীশ বলছিল রাণাঘাট থেকে পাঠানো নয়টাকা। তুমি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

—রাণাঘাটের চাকরি করিনে তো। এখন আছি গোপালনগরে। বেশ ভাল জায়গায়আছি, বুঝলে? গন্ধবণিকের বাড়ী, ব্রাহ্মণ বলে ভক্তিছেদ্দা খুব। খাওয়া-দাওয়া ভাল। কাপড়ের মস্ত দোকান, দিব্যি জলখাবার দেয় সকালে বিকেলে।

টেঁপি বলিল—কি জলখাবার দেয় বাবা!

—এই ধরো কোন দিন মুড়ি নারকেল, কোন দিন হালুয়া।

টেঁপির মা বলিল—বোসো, জিরোও; চা নেই, তা হলে করে দিতাম। টেঁপি যাবি মা, সতীশদের বাড়ী চা আছে—(এই কথা বলিবার সময় টেঁপির মা ভুরু দুটি উপরেরদিকে তুলিয়া এমন একটি ভঙ্গি করিল, যাহা শুধু নির্বোধ মেয়েরা করিয়া থাকে)দুটো চেয়ে নিয়ে আয়।

টেঁপি বলিল—দরকার কি মা—আমি নিয়ে যাই না কেন বাবাকে অতসী দিদিদের বাড়ী? সেখানে চা হবে এখন—জলখাবার হবে এখন—

দু'-দু'বার টেঁপি অতসীদের বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছে সুতরাং হাজারি মেয়েরমতে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না। টেঁপির ইচ্ছা তাহার নিকট অনেকের হুকুমেরঅপেক্ষা শক্তিমান।

হরিচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন—হাজারিকে যত্ন করিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

—এসো এসো হাজারি, কবে এলে? ও টেঁপি, যা তো অতসীদিদিকে বলগেআমাদের চা দিয়ে যেতে। আমিও এখনো চা খাইনি—

—বাবু, ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল ছিলে? তোমার সেই হোটেলের কি হল? রাণাঘাটে আছ তো?

হাজারি সংক্ষেপে রাণাঘাটের চাকুরি যাওয়া হইতে গোপালনগরে পুনরায় চাকুরিপাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা করিল।

এক সময় অতসী ও টেঁপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের সামনের ছোট গোলটেবিলটাতে চা ও খাবার রাখিল। খাবার মাত্র এক ডিশ—শুধু হাজারির জন্য, হরিচরণবাবুএখন কিছু খাইবেন না।

হাজারি বলিল—বাবু, আপনার খাবার?

—ও তুমি খাও, তুমি খাও। আমার এখন খেলে অম্বল হয়, আমি শুধু চা খাবো।

হাজারি ভাবিল—এত বড়লোক, এত ভাল জিনিস ঘরে কিন্তু খাইলে অম্বল হয় বলিয়া খাইবার জো নাই এই বা কেমন দুর্ভাগ্য! বয়স ছেচল্লিশ হইলে কি হয়, অম্বলকাহাকে বলে সে কখনো জানে না। ভূতের মত খাটুনির কাছে অম্বল-টম্বল দাঁড়াইতেপারে না। তবে খাবার জোটে না এই যা দুঃখ।

অতসী কিন্তু বেশ বড় রেকাবি সাজাইয়া খাবার আনিয়াছে—ঘি দিয়া চিঁড়াভাজা, নারকেল-কোরা, দুখানা গরম গরম বাড়ীর তৈরী কচুরী ও খানিকটা হালুয়া, বড় পেয়ালার এক পেয়ালা চা। অতসী এটুকু জানে যে টেঁপির বাবা তাহার বাবার মত অল্পভোজী প্রাণী নয়, খাইতে পারে এবং খাইতে ভালবাসে। অবস্থাও উহাদের যে খুব ভাল, তাহাও নয়। সুতরাং টেঁপির বাবাকে ভাল করিয়াই খাওয়াইতে হইবে।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারিকাকাকে প্রণাম করেছ অতসী?

হাজারি ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অতসী তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামকরিতে সে চিঁড়াভাজা চিবাইতে চিবাইতে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না। অতসী কিন্তু চলিয়া গেল না, সে হাজারির সামনে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। টেঁপি গল্প করিয়াছে তাহার বাবা একজন পাকা রাঁধুনী, অতসীর কৌতূহলেরইহাই প্রধান কারণ।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এখন ক'দিন বাড়ীতে আছ?

—আজ্ঞেপরশু যাবো। পরের চাকরি, থাকলে তো চলে না।

—তোমার সেই হোটেল খোলার কি হোল?

—এখনও কিছু করতে পারিনি বাবু। টাকার যোগাড় না করতে পারলে তোবুঝতেই পারছেন—

—তা হলে ইচ্ছে আছে এখনও?

—ইচ্ছে আছে খুব। শীতকালের মধ্যে যা হয় করে ফেলবো।

অতসী বলিল—কাকা গান শুনবেন?

হরিচরণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ—আমি ভুলে গিয়েছি একদম। শোনো নাহাজারি, অনেক নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। নিয়ে এসো তো অতসী—শুনিয়ে দাওতোমার হাজারিকাকাকে।

হাজারি ভাবিল, বেশ আছে ইহারা। তাহার মত খাটিয়া খাইতে হয় না, শুধু গানআর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যা হইয়াছে, এ সময় উনুনে আঁচ দিয়া ধোঁয়ার মধ্যে ছোট্টরান্নাঘরে বসিয়া মনিব-গৃহিণীর ফর্দ মত তরকারি কুটিতেছে সে অন্য অন্য দিন। বারোমাসই তাহার এই কাজ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বারো মাস বলিয়াইপথে বাহির হইলেই তাহার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হইতেছে আজ, এমন চমৎকারসাজানো বৈঠকখানা, বড় আয়না, বেতমোড়া কেদারায় সে বসিয়া চা খাইতেছে, পাশেটেঁপি, টেঁপির বন্ধু কিশোরী মেয়েটি, কলের গান..যেন সব স্বপ্ন।

কতদিনকুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই! আজ রাণাঘাট ছাড়িয়াছে প্রায় চারি মাসেরউপর, এই চারি মাসকুসুমকে সে দেখে নাই। টেঁপিও মেয়ে, কুসুমও মেয়ে।

আর নতুন পাড়ার সেই বউটি! সে-ও আর এক মেয়ে। আজ কলের গানের সুমধুর সুরের ভাবুকতায় তাহার মন সকলের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলের গান বাজিল। হরিচরণবাবু মধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর কি কাজে উঠিয়া গেলেন, তখন রহিল শুধু অতসী আর টেঁপি। বাবার সামনে বোধ হয় অতসী বলিতে সাহস করিতেছিল না, হরিচরণবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে হাজারিকে বলিল—কাকাবাবু, আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন?

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা কেন দেব না মা? কিন্তু তুমি রান্না জানো নিশ্চয়,কি কি রাঁধতে পারো?

অতসী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝিল যাহার সহিত কথা বলিতেছে, রান্নার সম্বন্ধে সেএকজন ওস্তাদ শিল্পী। সঙ্গীতের তরুণী ছাত্রী যেমন সঙ্কোচের সহিত তাহার যশস্বী সঙ্গীত-শিক্ষকের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে কথা বলে—তেমনি সসঙ্কোচে বলিল—তাপারি সব, শুক্তুনি, চচ্চড়ি, ডাল, মাছের ঝোল—মা তো বড় একটা রান্নাঘরে যেতেপারেন না, তাঁর মন খারাপ, আমাকেই সব করতে হয়। টেঁপি বলছিল আপনি নিরিমিষরান্না বড় চমৎকার করেন, আমায় দেবেন শিখিয়ে কাকাবাবু?

—টেঁপি বুঝি এইসব বলে তোমার কাছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার, ওর কথাবাদ দাও—

—না কাকাবাবু, আমি অন্য জায়গাতেও শুনেচি আপনার রান্নার সুখ্যাতি। সবাইতো বলে।

পরে আবদারের সুরে বলিল—আমাকে শেখাতে হবে কাকাবাবু—আমি ছাড়চি নে, আমি টেঁপিকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, আপনি কবে আসবেন। আমি খোঁজ নিই—ওবলেনি আপনাকে? না কাকাবাবু, আমায় শেখান আপনি। আমার বড় শখ ভাল রান্নাশিখি।

হাজারি বলিল—ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্তত ঝাড়া দু' মাস তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে—তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরে দেবো, এ নাহোলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপির মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে ফাঁকি দেবো নামা, ছেলেমানুষ, শিখতে চাই শিখিয়ে দিতে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি করে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা!

অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মুখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা—বাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ, আনাড়ির কথাও নয়। তাহার চোখে হাজারি দরিদ্র রাঁধুনী বামুন পিতা নয়—যে ব্যবসায়সে ধরিয়াছে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ, পাকা শিল্পী।

হাজারির প্রতি তাহার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরদিন হাজারি ঘুম হইতে উঠিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অতসীকেতাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইল। বড়মানুষের মেয়ে অতসী, অসময়ে কি মনে করিয়া তাহার মত গরীব মানুষের বাড়ী আসিল?

টেঁপি বাড়ী ছিল না, টেঁপির মা-ও অতসীকে আসিতে দেখিয়া খুব অবাক হইয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, সেইভাবে জমিদারবাটীর মেয়ের অভ্যর্থনাকরিল।

অতসী বলিল কাকাবাবু বাড়ী নেই খুড়ীমা?

টেঁপির মা বলিল— মা, এসো আমার সঙ্গে, ঐ কোণের দাওয়ায় বসে তামাকখাচ্ছে।

—টেঁপি কোথায়?

—সে মূলোর বীজ আনতে গিয়েছে সদ্‌গোপ বাড়ীতে।-এল বলে, বসো মা, বসো। দাঁড়াও আসনখানা পেতে—

অতসী টেঁপির মার হাত হইতে আসনখানা ক্ষিপ্র ও চমৎকার ভঙ্গিতে কাড়িয়া লইয়া কেমন একটা সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিল—রাখুন আসন খুড়ীমা, ভারি আমিএকেবারে গুরুঠাকুর এলুম কিনা—তা আবার যত্ন করে আসন পেতে দিতে হবে—

এই হাসি ও এই ভঙ্গিতে সুন্দরী মেয়ে অতসীকে কি সুন্দরই দেখাইল!—টেঁপিরমা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতসীর দিকে। ইতিমধ্যে হাজারি সে স্থানে আসিয়াবলিল—কি মনে করে সকালে লক্ষ্মী-মা?

অতসী হাজারির কাছে গিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি কথা মা?

—চলুন ওদিকে, একটু আড়ালে বলব।

হাজারি ভাবিয়াই পাইল না, এমন কি গোপনীয় কথা অতসী তাহাকে আড়ালেবলিতে আসিয়াছে এই সকালবেলায়। দাওয়ায় ছাঁচতলার দিকে গিয়া বলিল—কিকথা মা?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—

হাজারি বিস্মিত মুখে বলিল—বলবো না মা, বলো তুমি।

—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো এবার নয়, সেবার। তোমায় কে বললে এসব কথা?

—সে সব কিছু বলব না। আমি আপনাকে টাকা দেবো, আপনি হোটেল খুলুন।

—তুমি কোথায় পাবে?

অতসী হাসিয়া বলিল—আমার কাছে আছে। দু-শো টাকা দিতে পারি—আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দেবো কিন্তু, বাবা যেন জানতে না পারেন। কেউ জানতে না পারে।

হাজারির চোখে জল আসিল।

এ পর্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকেতাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে—তিনজনেই সমান সরলা, তিনজনেইঅনাত্মীয়া—তবে অতসী জমিদারবাড়ীর সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে, সে যে এতখানি টানটানিবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য ঘটনা!

হাজারি বলিল—কিন্তু তুমি একথা শুনলে কোথায় বলতে হবে মা।

অতসী হাসিয়া বলিল—সে কথা বলবো না বলেছি তো।

—তা হলে টাকাও নেবো না। আগে বলো কে বলেছে? —আচ্ছা, নাম করলে তাকে কিছু বলবেন না বলুন—

—কাকে কি বলবো বুঝতে পারছি নে তো? বলাবলির কথা কি আছে এর মধ্যে? আচ্ছা, বলবো না। বলো তুমি।

—টেঁপি বলেছিল, বাবার ইচ্ছে একটা হোটেল খোলেন, আমার বাবার কাছে নাকি টাকা চেয়েছিলেন ধার—তা বাবা দিতে পারেননি। দেখুন কাকাবাবু, দাদা মারা যাওয়ারপরে বাবার মন খুব খারাপ। ওঁকে বলা না বলা দুই সমান। আমি ভাবলাম আমার হাতে তো টাকা আছে—কাকাবাবুকে দিই গে—ওঁদের উপকার হবে। আমার কাছে তো এমনি পড়েই আছে। আপনার হোটেল নিশ্চয়ই খুব ভাল চলবে, আপনারা বড়লোক হয়ে যাবেন। টেঁপিকে আমি বড় ভালবাসি, ওর মনে যদি আহ্লাদ হয় আমারতাতে তৃপ্তি। টাকা বাক্সে তুলে রেখে কি হবে?

—মা, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারিনে।

অতসী যেন বড় দমিয়া গেল। হাজারির সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ছেলেমানুষী তর্ককরিল, বাবাকে না জানাইয়া টাকা লইলে দোষ কি!

শেষে বলিল—আমি টেঁপিকে এ টাকা দিচ্ছি।

—তা তুমি দিতে পারো না। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই মা। তুমি তো লেখাপড়া জানো, ভেবে দেখ।

—আচ্ছা, আমায় লাভের অংশ দেবেন তা হোলে?

হাজারির হাসি পাইল। কুসুম, গোয়ালা-বাড়ীর সেই বউটি, অতসী—সবাই এককথা বলে। ইহারা সকলেই মহাজন হইয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। মজারব্যাপার বটে!

—না মা, সে হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্বাদ করি রাজরাণী হও, তখন তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুকে যা খুশি দিও, এখন না।

অতসী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

হাজারির ইচ্ছা হইল টেঁপিকে ডাকিয়া বকিয়া দেয়। এসব কথা অতসীর কাছে বলিবারতাহার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু অতসীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে, টেঁপিকে ইহালইয়া কিছু বলিলেই অতসীর কানে গিয়ে পৌঁছাইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

সেদিন বিকালে গোয়ালাপাড়ায় বেড়াইতে গিয়া কুসুমের বাপের বাড়ীতে শুনিলরাণাঘাটে কুসুমের অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল, কোনোরূপে এযাত্রা সামলাইয়া গিয়াছে।সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই, কথায় কথায় কুসুমের কাকা ঘনশ্যাম ঘোষ বলিল—মধ্যে রাণাঘাটে পনেরো দিন ছেলাম দাদাঠাকুর, ছানার কাজ এ মাসটা বড় মন্দা।

হাজারি বলিল—পনেরো দিন ছিলে? কেন হঠাৎ এ সময়—

তারপরেই ঘনশ্যাম কুসুমের কথাটা বলিল।

হাজারির কেবল মনে হইতে লাগিল কুসুমের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নাই—একবার তাহার সহিত দেখা করিতে গেলে কেমন হয়?মনটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেতাহার অসুখের খবর শুনিয়া। জীবনে ওই একটি মেয়ের উপর তাহার অসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

ইচ্ছা হইল কুসুমের সম্বন্ধে ঘনশ্যামকে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহাকরা চলিবে না। সে মনের আকুল আগ্রহ মনেই চাপিয়া শুধু কেবল উদাসীন ভাবেজিজ্ঞাসা করিল—এখন সে আছে কেমন?

—তা এখন আপনার বাপমায়ের আশীর্বাদে সেরে উঠেছে—তবে বড় কষ্ট যাচ্ছে সংসারের, দুধ-দই বেচে তো চালাতো, আজ মাসখানেকের ওপর শয্যাগত অবস্থা। ইদিকি আমার সংসারের কাণ্ড তো দেখতেই পাচ্ছেন—কোত্থেকে কি করি দাদাঠাকুর—

হাজারি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। যেন কুসুমের সম্বন্ধে তাহার সকল আগ্রহফুরাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে হাজারি ভাবিল রাণাঘাটে তাহাকে যাইতেই হইবে। কুসুমেরঅসুখ শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কালই একবার সে রাণাঘাট যাইবে।

পথে অতসীর পিতা হরিবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হাজারিকে দেখিয়াবলিলেন—এই যে হাজারি, কোথা থেকে ফিরচো? তা এসো আমার ওখানে, চলো চাখাবে।

বৈঠকখানায় হাজারিকে বসাইয়া হরিবাবু বলিলেন—বসো, আমি বাড়ীর ভেতরথেকে আসছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। যতদিন বাড়ী আছ, আসা-যাওয়াএকটু করো হে, কেউ আসে না, একলাটি সারাদিন বসে বসে আর সময় কাটে না।দাঁড়াও আসছি—

হরিবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতসী একখানা রেকাবিতেখানকতক লুচি, বেগুনভাজা এবং একটু আখের গুড় লইয়া আসিল। হাজারির সামনেরটেবিলে রেকাবি রাখিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ খান কাকাবাবু, চা দিয়ে যাচ্ছি—

হাজারি বলিল—বাবু আসুন আগে—

—বাবা তো খাবার খাবেন না, তিনি খাবেন শুধু চা। আপনি খাবারটা ততক্ষণখেয়ে নিন। চা একসঙ্গে দেবো—

অতসী চলিয়া গেল না, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। হাজারি একটু অস্বস্তি বোধ করিতেলাগিল, বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—টেঁপি আজ আসেনি মা?

—না, এ বেলা তো আসেনি।

হাজারি আর কিছু কথা না পাইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে একবারচোখ তুলিয়া দেখিল অতসী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অতসী সুন্দরী মেয়ে, টেঁপির বন্ধু হইলেও বয়সে টেঁপির অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের বড়—এ বয়সে সুন্দরী মেয়ের সহিত নির্জন ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইবার অভিজ্ঞতাও হাজারির নাই—সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অতসী হঠাৎ বলিল—কাকাবাবু, আপনি আমার ওপর রাগ করেননি তো?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল—রাগ? রাগ কিসের মা—

—ও-বেলার ব্যাপার নিয়ে?

—না, না, এতে আমার রাগ হবার কিছু নেই, বরং তোমারই—

—না শুনুন কাকাবাবু, আমি তারপর ভেবে দেখলাম আপনি আমার টাকা নিলে খুব ভাল করতেন। জানেন, আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমি কেবলই ভাবি দাদা বেঁচে থাকলে বাবার বিষয় আমি পেতাম না, এখন কিন্তু আমি পাবো। কিন্তু ভগবান জানেন কাকাবাবু, আমি এক পয়সা চাইনে বিষয়ের। দাদা বিষয় ভোগ করতো তো করতে—নয় তো বাবা বিষয় যা খুশি করে যান, উড়িয়ে যান, পুড়িয়ে যান, দান করুন—আমার যেন এ না মনে হয় আজ দাদা থাকলে এ বিষয় আমি পেতাম না দাদাইপেতো। বিষয়ের জন্যে যেন দাদার ওপর কোনোদিন— আমার নিজের হাতে যা আছেতাও উড়িয়ে দেবো।

অতসীর চোখ জলে টলটল করিয়া আসিল, সে চুপ করিল।

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল—না মা, ও সব কথা কিছু ভেবো না। তোমার বাবা মাকে তুমিই বুঝিয়ে রাখবে, তুমিই ওঁদের একমাত্র বাঁধন—তুমি ওরকম হলে কিচলে? ছি মা—

হাজারি সত্যই অবাক হইয়া গেল, ভাবিল—এইটুকু মেয়ে, কি উঁচু মন দ্যাখোএকবার। বড় বংশ নইলে আর বলেছে কাকে? এ কি আর বেচুবাবুর হোটেলের পদ্মঝি?

হাজারি বলিল—আচ্ছা মা, আমাকে টাকা দেবার তোমার ঝোঁক কেন হল বলতো? তোমরা মেয়েরা যদি ভাল হও তো খুবই ভাল, আর মন্দ হও তো খুবই মন্দ। —আমায় তুমি বিশ্বাস কর মা?

—আপনি বুঝে দেখুন। না হলে আপনাকে টাকা দিতে চাইব কেন?

—তোমার বাবাকে না জানিয়ে দেবে?

—বাবাকে জানালে দিতে দেবেন না। অথচ আমার টাকা পড়ে রয়েচে, আপনার উপকার হবে, আমি জানি আপনাদের সংসারের কষ্ট। টেঁপির বিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাবেন টাকা, কোথায় পাবেন কি। আপনার রান্নার যেমন সুখ্যাতি, আপনার হোটেল খুব ভাল চলবে। ছ-বছরের মধ্যে আমার টাকা আপনি আমায় ফেরত দিয়ে দেবেন।

হাজারি মুগ্ধ হইয়া গেল অতসীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া। বলিল—আচ্ছা তুমিদিও টাকা, আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলবো—তোমার মুখ দিয়েভগবান এ কথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবানকথা কন।

অতসী হাসিয়া বলিল—তা হলে নেবেন ঠিক?

—ঠিক বলছি। এবার ঘুরে জায়গা দেখে আসি। রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকালেই, হয় সেখানে, নয় তো গোয়াড়ির বাজারে জায়গা দেখবো। খবর পাবে তুমি, আবার ঘুরে আসচি তিন-চার দিনের মধ্যেই।

অতসী বলিল—বাবার আহ্নিক করা হয়ে গিয়েচে, বাবা আসবেন, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি। শুনুন কাকাবাবু, আপনি যেদিন বাবার কাছে হোটেলের জন্যে টাকা চান, আমি সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলাম। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি আমার যা টাকা জমানো আছে আপনাকে তা দেবো।

—আচ্ছা বল তো মা একটা সত্যি কথা—আমার ওপর তোমার এত দয়া হোলকেন?

—বলবো কাকাবাবু? আপনার দিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হত আপনি খুব সরল লোক আর ভালো লোক। আমার মনে বড় কষ্ট হয় আপনাকে দেখলে সত্যি বলচি—তবে দয়া বলছেন কেন? আমি আপনার মেয়ের মত না?

বলিয়াই অতসী এক প্রকার কুণ্ঠা ও লজ্জা মিশ্রিত হাসি হাসিল।

হাজারি বলিল—তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে তাই দয়ার কথা বলচি।নইলেকি সন্তানের ওপর এত মমতা হয়? তুমি সুখে থাকো, রাজরাণী হও—এই আশীর্বাদ করচি। আমি তোমার গরীব কাকা, এর বেশী আর কি করতে পারি।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল এবং আর একটুও না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রে সারারাত্রি হাজারি ঘুমাইতে পারিল না। অতসীর মত বড়ঘরের সুন্দরী মেয়েরস্নেহ আদায় করার মধ্যে একটা নেশা আছে, হাজারিকে সে নেশায় পাইয়া বসিল। তাহার জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা।

সকালে উঠিয়া সে রাণাঘাটে রওনা হইল। বেশী নয় পাঁচ ছ'মাইল রাস্তা, হাঁটিয়া বেলা সাড়ে আটটার সময় স্টেশনের নিকটে সেগুন-বনে গিয়া পৌঁছিল।

রেল-বাজারের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার ইচ্ছা হইল একবার তাহার পুরাতন কর্মস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়। আজ প্রায় পাঁচ মাস সে রাণাঘাট ছাড়া। দূর হইতে বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহার মন উত্তেজনায় ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াউঠিল। গত ছয় বৎসরের কত স্মৃতি জড়ানো আছে ওই টিনের চালওয়ালা ঘরখানার সঙ্গে।

হোটেলের গদিঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে বেচু চক্কত্তির সম্মুখে পড়িয়া গেল। বেলাপ্রায় সাড়ে দশটা, খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেচু চক্কত্তি পুরোনো দিনের মত গদিঘরে তক্তপোষের উপর হাতবাক্সের সামনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হাজারি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—আরে এই যে হাজারি ঠাকুর।কি মনে করে? কোথায় আছ আজকাল? ভাল আছ বেশ?

হাজারি এক মুহূর্তে আবার যেন বেচু চক্রবর্তীর বেতনভুক রাঁধুনী বামুনে পরিণতহইল, তেমনি ভয়, সঙ্কোচ ও মনিবের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব তার সারা দেহমনে হঠাৎ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া ভর করিল।

সে পুরোনো দিনের মত কাঁচুমাচু ভাবে বলিল—আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় এক রকম—আজ্ঞে, তা বাবু বেশ ভাল আছেন?

—আজকাল আছ কোথায়?

—আজ্ঞে গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ীতে আছি।

বাড়ীর কাজ? কদ্দিন আছ?

—এই চার মাস আছি বাবু।

—তা বেশ, তবে সেখানে মাইনে আর কত পাও? হোটেলের মত মাইনে কি করেদেবে গেরস্ত ঘরে?

বেচু চক্কত্তির এই কথার মধ্যে হাজারি এক ধরনের সুরের আঁচ পাইল। ব্যাপারকি? বেচু চক্কত্তি কি আবার তাহাকে হোটেলে রাখিতে চান? তাহার কৌতূহল হইল, শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি দাঁড়ায়।

সে বিনীত ভাবে বলিল—ঠিক বলেছেন বাবু, তা তো বেশী নয়। গেরস্তবাড়ী কোথাথেকে বেশী মাইনে দেবে?

—তারপর কি এখন আমাদের এখানে এসেছ ঠাকুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

—কি মনে করে বললো তো? থাকবে এখানে?

হাজারি কিছুমাত্র না ভাবিয়াই বলিল—সে বাবুর দয়া।

—তা বেশ বেশ, থাকো না কেন, পুরোনো লোক, বেশ তো। যাও কাজে লেগে যাও। তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ? কই?

—না বাবু, আগে থেকে কি করে আনি। সে সব গোপালনগরে রয়েছে। চাকুরিতেদয়া করে রাখবেন কি না রাখবেন না জেনে কি করে সে-সব—

—আচ্ছা আচ্ছা, যাও ভেতরে যাও। রতন ঠাকুরের অসুখ করেছে, বংশী একাআছে, তুমি কাজে লাগো এবেলা থেকে। ভাঙা ভাংটো এ মাসের ক'টা দিনের মাইনেতুমি আগাম নিও।

হাজারি কৃতজ্ঞতার সহিত বেচু চক্কত্তিকে আর একবার ঘাড় খুব নীচু করিয়া হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কলেরপুতুলের মত রান্নাঘরের দিকে চলিল।

সামনেই বংশীঠাকুর।

তাহাকে দেখিয়া বংশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—বাবু ডেকে বহাল করলেন যে ফের। ভাল আছ—বংশী? তোমারসেই ভাগ্নেটি ভাল আছে?

বংশী বলিল—আরে এস এস হাজারিদা! তোমার কথা প্রায়ই হয়। তুমি বেশভাল আছ? এতদিন ছিলে কোথায়?

—ডেকে কি চাপিয়েছ? সরো, হাতাটা দাও। এখনও মাছ হয়নি বুঝি? যাও, তুমি গিয়ে মাছটা চড়িয়ে দাও। তেলের বরাদ্দ সেই রকমই আছে না বেড়েচে?

বংশী বলিল—একবার টেনে নিও একটু। অনেক দিন পরে যখন এলে। দাঁড়াওডালটায় নুন দেওয়া হয়নি এখনও—দিয়ে দাও।

বলিয়া সে দরমার আড়ালে গাঁজা সাজিতে গেল।

চুপি চুপি বলিল—তোমায় বহাল করেছে কি আর সাধে? এদিকে তুমি চলেযাওয়াতে হোটেলের ভয়ানক দুর্নাম। সেই কলকাতার বাবুরা দু'তিন দল এসেছিল, যেই শুনলে তুমি এখানে নেই তারা বল্লে সেই ঠাকুরের রান্না খেতেই এখানে আসা। সে যখন নেই, আমরা রেলের হোটেলে খাবো। হাটুরে খদ্দেরও অনেক ভেঙে গিয়েছে—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। তোমায় বাবু বহাল করলেন কেন জান? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেতোমাকে পেলে লুফে নেয় এক্ষুনি। তোমার অনেক খোঁজ করেছে ওরা।

বংশীর হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া দম মারিয়া হাজারি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়াচুপ করিয়া রহিল। কি হইতে কি হইয়া গেল! চাকুরি লইতে সে তো রাণাঘাট আসে নাই। কিন্তু পুরাতন জায়গায় পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সে বুঝিয়াছে এতদিনতাহার মনে সুখ ছিল না। এই বেচু চক্কত্তির হোটেল, এই দরমার বেড়া দেওয়া রান্নাঘর, এই পাথুরে কয়লার স্তূপ, এই হাতাবেড়ি এই তার অতি পরিচিত স্বর্গ। ইহাদের ছাড়িয়াকোথায় সে যাইবে? ভগবান এমন সুখের দিনও মানুষের জীবনে আনিয়া দেন?

বংশীর হাতে কলিকা ফিরাইয়া দিয়া সে খুশির সহিত বলিল—নাও, আর একবার টান দিয়ে নাও। ডালে সম্বরা দিই গে—এবেলা এখনও বাজার আসেনি নাকি?

বংশী বলিল—মাছটা কেবল এসেছে। তরকারীপাতি এল বলে, গোবরা গিয়েছে।গোবরা নতুন চাকর—বেশ লোক, আমার ওপর ভারি ভক্তি। এলে দেখো এখন।

এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া জন দুই খরিদ্দার খাইবার ঘরে ঢুকিতেই হাজারি অভ্যাসমত পুরাতন দিনের ন্যায় হাঁকিয়া বলিল—বসুন বাবু, জায়গা করাইআছে— নিয়ে যাচ্ছি। বসে পড়ুন। মাছ এখনও হয়নি এত সকালে কিন্তুশুধুডাল আর ভাজা—বংশী ভাত নিয়ে এস হে—ডালটায় সম্বরা দিয়ে নিই—বেলাও এদিকেপ্রায় দশটা বাজে। কেষ্টনগরের গাড়ী আসবার সময় হল। আজকাল ইস্টিশনের খদ্দেরআনে কে?

হাজারি যেন দেহে-মনে নতুন বল ও উৎসাহ পাইয়াছে। হাজার হোক্, শহর বাজার জায়গা রাণাঘাট, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া—এখানে একবার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে? একটা জায়গার মত জায়গা।

এমন সময় একজন কালোমত ছোকরা চাকর তরকারি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় রান্নাঘরেনীচু হইয়া ঢুকিল—পিছনে পিছনে পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিতে বলিতে আসিতেছিল—বাবাঃ, বেগুন আর কেনবার জো নেই রাণাঘাটের বাজারে। আট পয়সা করে বেগুনের সের ভূভারতে কে শুনেছে কবে—যত ব্যাটা ফড়ে জুটে বাজার একেবারে আগুন করে রেখেচে—সব চল্লো কলকেতা, সবচল্লো কলকেতা—তা গরীব-গুরবো লোক কেনেই বা কি আর খায়ই বা কি—ও বংশী, ঝুড়িটা ধরে নামাও ওর মাথা থেকে— দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে সম্মুখে থালায় অন্ন-পরিবেশনরত হাজারিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে যেন কাঠ হইয়াগেল।

হাজারি পদ্মঝিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া গেল। তাহার পুরাতন ভয় কোথা হইতে সেই মুহূর্তেই আসিয়া জুটিল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আম্‌তা আম্‌তা সুরে বলিল—এই যে পদ্মদিদি, ভাল আছ বেশ? হেঁ-হেঁ—আমি—

পদ্মঝি বিস্ময়ের ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বংশী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল— ঝুড়িটা নামিয়ে নেও না ঠাকুর? ও সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল ঝুড়ি মাথায়—মাছ হল? তারপর হাজারির দিকে তাচ্ছিল্যের ভাবে চাহিয়া বলিল—কখন এলে?

—আজই এলাম পদ্মদিদি।

—আজ এবেলা এখানে থাকবে?

বংশী ঠাকুর বলিল—হাজারিকে যে বাবু বহাল করেছেন আবার। ও এখানে কাজ করবে।

পদ্মঝি কঠিন মুখে বলিল—তা বেশ। রান্নাঘরে আর না দাঁড়াইয়া সে বাহিরেচলিয়া গেল।

বংশী ঠাকুর অনুচ্চস্বরে বলিল—পদ্মদিদি চটেছে—বাবুর সঙ্গে এইবার একচোটবাধবে—

পদ্মকে সারাদুপুর আর রান্নাঘরের দিকে দেখা গেল না। হাজারির মন ছটফটকরিতেছিল, কতক্ষণে কাজ সারিয়া কুসুমের সঙ্গে গিয়া দেখা করিবে। সে দেখিল সত্যই হোটেলের খরিদ্দার কমিয়া গিয়েছে—পূর্বে যেখানে বেলা আড়াইটার কমে কাজ মিটিত না, আজ সেখানে বেলা একটার পরে বাহিরের খরিদ্দার আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হাজারি বলিল—হ্যাঁ বংশী, থার্ড ক্লাসের টিকিট মোট ত্রিশখানা। আগে যে সত্তর-পঁচাত্তর খানা একবেলাতেই হোত? এত খদ্দের গেল কোথায়?

বংশী বলিল—তবুও তো আজকাল একটু বেড়েচে। মধ্যে আরও পড়ে গিয়েছিল, কুড়িখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট হয়েচে এমন দিনও গিয়েচে। লোক সব যায় যদু বাঁড়ুয্যেরহোটেলে। ওদের এবেলা একশো ওবেলা ষাট-সত্তর খদ্দের। হাটের দিন আরও বেশী।আর খদ্দের থাকে কোথা থেকে বলো।মাছের মুড়ো কোনোদিন খদ্দেররা চেয়েও পাবেনা। বড় মাছ কাটা হলেই মুড়ো নিয়ে যাবেন পদ্মদিদি। আমাদের কিছু বলবার জোনেই। তার ওপর আজকাল যা চুরি শুরু করেছে পদ্মদিদি— সে সব কথা এরপর বলবোএখন। খেয়ে নাও আগে।

হোটেল হইতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হাজারি বাহির হইয়া মোড়ের দোকানে একপয়সার বিড়ি কিনিয়া ধরাইল। চূর্ণীর ধারে তাহার সেই পরিচিত গাছতলাটায় কতদিনবসা হয় নাই—সেখানে গিয়া আজ বসিতে হইবে। পথে রাধাবল্লভতলায় সে ভক্তিভরেপ্রণাম করিল। আজ তাহার মনে যথেষ্ট আনন্দ, রাধাবল্লভ ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এমনদিনও তাহাকে জুটাইয়া দিয়াছেন। আজ ভোরে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সেকি ইহা ভাবিয়াছিল? অস্বপনের স্বপন। চোর বলিয়া বদনাম রটাইয়া যাহারা তাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই কিনা যাচিয়া তাহাকে চাকুরিতে বহাল করিল।

চূর্ণী নদীর ধারে পরিচিত গাছতলাটায় বসিয়া সে বিড়ি টানিতে টানিতে এক পয়সার বিড়ি শেষ করিয়া ফেলিল মনের আনন্দে। কুসুমের বাড়ী এখন সব ঘুমাইতেছে, গৃহস্থবাড়ীতে দেখাশুনা করিবার এ সময় নয়—বেলা কখন পড়িবে? অন্তত চারিটা না বাজিলে কুসুমের ওখানে যাওয়া চলে না। এখনও দেড় ঘণ্টা দেরি।

গোপালনগরে কুণ্ডুবাড়ী হইতে তাহার কাপড়ের পুঁটুলিটা একদিন গিয়া আনিতে হইবে। গত মাসের মাহিনা বাকি আছে, দেয় ভালো, না দিলে আর কি করা যাইবে?

আজ একটু রাত থাকিতে উঠিবার দরুন ভাল ঘুম হয় নাই—তাহার উপরে অনেকদিন পরে হোটেলের খাটুনি, পাঁচক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া স্বগ্রাম হইতে রাণাঘাট আসাপ্রভৃতির দরুন হাজারির শরীর ক্লান্ত ছিল—গাছতলার ছায়ায় কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কুসুমের বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িল।

কুসুম নিজে আসিয়াই খিল খুলিল এবং হাজারিকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল— জ্যাঠামশায়। কোথা থেকে? আসুন—আসুন—

তার পরেই সে নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—এসো এসো মা, কল্যাণ হোক। ছেলেপিলে সব ভালতো? এত রোগা হয়ে গিয়েছ, ইস্। তোমার কাকার মুখে তোমার বড় অসুখের কথাশুনলাম।

কুসুম বাড়ীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া বসাইল।বলিল—ভয় নাই জ্যাঠামশায়, মরচি নে অত শীগ্‌গির। আপনি সেই যে গেলেন, আরকোনো খবর নেই। অসুখের সময় আপনার কথা কত ভেবেছি জানেন জ্যাঠামশায়?মরেই যদি যেতাম, দেখা হত আর? অখদ্দে আপদ না হলে মরেই তো—

—ছি ছি, মা, ও রকম কথা বলতে আছে?

—কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি? আজ কোথা থেকে এলেন?

—এঁড়োশোলা থেকে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল—হেঁটে এসেছেন বুঝি?খাওয়া হয়নি?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ব্যস্ত হয়ো না মা। বলছি সব। সকালে বেরিয়েছিলামএঁড়োশোলা থেকে, বলি যাই একবার রাণাঘাট, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব হল। রেলবাজারে যেমন বাবুর হোটেলে দেখা করতে যাওয়া, অমনি বাবু বহালকরলেন কাজে। সেখানে কাজ সাঙ্গ করে চূর্ণীর ধারে বেড়িয়ে এই আসছি।

—ওমা আমার কি হবে? ওরা আবার আপনাকে ডেকে বহাল করেছে। তবেমিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়েছিল কেন? পদ্ম আছে তো?

—পদ্ম নেই তো যাবে কোথায়? আছে বলে আছে! খুব আছে।

পরে গর্বের সুরে বলিল—আমায় না নিলে হোটেল যে ইদিকে চলে না। খদ্দেরপত্তরতো অদ্ধেক ফর্সা। সব উঠেছে গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের হোটেলে।

হাজার হোক, হোটেলের মালিক, সুতরাং তাহার মনিবের সমশ্রেণীর লোক। হাজারিযদু বাঁড়ুয্যের নামটা সমীহ করিয়াই উচ্চারণ করিল।

কুসুম যেন অবাক হইয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াবলিল—বসুন জ্যাঠামশায়, আসছি আমি—

—না, না, শোনো। এখন খাওয়া-দাওয়ার জন্য যেন কিছু কোরো না—

—আপনি বসুন তো। আসছি আমি—

কোনো কথাই খাটিল না। কুসুম কিছুক্ষণ পরে এক বাটি গরম সরদুধ ও দুখানিবরফি সন্দেশ রেকাবিতে করিয়া আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—একটু জল সেবা করুন।

—ওই তোমার দোষ, বারণ করে দিলেও শোনোনা—

কুসুম হাসিমুখে বলিল—কথা শুনবো এখন পরে—দুধটা সেবা করুন সবটা— ভালো দুধ—বাড়ীর গরুর। ঘন করে জ্বাল দিয়েছি, দুপুর থেকে আকার ওপর বসানোছিল।

—তুমি বড় মুশকিলে ফেললে দেখচি মা! ...নাঃ—

হাজারিকে পান সাজিয়া দিয়া কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, হোটেল ভাল লাগছে?

—তা মন্দ লাগছে না। আজ বেশ ভালই লাগলো। তবে ভাবছি কি জানো মা, এই রেলবাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

—শুধু বেশ চলে না জ্যাঠামশায়, খুব ভাল চলে। আপনার নিজের নামে হোটেলদিলে সব হোটেল কানা পড়ে যাবে।

—তোমার তাই মনে হয় মা?

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। খুলুন আপনি হোটেল।

—আর একজনও একথা বলেছে কালই। তোমার মত সেও আর এক মেয়ে আমার। আমাদের গাঁয়েরই—

—কে জ্যাঠামশায়?

—হরিবাবুর মেয়ে, অতসী ওর নাম, টেঁপির বন্ধু। খুব ভাব দুজনে। সে আমায়কাল বলছিল—

—আমাদের বাবুর মেয়ে? আমি দেখিনি কখনো। বয়েস কত?

—ওরা নতুন এসেছে গাঁয়ে, কোথা থেকে দেখবে। বয়েস ষোল-সতেরো হবে। বড়ভাল মেয়েটি।

—সবাই যখন বলছে, তাই করুন আপনি। টাকা আমি দেবো—

—অতসীও দেবে বলেছে। দু-জনের কাছে টাকা নিলে জাঁকিয়ে হোটেল দেবো। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আধুলি নিয়ে শেষে যদি লোকসান যায়, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। বরং অতসী বড় মানুষের মেয়ে তার দুশো টাকা গেলে কিছু তারআসে যাবে না—

না, আমার টাকাও খাটিয়ে দিতে হবে। সে শুনছি নে।

—আমি দুজনের টাকাই নেবো। কাল থেকে জায়গা দেখছি রও। তবে টাকা গেলে আমায় দোষ দিও না।

—জ্যাঠামশায়, আপনি হোটেল খুললে টাকা ডুববে না— আমি বলছি। এরপরেও যদি ডোবে, তবে আর কি হবে। আপনার দোষ দেবো না।

উঠিবার সময় কুসুম বলিল, জ্যাঠামশায়, পরশু সংক্রান্তির দিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণেরসিন্নি দেবো ভাবছি, আপনি এখানে রাত্রে সেবা করবেন।

—তা কি করে হবে মা? আমি রাতে বারোটার কম ছুটি পাবো না।

—তবে তার পর দিন দুপুরে? বেলা একটার সময় আসবেন। আমি লুচি ভেজেরাখবো, আপনি এসে তরকারি করে নেবেন। কথা রইলো, আসতেই হবে কিন্তুজ্যাঠামশায়।

হোটেলে ফিরিয়া সে বড় ডেকে রান্না চাপাইয়া দিল। বংশী ঠাকুর এবেলা এখনোআসে নাই, হাজারি অত্যন্ত খুশির সহিত চারদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—সেইঅত্যন্ত পরিচিত পুরাতন রান্নাঘর, এমন কি একখানা পুরানো লোহার খুন্তি পাঁচ মাস আগে টিনের চালের বাতার গায়ে সেই গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখনও সেখানা সেই স্থানেই মরিচা-পড়া অবস্থায় গোঁজাই রহিয়াচে। সেই বংশী, সেই রতন, সেই পদ্মদিদি।

বংশী আসিয়া ঢুকিল। হাজারি বলিল—আজ পেঁপে কুটিয়ে দাও তো বংশী, একবারপেঁপের তরকারি মন দিয়া রাঁধি অনেক দিন পরে। একদিনে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের হোটেলকানা করে দেবো।

গদির ঘরে পদ্মঝিয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া বংশী বলিল—ও পদ্মদিদি, শোনোইদিকে— ও পদ্মদিদি—

পদ্মঝি থার্ডক্লাসের খাওয়ার ঘর পার হইয়া রান্নাঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে?

বংশী বলিল—কি কি রান্না হবে এবেলা? হাজারি বলেছে পেঁপের তরকারি রাঁধবেভাল করে। দু-একটা ভালমন্দ আমাদের দেখাতে হবে আজ থেকে। পেঁপে তো রয়েছে— কি বল?

পদ্মঝি বলিল,না—পেঁপে কাল হবে। আজ এবেলা বিলিতি কুমড়ো হোক। আরকুচো মাছের ঝাল করো। সাত আনা সের চিংড়ি ওবেলা গিয়েছে—এবেলা দেখি কি মাছ পাওয়া যায়।

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, আজ একটু মাংস হোক না?

পদ্মঝি এতক্ষণ পর্যন্ত হাজারির সঙ্গে সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করে নাই। সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মাংস বুধবার হয়ে গিয়েছে। আজ আরহবে না—বরং শনিবার দিনে হবে।

হাজারি অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল পদ্ম তাহার সহিত কথা বলাতে এবংপুলকের প্রথম মুহূর্ত কাটিতে না কাটিতে তাহাকে একেবারে বিস্মিত ও চকিত করিয়াদিয়া পদ্মঝি জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি সাগ্রহে বলিল—আমার কথা বলছ পদ্মদিদি?

—হ্যাঁ।

—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম—তারপররাণাঘাটে আজ এসেছিলাম বেড়াতে। তা বাবু বল্লেন—

—হুঁ, বেশ থাকো না। তবে বাইরে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি।ওসব একদম বন্ধ করে দিয়েছেন বাবু। যা পারো এখানে খেও—বুঝলে?

—না বাইরে নিয়ে যাবো কেন পদ্মদিদি? তা নিয়ে যাবো না।

—তোমার সেই কুসুম কেমন আছে? দেখা করতে যাওনি? পদ্মঝিয়ের কণ্ঠস্বরেবিদ্রূপ ও শ্লেষের আভাস।

হাজারি লজ্জিত ও অপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—কুসুম? হ্যাঁ তা কুসুম—ভালই—

পদ্মঝি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় যেন হাসিল। অন্তত হাজারির তাহাই মনেহইল। পদ্মঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বংশী বলিল—যাক্ চাকরি তোমারপাকা হয়ে গেল হাজারিদা—দুপুরের পর আমরা চলে গেলে বোধ হয় কর্তা-গিন্নীতেপরামর্শ হয়েছে—চলো এক ছিলিম সাজা যাক্।

হাজারি হাসিল। সব দিকেই ভালো, কিন্তু পদ্মদিদি কুসুমের কথাটা তুলিল কেনআবার ইহার মধ্যে? ভারি ছোট মন—ছিঃ।

বংশী বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিল—ও হাজারিদা, এসো টেনে নাওএকটান—

গাঁজায় কষিয়া দম মারিয়া হাজারি আসিয়া আবার রান্নাঘরে বসিতেই হঠাৎ অতসীরমুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে অতসী। কিমনটি চমৎকার। তাহার কাকাবাবু গাঁজা খায়, অতসী যদি দেখিত! ওই জন্যেই তো গ্রামে সে কখনো গাঁজা খায় না। ছেলেপিলের সামনে বড় লজ্জার কথা।

অতসী টাকা দিতে চাহিয়াছে, হোটেল তাহাকে খুলিতে হইবেই। কথাটা একবারবংশীকে বলিবে? বংশী ও রতন ভাল লোক দু-জনেই, তাহাদের বিশ্বাস করা যায়। দুজনেই তাহাকে ভালবাসে।

বংশীকে বলিল—আজকাল রাত্তিরে টক্ হয়?

—সব দিন হয় না। এখন নেবু সস্তা, নেবু দেওয়া হয়। পয়সায় ছ'সাতটা পাতিনেবু।

—একটা কিছু করে দেখাতে হবে তো? বড়ির টক্ করবো ভেবেছিলাম—

—তুমি ভাবলে কি হবে? পদ্মদিদি পাস করলে তবে তো হাঁড়িতে উঠবে। ভুলেগেলে নাকি আইনকানুন, হাজারিদা?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বংশী, একটু চা করে খেয়ে নিলেহত না? আছে তোড়জোড়?

বংশী বলিল—খাবে? আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। ডাল চড়িয়ে গরম জল এইঘটিতে কেটে রেখো হাতা দিয়ে। চিনি আছে, চা আনিয়ে নিচ্ছি—মনে আছে আর বছর আমাদের চা খাওয়া? আদার রস করেও দেবো এখন—

আধঘণ্টার মধ্যে হাজারি ও বংশী মনের আনন্দে কলাইকরা বাটি করিয়া চা খাইতে ছিল। ভূতগত খাটুনির মধ্যেও ইহাতেই আনন্দ কি কম? হাজারি একদৃষ্টে আগুনেরদিকে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল—যেখানেই যার মন টেকে, বুঝলে বংশী! গোপালনগরে সন্দেবেলা রোজ ওদের মন্দিরে ঠাকুরের শেতল হয়—তার সন্দেশ, ফল কাটা, মুগের ডাল ভিজে খেতে দিত আমাকে। চা আমি করে নিতাম উনুনে। কিন্তু তাতে কি এমনমজা ছিল? একা একা বসে রান্নাঘরে চা আর খাবার খেতাম, মন
হু হু করতো। খেয়েসুখ ছিল না—আজ শুধু চা খাচ্ছি, তাই যেন কত মিষ্টি!

রাত হইয়াছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া হাজারিবলিল—ও বংশী, কেষ্টনগর এলো যে! ডালে কাঁটা দিয়ে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে গোবরা চাকর খাবার ঘর হইতে হাঁকিল—থাড় কেলাস দু-থালা—উত্তেজনায় হাজারির সারাদেহ কেমন করিয়া উঠিল। কি কাজের ভিড়, কি লোকজনের হৈ চৈ, কি ব্যস্ততা—ইহার মধ্যেই তো মজা। তা নয়, গোপালনগরের মত পাড়াগাঁজায়গায় কুণ্ডুদের বৃহৎ নিস্তব্ধ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধ রান্নাঘরের কোণে বসিয়া কড়িকাঠ গুনিতে গুনিতে আর বাড়ীর পিছনের বাগানের তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলাডালপালার দিকে চাহিয়া রান্না করা—সে কি তাহার পোষায়! সে হইল শহরের মানুষ।

সংক্রান্তির পরের দিন কুসুমের বাড়ী বেলা প্রায় বারোটার সময় সে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। বংশী ঠাকুরকে বলিয়া একটু সকাল সকাল হোটেল হইতে বাহির হইল।

কুসুম গোয়ালঘরের নতুন উনুনে আলাদা করিয়া কপির ডালনা রাঁধিতেছে—একখানা কলার পাতায় খানকতক বেগুন ভাজা ও একটা পাথরের খোরায় ছোলার ডাল। শুদ্ধাচারে সব করিতে হইতেছে বলিয়াই পাথরের খোরা ও কলাপাতা ইত্যাদিরব্যবস্থা—হাজারি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—কুসুমের কাণ্ড দ্যাখো। থাকিহোটেলে—কত ছোঁয়ালেপা হয়ে যায় তার নেই ঠিক—ও আবার নেয়ে ধুয়ে ধোয়াকাপড় পরে গুরুঠাকুরের মত যত্ন করে রাঁধতে বসেচে।

কুসুম সলজ্জ হাসিয়া বলিল—জ্যাঠামশায়, এখনও হয়নি। একটু দেরি আছে—আমি কিন্তু তরকারি সব রেঁধেছি—আপনিশুধুবসে যাবেন—

হাজারি বলিল—তুমি তরকারি রাঁধলে যে বড়। সে কথা তো ছিল না। আমিতোমার তরকারি খাবো কেন?

—ঠকাতে পারবেন না জ্যাঠামশাই! কোনো তরকারিতে নুন দিইনি। নুন না দিলেখেতে আপনার আপত্তি কি? ভাবলাম আপনি অত বেলায় এসে তরকারি রাঁধবেন সেবড় কষ্ট হবে—লুচি ভাজার আর কি হাঙ্গামা, দেরিই তো হবে তরকারি রাঁধতে! তাইনিয়ে এসে—

—নুন দাওনি! না মা, তুমি হাসালে দেখ্‌চি। আলুনি তরকারি খাওয়াবে তোমারবাড়ী?

—আর গোয়ালার মেয়ে হয়ে আমি নিজের হাতের রান্না তরকারি খাইয়ে আপনারজাত মেরে দেবো—নরকে পচ্‌তে হবে না আমাকে তার জন্যে?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, দাও ময়দাটা। মেখে নিই ততক্ষণ—

—সব ঠিক আছে জ্যাঠামশাই। কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি বরং শুধুনেচি কেটে লুচিগুলো বেলে দিন—কপিটা হয়ে গেলেই চাট্‌নি রাঁধব—তারপর লুচিভেজে গরম গরম—ওতে কি জ্যাঠামশায়?...ও কি?

হাজারি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিতেকরিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—এই কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ —আজ পয়লা তারিখে ও মাসের ক'দিনের মাইনেটা দিলে কি না—তাই ভাবলাম একটুখানি মিষ্টি—

কুসুম রাগ করিয়া বলিল—এ আপনার বড্ড অন্যাই কিন্তু জ্যাঠামশায়। আপনার এই সবে চাকুরির মাইনে—আমার জন্যে খরচ করে সন্দেশ না কিনলে আর চলতো না?আপনার দণ্ড করতে আমার এখানে সেবা করতে বলেছি?...না, এসব কি ছেলেমানুষী আপনার—

হাজারি শালপাতার ঠোঙাটি দাওয়ার প্রান্তে অপরাধীর মত সঙ্কোচের সহিত নামাইয়ারাখিয়া বলিল—আমার কি ইচ্ছে করে না মা, তোমার জন্যে কিছু আনতে? বাবামেয়েকে খাওয়ায় না বুঝি?

হাজারির রকম-সকম দেখিয়া কুসুমের হাসি পাইলেও সে হাসি চাপিয়া রাগেরসুরেই বলিল—না ভারি চটে গিয়েছি—পয়সা হাতে এলেই অমনি খরচ করার জন্যে হাত সুড়সুড় করে বুঝি? ভারী বড়লোক হয়েছেন বুঝি? ও মাসের সাতটা দিন কাজকরে কত মাইনে পেয়েছেন যে এক টাকার সন্দেশ আনলেন অমনি?

হাজারি চুপ করিয়া অপ্রতিভ মুখে বসিয়া রহিল।

—আসুন ইদিকে, এই আসনখানায় বসুন, ময়দাটা নেচি করুন এবার—মা কাহাকেঅত বকিতেছে দেখিতে কুসুমের ছেলে মেয়ে কোথা হইতে আসিয়া সামনের উঠানে দাঁড়াইতে হাজারি ঠোঙা হইতে সন্দেশ লইয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু দিয়া বলিল— যাক, নাতিনাতনী তো আগে খাক—মেয়ে খায় না খায় বুঝবে পরে—

পরে কুসুমের দিকে ফিরিয়া বলিল—নাও হাত পাতো, আর রাগ করে না—

কুসুম এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—আমি রাঁধতে রাঁধতেখাব?

—কেন আলগোছে?

—না।

—কেন?

—আমি বুড়ো মাগী, ভোজের আগে পেরসাদ পেয়ে বসে থাকি আর কি!হাজারি বুঝিল তাহার খাওয়া না হইয়া গেলে কুসুম কিছুই খাইবে না। সে বিনাবাক্যব্যয়ে লুচির ময়দা লইয়া বসিয়া গেল।...

কুসুম বলিল—হোটেল খুলবার কি করলেন?

—গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে।দেখেচ ঘরখানা?

কুসুম উৎফুল্ল হইয়া বলিল—কবে খুলবেন?

—সামনের মাসে। টাকা দেবে তো?

কুসুম গলার সুর নীচু করিয়া বলিল—আস্তে আস্তে। কেউ শুনবে—

—তোমার শাশুড়ী কই?

—আমি যেতে পারলাম না বাইরে, তাই দুধ নিয়ে বেরিয়েছে—এল বলে।

—বাত সেরেছে?

—মরচের মাদুলী নিয়ে এখন ভাল আছে। আগে মধ্যে দিনকতক পঙ্গু হয়েপড়েছিল—তার চেয়ে ঢের ভাল। আপনার জায়গা করে দিই—ওগুলো ভেজে ফেলুন— গরম গরম দেবো—

হাজারি খাইতে বসিল। কুসুম কাছে বসিয়া কখনও লুচি, কখনও তরকারি দিতেদিতে বলিল—আপনি তরকারিতে বেশী করে নুন মেখে খান—

রান্না চমৎকার হয়েছে মা—

—থাক আপনার আর—

—হোটেল যেদিন খুলবো, সেদিন তোমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবো—

—না। ও সব করতে দেবো না। বুঝেসুঝে চলতে হবে না? টাকা নিয়ে ভূতোনন্দিকাণ্ড করবেন?

—কিছু করবো না। তুমি চেনো না আমায়।

—আমার জন্যে এক পয়সা খরচ করতে পাবেন না আপনি বলে দিচ্ছি। তাহলে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবো—ঠিক।

পনেরো দিন পরে হাজারি স্বগ্রামে সংসারের খরচপত্র দিতে গেল। বৈকালে হরিবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিল হরিবাবু বৈঠকখানায় আরও দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোকেরসহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে এসো হাজারি, বসো বসো। এঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে অতসীকে দেখতে—তুমি এসেছ ভালইহয়েছে। রাত্রে আমার এখানে খেও আজ—

অতসীর তাহা হইলে বিবাহ? যদি ইতিমধ্যে তার বিবাহ হইয়া যায়, সে শ্বশুরবাড়ীচলিয়া গেলে টাকাকড়ির ব্যাপার চাপা পড়িয়া যাইবে। হাজারি একটু দমিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে হরিবাবু বলিলেন—আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে আসি—আপনাদেরততক্ষণ চা দিয়ে যাক।

ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিলে একত্রে চা খাওয়া যাইবে।তাঁহারা ততক্ষণ একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই অতসী আসিয়া বৈঠকখানায় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা হইতেএকবার সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—এসো, এসো মা। ভাল আছ?

—আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু? গোপালনগর থেকে আসছেন?

—নামা। আমি গোপালনগরে আর নেই তো? রাণাঘাটের সেই হোটেলে কাজআবার নিয়েছি যে। ওরা ডেকে বহাল করলে।

—করবে না? আপনার মত লোক পাবে কোথায়? আমায় এবার একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে যান, কাকাবাবু। আপনার নাম করবো চিরকাল।

—মা, এ হাতেকলমের জিনিস। বলে দিলে তো হবে না, দেখিয়ে দিতে হবে। তার সুবিধে হবে কি? আমি এর আগেও তোমাকে তো বলেছি একথা।

—কাল আপনার বাড়ী যাবো এখন। টেঁপিকে বলবেন। তাকে নিয়ে এলেন নাকেন? তাকে নিয়ে আসবেন, সেও আমাদের এখানে রাত্রে খাবে।

অতসী একটু পরেই চলিয়া গেল, কারণ আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির গলার আওয়াজপাওয়া গেল বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে।

পরদিন সকালে টেঁপির মা উঠান ঝাঁট দিতেছে এমন সময়ে অতসী বাড়ীর উঠানের মাচাতলা হইতে ডাকিল, —টেঁপি, ও টেঁপি—

টেঁপির মা তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।জমিদারের মেয়ে অতসী গ্রামের কাহারও বাড়ী বড় একটা যায় না, তাহাদের মত গরীব লোকের বাড়ী যে যাতায়াত করিতেছে—ইহা ভাগ্যের কথাও বটে, গর্ব করিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত কথাও বটে।

হাসিয়া বলিল—টেঁপি বাসন নিয়ে পুকুরে গিয়েছে—এসো বসো মা।

—কাকাবাবু কোথায়?

হাজারি কাল রাত্রে অতসীদের বাড়ী গুরুতর আহার করিলেও আজ হাঁটিয়া তিনক্রোশ পথ রাণাঘাট যাইবে, এই অজুহাতে বড় এক বাটি চালভাজা নুন লঙ্কা সহযোগেঘরের ওদিকে দাওয়ায় বসিয়া চর্বণ করিতেছিল—অতসী পাছে এদিকে আসিয়া পড়েএবং তাহার চালভাজা খাওয়া দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে বাটিটা সে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া চাপা দিল।

অতসী আসিয়া বলিল—কই কাকাবাবু কোন্ দিকে বসে?

ওঃ খুব সময়ে চালভাজার বাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সে।...অতসী তাহাকে রাক্ষসভাবিত—রাত্রের ওই ভীষণ খাওয়ার পরে সকাল হইতে না হইতেই—

—এই যে মা—কি মনে করে এত সকালে?

—আপনি আমাদের বাড়ী দুপুরে খাবেন তাই বলতে বলে দিলেন বাবা—

মা, আমি এখুনি বেরুচ্ছি রাণাঘাট——ছুটি তো নেই—আর কাল রাতে যেখাওয়া হয়েছে তাতে—

—তবে টেঁপি আর খুড়ীমা খাবেন—ওঁদের নেমন্তন্ন—আমি বলে যাচ্ছি ওঁদের।বলিয়া অতসী দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল দেখিয়া হাজারি প্রমাদ গণিল। একে সময় নাই, দশটার মধ্যে হোটেলে পৌঁছিয়া রান্না চাপাইতে হইবে। এক বাটি চালভাজা চিবাইতেও তো সময় লাগে! হতভাগা মেয়েটা সব মাটি করিল।... বাটিটা লুকাইয়া বসিয়া থাকাই বা কতক্ষণ চলে?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমার সঙ্গে যদি আপনার আর দেখা না হয়?

—কেন দেখা হবে না?

অতসী লাজুক মুখে বলিল—ধরুন যদি আমি—এখান থেকে যদি—

—বুঝেছি মা, ভালই তো, আনন্দের কথাই তো।

—আপনারা তাড়াতে পারলে বাঁচেন তা জানিই। মার মুখেও সেই এক কথা, বাবার মুখেও সেই এক কথা। সে যা হয় হবে, আমি তা বলছি নে। আমি বলছি আপনি আজ থেকে যান, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে— সেই টাকা, মনে আছে তো? আপনাকে তা আজ দিয়ে দিই। যদি বলেন তো এখুনি আনি। আমার মনের ভার কমে যায়, তারপর যেখানে আপনারা আমায় বিদেয় করে দেন দেবেন—

—ওকি মা! বিদেয় তোমায় কেউ করছে না। অমন কথা বলতে নেই।...কিন্তু টাকানিতান্তই দেবে তাহলে?

—যখন বলেছি, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন কাকাবাবু আমি মিথ্যে বলছি?

—তা ভাবিনি—আচ্ছা ধরো এমন তো হতে পারে, আমি হোটেল খুলে লোকসানদিলাম, তখন তোমার টাকা তো শোধ দিতে পারবো না?

—আমি তো বলেছি, না দিতে পারেন তাই কি?...আপনি বসুন, আমি টাকা নিয়েআসি—

আধঘণ্টার মধ্যে অতসী ফিরিল। সন্তর্পণে আঁচলের গেরো খুলিয়া তাহাকে দুইশত টাকার খুচরা নোট গুনিয়া দিতে দিতে বলিল—এই রইল। আমার টাকা ফেরত দিতেহবে না। টেঁপির বিয়ে দেবেন সে টাকায়। আমি যাই, লুকিয়ে চলে এসেছি, বাবাখুঁজবেন আবার।

রাণাঘাট যাইতে সারাপথ হাজারি অন্যমনস্কভাবে চলিল...

বেশ মেয়ে অতসী, ভগবান ওর ভাল করুন। তাহার মন বলিতেছে ওর হাত দিয়াযে টাকা আসিয়াছে—সে টাকায় ব্যবসা খুলিলে লোকসান যাইবে না। স্বয়ং লক্ষ্মী যেনতাহার হাতে আসিয়া টাকা গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

হোটেলে পৌঁছিয়া সে দেখিল রান্নাঘরে বংশী ঠাকুর ডাল চাপাইয়া একা বসিয়া।তাহাকে দেখিয়া বলিল—আরে এসো হাজারি-দা, বড্ড বেলা করলে যে! বড় ডেকে ভাতটা চাপাও—নেবে নাকি একটু দম দিয়ে?

—তা নাও না? সাজো গিয়ে—আমি ডাল দেখছি—

একটু পরে গাঁজার কলিকাটি হাজারির হাতে দিয়া বংশী বলিল—একটা বড় কাজের বায়না এসেচে, নেবে? আন্দুলের ঘোষেদের বাড়ী রাস হবে—সাতদিনের ঠিকেকাজ। বোঁদে ভিয়েন, সন্দেশ ভিয়েন, রান্না এই সব। দু'টাকা মজুরি দিন—খোরাকিবাদে।

হাজারি বলিল—বংশী একটা কথা বলি তোমায়। আমি হোটেল খুলছি রাণাঘাটের বাজারে। কাউকে বোলো না কথাটা। তোমাকে আসতে হবে আমার হোটেলে।

কথাটা ঠিক শুনিয়াছে বলিয়া বংশীর যেন মনে হইল না। সে অবাক্ হইয়া উহারদিকে চাহিয়া বলিল—হোটেল খুলবে? তুমি!

—হাঁ, আমি না কে? তোমার বেহাই?

বংশী বলিল—কি পাগলের মত বলছ হাজারি-দা? কল্‌কে রাখো, আর টান দিও। রেল বাজারে একটা হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে তুমি জানো?

—কত টাকা বলে তোমার মনে হয়?

—পাঁচশো টাকার কম নয়।

—চারশোতে হয়না?

—আপাতত চলবে—কিন্তু কে তোমায় চারশোটাকা—

উত্তরে কোঁচার কাপড়ের গেরো খুলিয়া হাজারি বংশীকে নোটের তাড়া দেখাইয়াবলিল—এই দেখছো তো দুশো টাকা এতে আছে। যোগাড় করে এনেছি। এখন লাগো গাছকোমর বেঁধে—তোমার অংশ থাকবে যদি প্রাণপণে চালাতে পারো—তোমায়ফাঁকি দেবো না। আজ থেকেই বাড়ী দেখ—পনেরো টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবো—আরদুশো টাকাও যোগাড় আছে।

বংশী ঠাকুর মুখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিল—ভ্যালা আমার মানিকরে। হাজারি-দা, এসো তোমায় কোলে করে নাচি। এক অস্ত্রে বেচু চক্কত্তি বধ, পদ্মদিদিবধ, যদু বাঁড়ুয্যে বধ—

—চুপ,চুপ,—চলো ছুটির পর দুজনে ঘর দেখা যাক্। তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। জায়গাটা ভাল। আচ্ছা, বাজার কেমন, বংশী?

—বাজার ভালো। নতুন আলু সস্তা হলে আরও সুবিধে হবে। নতুন আলু উঠলোবলে। কেবল মাছটা এখনও আক্রা—

—ঘর দেখার পর একটা ফর্দ করে ফেলা যাক এসো। থালা, বাসন, বালতি, জালা, শিলনোড়া, বঁটি—

—আজ খাওয়াও হাজারি-দা। মাইরি, একটা কাজের মত কাজ করলে। আচ্ছা টাকা পেলে কোথায় বল না?

—পরে বলবো সব। তার ঢের সময় আছে। এখন আগেকার কাজ আগে করো।

পদ্মঝি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—বেশ তো দুটিতে বসে খোশগল্প চলছে।উদিকে মাছ ডাঙায়, তরকারি ডাঙায়—এখুনি লোক খেতে আসবে—

গোবরা চাকর হাঁকিল—থাড় কেলাস একথালা—

পদ্মঝি বলিল—ওই! এলো তো? এখন মাছ ভাজা পর্যন্ত হল না যে তাই দিয়েভাত দেবে। এদিকে গাঁজার ধোঁয়ায় তো রান্নাঘর অন্ধকার—সব তাড়াতে হবে তবেহোটেল চলবে। কর্তার খেয়েদেয়ে নেই কাজ তাই যত হাড়হাভাতে উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আবার জুটিয়ে এনে হাতাবেড়ি হাতে দিয়েছে—

বংশী ঠাকুর বলিল—রাগ করো কেন পদ্মদিদি, কাল রাতের বাসি মাছ ভেজে রেখেছি—থাড্ কেলাসের খদ্দের যারা সকালে খায়, তাই চিরকাল খেয়ে আসছে।

হাজারি বংশীর দিকে চাহিয়া বলিল—না বংশী, দই এনে দাও সেও ভাল, বাসি মাছ দিও না—ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—ও থাক।

পদ্মঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—দইয়ের পয়সা তুমি দিও তবে ঠাকুর। হোটেলথেকে দেওয়া হবে না। তুমি বেলা করে বাড়ী থেকে এলে বলেই মাছ হল না। বংশীঠাকুর একা কত দিকে যাবে?

হাজারি চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলের ছুটির পর হাজারি চূর্ণীঘাটে যাইবার পথে রাধাবল্লভতলায় বার বারনমস্কার করিয়া গেল। ঠাকুর রাধাবল্লভ এতদিন পরে যেন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাহার সেই প্রিয় গাছটির তলায় বসিয়া হাজারি কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। অতসী টাকা দিয়া দিয়াছে—তাহার বাড়ী বহিয়া আসিয়া টাকা দিয়াছে হয়তো সে হোটেলখুলিতে দেরি করিত, কিন্তু আর দেরি করা চলিবে না। অতসী-মায়ের কাছে কথা দিয়াছে, সে কথা রাখিতে হইবেই তাহাকে।

রাণাঘাট বেশ লাগে তাহার, বেচুবাবুর হোটেল তো একমাত্র জায়গা যেখানে তাহারমন ভাল থাকে, জীবনটা শান্তিতে কাটাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই রাণাঘাটেররেলবাজার ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এখানেই হোটেল খুলিবে অন্যত্রনয়।

বৈকালের দিকে সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম বলিল—আজকে এলেন? আসুন, বসুন।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—একটা জিনিস রাখতে হবে মা।

—কি?

হাজারি পেট-কোঁচড় হইতে দু'শ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল রেখে দাও।

কুসুম অবাক হইয়া বলিল—কোথায় পেলেন?

—ভগবান দিয়েছেন। হোটেল খুলবার রেস্ত জুটিয়ে দিয়েছেন এতদিন পরে—এই দু'শ, আর তোমার দু'শ, সামনের মাসেই খুলবো ভাবছি।

—এ টাকা কে দিলে জ্যাঠামশায় বললেন না আমায়?—তোমার মত আর একটি মা?

—আমি চিনিনে?

—আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ে অতসী। বলবো সে সব কথা আর একদিন, আজবেলা যাচ্ছে, আমি গিয়ে ডেক চাপাই গে—টাকা রেখে দাও এখন।

হোটেলে আসিয়া বংশীকে বলিল—তোমার ভাগ্নেটিকে চিঠি লিখে আনাও বংশী। তাকে গদিতে বসতে হবে। লেখাপড়ার কাজ তো আমায় বা তোমায় দিয়ে হবে না।

বংশী বলিল—সে তো বসেই আছে হাজারি-দা। একটা কাজ পেলে বেঁচে যায়। আমি আজই লিখছি আর ঘর আমি দেখে এসেছি। তামাকের দোকানের পাশেঘরটা ভাল—ওইটেই নাও। লেগে যাও দুর্গা বলে।

দিন দুই পরে একদিন সকালে পদ্মঝি বলিল—ও ঠাকুর, শুনে রাখো, আজকোথাও যেও না সব ছুটির পরে। আজ ওবেলা সত্যনারায়ণের সিন্নি—খদ্দেরদের ভাত দেবার সময় বলে দিও ও-বেলা যেন থাকে—আর তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমারসঙ্গে বেরুবে সত্যনারায়ণের বাজার করতে।

বংশী ঠাকুর হাজারির দিকে চাহিয়া হাসিল—অবশ্য পদ্মঝি চলিয়া গেলে।

ব্যাপারটা এই, হোটেলের এই যে সত্যনারায়ণের পূজা, ইহা ইহাদের একটি ব্যবসা।যাহারা মাসিক হিসাবে হোটেলে খায় তাহাদের নিকট হইতে পূজার নাম করিয়া চাঁদাবা প্রণামী আদায় হয়। আদায়ী টাকার সব অংশ

ব্যয় করা হয় না বলিয়াই হাজারি বা বংশীর ধারণা। অথচ, সত্যনারায়ণের প্রসাদের লোভ দেখাইয়া দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা তাহাদেরও রাত্রে আনিবার চেষ্টা করা হয়—কারণ এমন অনেক নগদ খরিদ্দারআছে, যাহারা একবেলা হোটেলে খাইয়া যায়, দুই-বেলা আসে না।

বংশী ঠাকুর পরিবেশনের সময় প্রত্যেক ঠিকা খরিদ্দারকে মোলায়েম হাসি হাসিয়াবলিতে লাগিল—আজ্ঞে বাবু, ও-বেলা সত্যনারায়ণ হবে হোটেলে আসবেন
ও-বেলা—অবিশ্যি করে আসবেন—

বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তিও খরিদ্দারদিগকে ঠিক অমনি বলিতে লাগিল।

বংশী ঠাকুর হাজারিকে আড়ালে বলিল—সব ফাঁকির কাজ, এক চিল্‌তে কলারপাতার আগায় এক হাতা করে গুড় গোলা আটা আর তার ওপর দুখানা বাতাসা—হয়ে গেল এর নাম তোমার সত্যনারায়ণের সিন্নি। চামার কোথাকার—

সন্ধ্যার সময় পূর্ণ ভট্‌চাজ সত্যনারয়ণের পূজা করিতে আসিলেন। বাসনের ঘরে সত্যনারায়ণের পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। হোটেলের দুই চাকর মিলিয়া ঘড়ি ও কাঁসর পিটাইতেছে, পদ্মঝি ঘন ঘন শাঁখে ফুঁ পাড়িতেছে—খানিকটা খরিদ্দার আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেও বটে।

স্টেশনে যে চাকর ‘হি-ই-ই-ন্দু হো-টে-ল-ল’ বলিয়া চেঁচায়, তাহাকেও বলিয়াদেওয়া হইয়াছে, সে যাত্রীদের প্রত্যেককে বলিতেছে—আসুন বাবু, সিন্নি পেরসাদহচ্চেন হোটেলে, খাওয়ার বড্ড জুৎ আজগে —আসুন বাবু,—

যাহারা নগদ পয়সার খরিদ্দার, তাহারা ভাবিতেছে—অন্য হোটেলেও তো পয়সা দিয়া খাইবে যখন তখন সত্যনারায়ণের প্রসাদ ফাউ যদি পাওয়া যায়, বেচু চক্কত্তির হোটেলেই যাওয়া যাক্ না কেন। ফলে যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের দৈনিক নগদ খরিদ্দারযাহারা, তাহারাও অনেকে আসিয়া জুটিতেছে এই হোটেলে। এদিকে নগদ খরিদ্দারদেরজন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের সিন্নি খাইতে দেওয়া হইবে ভাতের পাতে অর্থাৎ টিকিটকিনিয়া ভাত খাইতে ঢুকিলে তবে। নতুবা সিন্নিটুকু খাইয়া লইয়াই যদি খরিদ্দারপালায়?

মাসিক খরিদ্দারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা। তাহারা চাঁদা দিয়াছে, বিশেষত তাহাদেরখাতির করাও দরকার। পূজা সাঙ্গ হইলে তাহাদের সকলকে একত্র বসাইয়া প্রসাদখাইতে দেওয়া হইল—বেচু চক্কত্তি নিজে প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেলাগিলেন তাহারা আর একটু করিয়া প্রসাদ লইবে কি না।

যখন ওদিকে মাসিক খরিদ্দারগণকে সিন্নি বিতরণ করা হইতেছে, সে সময় হাজারি দেখিল রাস্তার উপর যতীন মজুমদার দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। সেই যতীন...

হাজারির মনে হইল লোকটার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেনঅনাহারশীর্ণ চেহারা। সে ডাকিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, কেমন আছেন?

যতীন মজুমদার অবাক হইয়া বলিল— কে হাজারি নাকি? তুমি আবার কবে এলেএখানে?

—সে অনেক কথা বলবো এখন। আসুন না—আসুন—

যতীন ইতস্তত করিয়া রান্নাঘরের পাশে বেড়ার গায়ের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিয়ারান্নাঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি দেখিল তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে অতি মলিন উড়ানি, পরনের ধুতিখানিওতদ্রূপ। আগের চেয়ে রোগাও হইয়া গিয়াছে লোকটা। দারিদ্র্য ও অভাবের ছাপ চোখেমুখে বেশ পরিস্ফুট।

যতীন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—আরে, তোমাদের এখানে বুঝি সত্যনারায়ণ হচ্ছেআজগে? আগে আমিও কত এসেছি খেয়েছি—

—তা খাবেন না? আপনি তো ছিলেন বারোমাসের বাঁধা খদ্দের—তা আসুন।পেরসাদ খেয়ে যান—

যতীন ভদ্রতা করিয়া বলিল—না না, থাক্ থাক্—তার জন্যে আর কি হয়েছে—

হাজারি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোনোদিকে নাই। সবাই খাবারঘরে মাসিক খরিদ্দারের আদর আপ্যায়ন করিতে ব্যস্ত—সে কলার পাত পাতিয়া যতীনকে বসাইল এবং পাশে বাসনের ঘর হইতে বড় বাটির একবাটি সত্যনারায়ণের সিন্নি, একমুঠা বাতাসা ও দুটি পাকা কলা আনিয়া যতীনের পাতে দিয়া বলিল—একটু পেরসাদ খেয়ে নিন—

যতীন মজুমদার দ্বিরুক্তি না করিয়া সিন্নির সহিত কলাদুটি চটকাইয়া মাখিয়া লইয়াযেভাবে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল, তাহাতে হাজারির মনে হইল লোকটা সত্যই যথেষ্টক্ষুধার্ত ছিল, বোধ হয় ওবেলা আহার জোটে নাই। তিন চার গ্রাসে অতখানি সিন্নি সেনিঃশেষে উড়াইয়া দিল।

হাজারি বলিল—আর একটু নেবেন?

যতীন পূর্বের মত ভদ্রতার সুরে বলিল—না না, থাক্ থাক্ আর কেন—

হাজারি আরও এক বাটি সিন্নি আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিতে যতীনের মুখচোখ যেনউজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার খাওয়া অর্ধেক হইয়াছে এমন সময় পদ্মঝি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া হাজারিকে কি একটা বলিতে গেল এবং গোগ্রাসে ভোজনরত যতীন মজুমদারকেদেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ও কে?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, চিনতে পাচ্ছ না পদ্মদিদি? আমাদের পুরোনো বাবু। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তা আমি বল্লাম আজ পুজোর দিনটা একটু পেরসাদ পেয়েযান বাবু—

পদ্মঝি বলিল—বেশ—বলিয়াই সে ফিরিয়া আবার গিয়া মাসিক খরিদ্দারদেরখাবার ঘরে ঢুকিল।

যতীন ততক্ষণ পদ্মঝিকে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথাবলিবার সুযোগ ঘটিল না তাহার। সে খাওয়া শেষ করিয়া এক ঘটি জল চাহিয়া লইয়াখাইয়া চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গোবরা চাকর আসিয়া বলিল—ঠাকুর, কর্তা তোমাকে ডাকছেন—

হাজারি বুঝিয়াছিল কর্তা কি জন্য তাহাকে জরুরী তলব দিয়াছেন। সে গিয়া বুঝিল তাহার অনুমান সত্য—কারণ পদ্মঝি মুখ ভার করিয়া গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির সামনেদাঁড়াইয়া। বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি, তুমি যতনেটাকে হোটেলে ঢুকিয়ে তাকেবসিয়ে সিন্নি খাওয়াচ্ছিলে?

পদ্মঝি হাত নাড়িয়া বলিল—আর খাওয়ানো বলে খাওয়ানো! এক এক গাম্‌লা সিন্নি দিয়েছে তার পাতে—ইচ্ছা ছিল নুকিয়ে খাওয়াবে, ধর্মের ঢাক বাতাসে, আমিগিয়ে পড়েছি সেই সময় বড় ডেক্ নামালো কি না তাই দেখতে—আমায় দেখে—

হাজারি বিনীত ভাবে বলিল—সত্যনারায়ণের পেরসাদ বলেই বাবু দিয়েছিলাম—আমাদের পুরোনো খদ্দের—

বেচু চক্কত্তি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পুরোনো খদ্দের? ভারি আমার পুরোনোখদ্দের রে? হোটেলের একটি মুঠো টাকা ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, ভারি খদ্দের আমার। চার মাস বিনি পয়সায় খেয়ে গেল একটি আধ্‌লা উপুড়-হাত করলে না, পয়লা নম্বরের জুয়াচোর কোথাকার—খদ্দের! তুমি কার হুকুমে তাকে হোটেলে ঢুকতেদিলে শুনি?

পদ্মঝি বলিল—আমি কোনো কথা বল্লেই তো পদ্ম বড় মন্দ! এই হাজারি ঠাকুর কি কম শয়তান নাকি—বাবু? আপনি জানেন না সব কথা, সব কথা আপনার কানেতুলতেও আমার ইচ্ছে করে না। নুকিয়ে নুকিয়ে হোটেলের আদ্ধেক জিনিস ওঠে ওরএয়ার বকশীদের বাড়ী। যত্নে ঠাকুরওর এয়ার, বুঝলেন না আপনি? বহাল

করেনলোক, তখন আমি কেউ নই— কিন্তু হাতে হাতে ধরে দেবার বেলা এই জনা না হলেওদেখি চলে না— এই দেখুন আবার চুরি-চামারি শুরু যদি না হয় হোটেলে, তবে আমারনাম—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এটা তোমার নিজের হোটেল নয় যে তুমি হাজারি ঠাকুরএখানে যা খুশি করবে। নিজের মত এখানে খাটালে চলবে না জেনো। তোমার আটআনা জরিমানা হল।

হাজারি বলিল—বেশ বাবু, আপনার বিচারে যদি তাই হয়, করুন জরিমানা। তবে যতীনবাবু আমার এয়ারও নয় বা সে সব কিছুই নয়। এই হোটেলেই ওঁর সঙ্গে আমারআলাপ—ওঁকে দেখিনিও কতদিন। পদ্মদিদি অনেক অনেয্য কথা লাগায় আপনারকাছে—আমি আসছে মাস থেকে আর এখানে চাকরি করবো না।

পদ্মঝি এ কথায় অনর্থ বাধাইল। হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল— লাগায়? লাগায় তোমার নামে? তুমি যে বড় লাগাবার যুগ্যি লোক! তাই পদ্ম লাগিয়ে লাগিয়ে বেড়াচ্চে তোমার নামে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার মত লোককে পদ্ম গেরায্যির মধ্যে আনে না তা তুমি ভাল করে বুঝো ঠাকুর। যাও না, তুমি আজইচলে যাও। সামনের মাসে কেন, মাইনেপত্তর চুকিয়ে আজই বিদেয় হও —তোমারমত ঠাকুর রেল-বাজারে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—চুপ চুপ পদ্ম, চুপ করো।খদ্দেরপত্র আসচে যাচ্চে, ওকথাএখন থাক। পরে হবে— আচ্ছা তুমি যাও এখন হাজারি ঠাকুর—

অনেক রাত্রে হোটেলের কাজ মিটিল।

শুইবার সময় হাজারি বংশীকে বলিল—দেখলে তো কি রকম অপমানটা আমায় করলে পদ্মদিদি? তুমিও ছাড়ো, চল দুজনে বেরিয়ে যাই। দ্যাখো একটা কথা বংশী, এইহোটেলের ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, মুখে বলি বটে যাই যাই—কিন্তযেতে মন সরে না। কতকাল ধরে তুমি আর আমি এখানে আছি ভেবে দ্যাখো তো? এ যেন আপনার ঘর বাড়ী হয়ে গিয়েচে—তাই না? কিন্তু এরা—বিশেষ করে পদ্মদিদি এখানে টিকতে দিলে না—এবার সত্যিই যাবো।

বংশী বলিল—যতীনকে তুমি ডেকেছিলে, না ও আপনি এসেছিল?

—আমি ডেকেছিলাম। ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আজকাল খেতেই পায়না। তাই ডাকলাম। বলি পুরোনো খদ্দের তো, কত লোক খেয়ে যাচ্ছে, ও একটু সিন্নিখেয়ে যাক্। এই তো আমার অপরাধ।

পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশেই নূতন হোটেলটা খুলিল। টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।ভাত,ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।

আসুন! দেখুন !! পরীক্ষা করুন!!!

বেচু চক্কত্তির হোটেলের অনুকরণে সামনেই গদির ঘর। সেখানে বংশী ঠাকুরেরভাগ্নে সেই ছেলেটি কাঠের বাক্সের উপর খাতা ফেলিয়া খরিদ্দারগণের আনাগোনারহিসাব রাখিতেছে। ভিতরে রান্না করিতেছে বংশী ও হাজারি—বেচু চক্কত্তির হোটেলেরমতই তিনটি শ্রেণী করা হইয়াছে সেই রকম টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়।

তা নিতান্ত মন্দ নয়। খুলিবার দিন দুপুরের খরিদ্দার হইল ভালই। বংশী খাইবার ঘরে ভাত দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া হাজারিকে বলিল—থাড্ কেলাস ত্রিশখানা। প্রথম দিনের হক্কে যথেষ্ট হয়েচে। ওবেলা মাংস লাগিয়ে দাও।

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিয়াছেন। হাজারি এখন হোটেলের মালিক।বেচু চক্কত্তির সমান দরের লোক সে আজ। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যত জানাশোনা পরিচিত লোক যে যেখানে আছে— সকলকেই কথাটা বলিয়া বেড়ায়। মনের আনন্দ চাপিতে নাপারিয়া বৈকালে কুসুমের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। কুসুম বলিল—কেমন চললোহোটেল জ্যাঠামশায়?

—বেশ খদ্দের পাচ্চি। আমার বড্ড ইচ্ছে তুমি একবার এসে দেখে যাও— তুমিতো অংশীদার—

—যাবো এখন। কাল সকালে যাবো। আপনার মনিব কি বল্লে?

—রেগে কাঁই। ও মাসের মাইনে দেয়নি—না দিগ্‌গে, সত্যিই বলছি কুসুম-মা, আমার বয়েস কে বলে আটচল্লিশ হয়েচে? আমার যেন মনে হচ্ছে আমার বয়স পনের বছর কমে গিয়েচে। হাতপায়ে বল এসেচে কত। তুমি আর আমার অতসী মা—তোমরা আর জন্মে আমার কি ছিলে জানিনে। তোমাদের—

কুসুম বাধা দিয়া বলিল—আবার ওই সব কথা বলচেন জ্যাঠামশায়? আমার টাকা দিইচি সুদ পাবো বলে। এ তো ব্যবসায় টাকা ফেলা—টাকা কি তোরঙ্গের মধ্যে থেকেআমার স্বগ্‌গে পিদিম দিতো? বলিনি আমি আপনাকে? তবে হ্যাঁ, আমাদের বাবুর মেয়ের কথা যা বল্লেন, সে দিয়েচে বটে কোন খাঁই না করে। তার কথা, হাজার বারবলতে পারেন। তার বিয়ের কি হোল?

—সামনের সোমবার বিয়ে। চিঠি পেয়েছি—যাচ্ছি ওদিন সকালে।

—আমার কাকার সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে এসব টাকাকড়ির কথা যেন বলবেন নাসেখানে।

—তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না মা, যতবার দেখা হয়েছে তোমার নামটি পর্যন্তকখনো সেখানে ঘুণাক্ষরে করিনি। আমারও বাড়ী এঁড়োশোলা, আমায় তোমার কিছুশেখাতে হবে না।

কথামত পরদিন সকালে কুসুম হোটেল দেখিতে গেল। সে দুধ দই লইয়া অনেকবেলা পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়—তাহার পক্ষে ইহা আশ্চর্যের কথা কিছুই নহে।

হাজারি তাহাকে রান্নাঘরে যত্ন করিয়া বসাইতে গেল—সে কিন্তু দোরের কাছেদাঁড়াইয়া রহিল, বলিল—আমি গুরুঠাকরুণ কিছু আসিনি যে আসন পেতে যত্ন করেবসাতে হবে।

হাজারি বলিল—তোমারও তো হোটেল কুসুম-মা—তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভাল করে দেখো শোনো। কি হচ্ছে না হচ্ছে তদারক করো—এতে লজ্জা কি? বংশী, চিনে রাখো এ একজন অংশীদার।

এ কথায় কুসুম খুব খুশি হইল—মুখে তাহার আহ্লাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন—এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে। এ ভাবে ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। হাজারি বলিল—আজ মাছ রান্না হয়েছে বেশ পাকা রুই। তুমি একটু বসো মা, মুড়োটা নিয়ে যাও।

—না না জ্যাঠামশায়।—ওসব আপনাকে বারণ করে দিইচি না। সকলের মুখবঞ্চিত করে আমি মাছের মুড়ো খাবো—বেশ মজার কথা!

—আমি তোমার বুড়ো বাবা, তোমাকে খাইয়ে আমার যদি তৃপ্তি হয়, কেন খাবেনা বুঝিয়ে দাও।

হোটলের চাকর হাঁকিল—থাড্ কেলাস তিন থালা—

হাজারি বলিল—খদ্দের আসছে বোসো মা একটু। আমি আসছি, বংশী ভাত বেড়ে ফেলো।

আসিবার সময় কুসুম সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত হাজারির দেওয়া এক কাঁসি মাছতরকারি লইয়া আসিল।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারি এঁড়োশোলা হইতে গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট ফিরিতেছে, সঙ্গে টেঁপির মা, টেঁপি ও ছেলেমেয়ে। তাহার হোটেলের কাজ আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাণাঘাটেবাসা না করিলে আর চলে না।।

টেঁপির মা বলিল—আর কতটা আছে হ্যাঁগা?

—ওই তো সেগুন বাগান দেখা দিয়েছে—এইবার পৌঁছে যাবো—

টেঁপি বলিল—বাবা, সেখানে নাইবো কোথায়?পুকুর আছে না গাঙ?

—গাঙ আছে, বাসায় টিউব কল আছে।

টেঁপির মা বলিল—তাহোলে জল টানতে হবে না পুকুর থেকে। বেঁচে যাই—

ইহারা কখনো শহরে আসে নাই—টেঁপির মার বাপের বাড়ী এঁড়োশোলার দু ক্রোশ উত্তরে মণিরামপুর গ্রামে। জন্ম সেখানে, বিবাহ এঁড়োশোলায়, শহর দেখিবার একবারসুযোগ হইয়াছিল অনেকদিন আগে, অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একবারনবদ্বীপে রাস দেখিতে গিয়াছিল।

হোটেলের কাছেই একখানা একতলা বাড়ী পূর্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টেঁপির মা বাড়ী দেখিয়া খুব খুশি হইল। চিরকাল খড়ের ঘরে বাস করিয়া অভ্যাস, কোঠাঘরে বাসএই তাহার প্রথম।

—ক'খানা ঘর গা? রান্নাঘর কোন্ দিকে? কই তোমার সেই টিউকল দেখি? জলবেশ ওঠে তো? ওরে টেঁপি, গাড়ীর কাপড়গুলো আলাদা করে রেখে দে—একপাশে। ওসব নিয়ে ছিষ্টি ছোঁয়ানেপা করো না যেন, বস্তার মধ্যে থেকে একটি ঘটি আগে বেরকরে দাও না গো, এক ঘটি জল আগে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে কুসুম আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—ও জেঠিমা, এলেন সব? বাসা পছন্দহয়েছে তো?

টেঁপির মা কুসুমকে চেনে। গ্রামে তাহাকে কুমারী অবস্থা হইতেই দেখিয়াছে।বলিল—এসো মা কুসুম, এসো এসো। ভাল আছ তো? এসো এসো কল্যেণ হোক!

হোটেলের চাকর রাখাল এই সময় আসিল। তাহার পিছনে মুটের মাথায় এক বস্তা পাথুরে কয়লা। হাজারিকে বলিল—কয়লা কোন্‌দিকে নামাবো বাবু?

হাজারি বলিল—কয়লা আনলি কেন রে? তোকে যে বলে দিলাম কাঠ আনতে? এরা কয়লার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম বলিল—কয়লার উনুন আছে? আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি। আর শিখে নিতে তো হবে জেঠিমাকে। কয়লা সস্তা পড়বে কাঠের চেয়ে এ শহর-বাজার জায়গায়। আমি একদিনে শিখিয়ে দেবো জেঠিমাকে।

রাখাল কয়লা নামাইয়া বলিল—বাবু, আর কি করতে হবে এখন?

হাজারি বলিল—তুই এখন যাস্‌নে—জলটলগুলো তুলে দিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়েরেখে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে?

—এসেছে বাবু।

—তা থেকে এবেলার মত মাছ-তরকারি চার-পাঁচ জনের মত নিয়ে আয়। ওবেলাআলাদা বাজার করলেই হবে। আগে জল তুলে দে দিকি।

টেঁপির মা বলিল—ও কে গা?

—ও আমাদের হোটেলের চাকর। বাসার কাজও করবে, বলে দিইছি।

টেঁপির মা অবাক হইল। তাহাদের নিজেদের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' সম্বোধন করিতেছে—এ সব ব্যাপার এতই অভিনব যে বিশ্বাস করা শক্ত। গ্রামের মধ্যেতাহারা ছিল অতি গরীব গৃহস্থ, বিবাহ হইয়া পর্যন্ত বাসন-মাজা,জল-তোলা, ক্ষার-কাচা, এমন কি ধান ভানা পর্যন্ত সর্বরকম গৃহকর্ম সে একা করিয়া

আসিয়াছে।মাস চার পাঁচ হইল দুটি সচ্ছল অন্নের মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে, নতুবা আগে আগে পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাওয়াও সব সময় ঘটিত না।

আর আজ এ কি ঐশ্বর্যের দ্বার হঠাৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল! কোঠাবাড়ীচাকর, কলের জল—এ সব স্বপ্ন না সত্য?

রাখাল আসিয়া বলিল—দেখুন তো মা, এই মাছ-তরকারিতে হবে না আর কিছুআনবো?

বড় বড় পোনা মাছের দাগা দশ-বারো খানা। টেঁপির মা খুশির সহিত বলিল—নাবাবা, আর আনতে হবে না। রাখো ওখানে।

—ওগুলো কুটে দিই মা?

মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে! এ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ছিল!

হাজারি বলিল—আগে জল তুলে দে তারপর কুট্‌বি এখন। আগে সব নেয়ে নিই।

কুসুম কয়লার উনুনে আঁচ দিয়া আসিয়া বলিল—জেঠিমা আপনিও নেয়ে নিন্‌।ততক্ষণ আঁচ ধরে যাক্‌। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রান্না চড়িয়ে দেবার আর দেরি করবার দরকার কি? আমি এবার যাই।

টেঁপির মা বলিল—তুমি এখানে এবেলা খাবে কুসুম।

কুসুমব্যস্তভাবে বলিল—না না, আপনারা এলেন তেতেপুড়ে এই দুপুরের সময়। এখন কোনোরকমে দুটো ঝোলভাত রেঁধে আপনারা এবেলা খেয়ে নিন—তার মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাংনামায়—

—কিছু হাংনামা হবে না। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না। ভাল বেগুন এনেছিগাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না—বেগুন পোড়াবো এখন। বাপেরবাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ। কাল শুট্‌কে যাবে।

হাজারি স্নান সারিয়া বলিল—আমি একবার হোটেলে চল্লাম। তোমরা রান্না চাপাও। আমি দেখে আসি।

আধঘণ্টা পরে হাজারি ফিরিয়া দেখিল টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনে উনুনে পরিত্রাহি ফুঁ পাড়িতেছে। আঁচ নামিয়া গিয়াছে, তখনও মাছের ঝোল বাকি।

টেঁপির মা বিপন্নমুখে বলিল—ওগো, এ আবার কি হল, উনুন যে নিবে আসছে। কি করি এখন?

কুসুম বাড়ীতে স্নান করিতে গিয়াছে, রাখাল গিয়াছে হোটেলে, কারণ এই সময়টা সেখানে খরিদ্দারের ভিড় অত্যন্ত। এবেলা অন্তত একশত জন খায়। বেচু চক্কত্তি ও যদু বাঁড়ুয্যের হোটেল কানা হইয়া পড়িয়াছে। হাজারি নিজের হাতে রান্না করে, তাহার রান্নার গুণে—রেল-বাজারের যত খরিদ্দার সব ঝুঁকিয়াছে তাহার হোটেলে। তিনজনঠাকুর ও চারিজন চাকরে হিমসিম খাইয়া যায়। ইহারা কেহই কয়লার উনুনে আঁচদেওয়া দূরের কথা, কয়লার উনুনই দেখে নাই। আঁচ কমিয়া যাইতে বিষম বিপদেপড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া হাজারির হাসি পাইল। বলিল—শেখো, পাড়া-গেঁয়ে ভূত হয়ে কতকাল থাকবে? সরো দিকি? ওর ওপর আর চাট্টি কয়লা দিতে হয়—এই দেখিয়ে দিই।

টেঁপির মা বলিল—আর তুমি বড় শহুরে মানুষ। তবুও যদি এঁড়োশোলা বাড়ী নাহোত?

—আমি? আমি আজ সাত বছর এই রাণাঘাটের রেল-বাজারে আছি। আমাকেপাড়াগেঁয়ে বলবে কে? ও কথা তুলে রাখোগে ছিকেয়।

টেঁপি বলিল—বাবা এখানে টকি আছে? তুমি দেখেছ?

হাজারি বিশ হাত জলে পড়িয়া গেল। টকি বাইস্কোপ এখানে আছে বটে কিন্তুবাইস্কোপ দেখার শখ কখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু টেঁপি আধুনিকা, এঁড়োশোলায়থাকিলে কি হয়, বাংলার কোন্‌ পাড়াগাঁয়ে আধুনিকতার

ঢেউ যায় নাই?...বিশেষতঅতসী তার বন্ধু...অতসীর কাছে অনেক জিনিস সে শুনিয়াছে বা শিখিয়াছে যাহা তাহার বাবা (মা তো নয়ই) জানেও না।

টেঁপির মা বলিল—টকি কি গা?

হাজারি আধুনিক হইবার চেষ্টায় গম্ভীরভাবে বলিল—ছবিতে কথা কয়, এই!দেখেছি অনেকবার। দেখবো না আর কেন? হুঁ—

বলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে সবটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল—কিন্তু টেঁপিপরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিল—কি পালা দেখেছিলে বাবা?

—পালা! তা কি আর মনে আছে? লক্ষ্মণের শক্তিশেল বোধ হয়, হাঁ—লক্ষ্মণেরশক্তিশেল।

মনের মধ্যে বহু কষ্টে হাতড়াইয়া ছেলেবেলায় দেখা এক যাত্রার পালার নামটা হাজারি করিয়া দিল।

টেঁপি বলিল—লক্ষ্মণের শক্তিশেল আবার কি পালার নাম? ওরকম নাম তো টকিরপালার থাকে না? তাদের নাম আমি শুনেচি অতসীদির কাছে, সে তো অন্যরকম—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুই আর অতসীদি ভারি সব জানিস আর কি! যা—সর দিকি—ওইকয়লার ঝুড়িটা—

—ও মামাবাবু, খাওয়া-দাওয়া হল—বলিয়া বংশীর ভাগ্নে সেই সুন্দর ছেলেটিবাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই টেঁপির মা, পাড়াগেঁয়ে বউ, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। টেঁপি কিন্তু নবাগত লোকটির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—এসো বাবা এসো—ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হল বংশীরভাগ্নে। আমার হোটেলে খাতাপত্র রাখে। ছেলেমানুষ—ওকে দেখে আবার ঘোমটা—

বংশীর ভাগিনেয় আসিয়া টেঁপির মার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি মেয়েকে বলিল—তোর নরেন দাদাকে প্রণাম কর টেঁপি। এটি আমার মেয়ে, বাবা নরেন। ও বেশ লেখাপড়া জানে—সেলাইয়ের কাজটাজ ভাল শিখেছে আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ের কাছে।

টেঁপির হঠাৎ লজ্জা করিতে লাগিল। ছেলেটি দেখিতে যেমন, এমন চেহারার ছেলে সে কখনো দেখে নাই—কেবল ইহার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায় অতসীদিরবরের। অনেকটা মুখের আদল যেন সেই রকম।

বংশীর ভাগ্নেও তাহার স্বচ্ছন্দ হৃদ্যতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ তুলিয়াভাল করিয়া চাওয়া যেন একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। টেঁপির দিকে তো তেমনচাহিতেই পারিল না।

হাজারি বলিল—মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক'জন নামলো আজ?

—নেমেছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিনজনকে বেচু চক্কত্তির চাকর একরকম হাত ধরে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। বাকি সাতজন আমরা পেয়েছি—আর বনগাঁর ট্রেন থেকে এসেছিল পাঁচজন।

—ইস্টিশানে গিয়েছিল কে?

—ব্রজ ছিল, রাখালও ছিল বনগাঁর গাড়ীর সময়। ব্রজ বল্লে বেচু চক্কত্তির চাকরেরসঙ্গে খদ্দের নিয়ে তার হাতাহাতি হয়ে যেতো আজ।

—নানা, দরকার নেই বাবা ওসবে। হাজার হোক, আমার পুরোনো মনিব। ওদেরখেয়েই এতকাল মানুষ—হোটেলের কাজ শিখেছিও ওদের কাছে। শুধুরাঁধতে জানলেতো হোটেল চালানো যায় না বাবা, এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট-বাজার করতে হয়, কি করে খদ্দের তুষ্ট করতে হয়, কি করে হিসেবপত্র রাখতে হয়—এও তো জানতেহবে। আমি ছ'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম ওরা কি করে চালাচ্ছে।দেখে দেখে শেখা। এখন সব পারি।

বংশীর ভাগ্নে বলিল—আচ্ছা মামীমা, খাওয়া দাওয়া করুন, আমি আসবো এখনওবেলা।

হাজারি বলিল—তুমি কাল দুপুরে হোটেলে খেও না—বাসাতে খাবে এখানে।বুঝলে?

বংশীর ভাগ্নে চলিয়া গেলে টেঁপির অনুপস্থিতিতে হাজারি বলিল—কেমন ছেলেটিদেখলে?

—বেশ ভাল। চমৎকার দেখতে।

—ওর সঙ্গে টেঁপির বেশ মানায় না?

—চমৎকার মানায়। তা কি আর হবে। আমাদের অদৃষ্টে কি অমন ছেলে জুটবে?

—জুটবে না কেন, জুটে আছে। ওকে আনিয়ে রেখেচি হোটেলে তবে কি জন্যে? তোমাদের রাণাঘাটের বাসায় আনলাম তবে কি জন্যে?...টেঁপিকে যেন এখন কিছু — বোঝ তো? কাল ওকে একটু যত্ন-আত্তি করো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপির—তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থা বেশ ভাল, ছেলেটাওম্যাট্রিক পাস। বিয়ে দিয়ে হোটেলেই বসিয়ে দেবো—থাক্ আমার অংশীদার হয়ে। কাজশিখে নিক্—টেঁপিও কাছেই রইল আমাদের—বুঝলে না, অনেক মতলব আছে।

টেঁপির মা বোকাসোকা মানুষ—অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহারকথা শুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে খবর আসিল স্টেশনে বেচু চক্কত্তির হোটেলের লোকের সঙ্গে হাজারির চাকরের খরিদ্দার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে। হাজারির চাকর নাথনি বলিল—বাবু, ওদের হোটেলের চাকর খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি করে—আমাদের খদ্দের, আমাদের হোটেলে আসচে—তার হাত ধরে টানবে আর আমাদের হোটেলের নিন্দে করবে। তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গিয়েচে।

—খদ্দের কোথায় গেল?

—খদ্দের এচেচে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের ওপরআকচ আছে, আমরাই সব খদ্দের পাই, ওরা পায় না—এই নিয়েই ঝগড়া বাবু। ওদের হোটেলের হয়ে এল, বাবু। একটা গাড়ীতেও খদ্দের পায় না।

রাত আটটার সময়ে হাজারি সবে মাছের ঝোল উনুনে চাপাইয়াছে, এমন সময়বংশী বলিল—হাজারি-দা, জবর খবর আছে। তোমার আগের কর্তা তোমাকে ডেকেপাঠিয়েছেন কেন দেখে এসো গে। বোধ হয় মারামারি নিয়ে—

—ঝোলটা তুমি দেখো। আমি এসে মাংস চাপাবো—দেখি কি খবর!

অনেকদিন পরে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল।সেই পুরোনো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবারসঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাঁধুনী বামুন, বেচু চক্কত্তি আজও মনিব।

বেচু চক্কত্তি তাহাকে দেখিয়া খাতির করিবার সুরে, বলিলেন—আরে এসো এসোহাজারি এসো—এখানে বসো।

বলিয়া গদির এক পাশে হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিলেন, যদিও ঝাড়িবার কোন আবশ্যকছিল না।

হাজারি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল—না বাবু, আমি বসবো না। আমায় ডেকেচেনকেন?

—এসো, বসোই এসে আগে। বলচি।

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, আপনি আমার মনিব ছিলেন এতদিন।আপনার সামনে কি বসতে পারি? বলুন কি বলবেন—আমি ঠিক আছি।

হাজারির চোখ আপনা-আপনি খাওয়ার ঘরের দিকে গেল। হোটেলের অবস্থা সত্যই খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। রাত ন'টা বাজে, আগে আগে এসময় খরিদ্দারের ভিড়ে ঘরে জায়গা থাকিত না—আর এখন লোক কই? হোটেলের জলুসও আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—না, বোসো হাজারি। চা খাও, ওরে কাঙালী, চা নিয়ে আয়আমাদের।

হাজারি তবুও বসিতে চাহিল না। চাকর চা দিয়া গেল, হাজারি আড়ালে গিয়া চা খাইয়া আসিল।

বেচু চক্কত্তি দেখিয়া শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। হাজারির মাথা ঘুরিয়া যায় নাই হঠাৎঅবস্থাপন্ন হইয়া। কারণ, অবস্থাপন্ন যে হাজারি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি এতদিনহোটেল চালানোর অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিতে পারেন।

হাজারি বলিল—বাবু, আমায় কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ—বলছিলাম কি জানো, এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের তখন তোমারসঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই তো—তোমার চাকর আজ আমার চাকরকে মেরেচে ইস্টিশানে। এ কেমন কথা?

এই সময় পদ্মঝি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের চাকরও আসিল।

হাজারি বলিল—আমি তো শুনলাম বাবু আপনার চাকরটা আগে আমার চাকরকে মারে। নাথনি খদ্দের নিয়ে আসছিল এমন সময়—

পদ্মঝি বলিল—হ্যাঁ তাই বৈকি! তোমাদের নাথনি আমাদের খদ্দের ভাগাবার চেষ্টা করে—আমাদের হোটেলে আসছিল খদ্দের, তোমাদের হোটেলে যেতে চায়নি।

একথা বিশ্বাস করা যেন বেচু চক্কত্তির পক্ষেও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন— যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া করে কি হবে হাজারির সঙ্গে! হাজারি তো সেখানে ছিল না দেখেওনি, তবে তোমায় বল্লাম হাজারি, যাতে আর এমন না হয়—

হাজারি বলিল—বাবু, বেশ আমি রাজী আছি। আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ করলে চলবে না। আপনি আমার পুরোনো মনিব। আসুন আমরা গাড়ীভাগ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইস্টিশানে চাকর পাঠাবেন, আমার হোটেলেরচাকর সে সময় যাবে না।

বেচু চক্কত্তি বিস্মিত হইলেন। ব্যবসা জিনিসটাই রেষারেষির উপর, আড়াআড়িরউপর চলে—তিনি বেশ ভালই জানেন। মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন তিনি এইব্যবসা করিয়া। এস্থলে হাজারির প্রস্তাব যে কতদূর উদার, তাহা বুঝিতে বেচুর বিলম্বহইল না। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—না তা কেন, ইস্টিশান তো আমার একলার নয়—

—না বাবু, এখন থেকে তাই রইল। মুর্শিদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি কি নেবেন বলুন—মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? আমি সে সময় চাকর পাঠাবো নাইস্টিশনে।

পদ্মঝি দোর হইতে সরিয়া গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—তা তুমি যেমন বলো। মুর্শিদাবাদখানাই তবে রাখো আমার।তা আর একটু চা খেয়ে যাবে না? —আচ্ছা, এসো তবে।

হাজারি মনিবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

পদ্মঝি পুনরায় দোরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবু, কি বলে গেল?

—গাড়ি ভাগ করে নিয়ে গেল। মুর্শিদাবাদখানা আমি রেখেছি। যা কিছু লোক আসে, মুর্শিদাবাদ থেকেই আসে—বনগাঁর গাড়িতে ক'টা লোক আসে? লোকটা বোকা, লোক মন্দ নয়। দুষ্ট নয়।

—আমি আজ সাত বছর দেখে আসচি, আমি জানিনে? গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়েথাকে, হোটেলের ছাই দেখাশুনা করে। রেঁধেই মরে, মজা লুটচে বংশী আর বংশীর ভাগ্নে। ক্যাশ তার হাতে। আমি সব খবর নিইচি তলায় তলায়। বংশীকে আবার এখানে আনুন বাবু, ও হোটেল এক দিনে ভুস্যিনাশ হয়ে বসে রয়েচে। বংশীকে ভাঙাবার লোক লাগান আপনি—আর ওর ভাগ্নেটাকেও—

পরদিন দুপুরে বংশীর ভাগ্নে সসঙ্কোচে হাজারির বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেআসিল। হাজারি হোটেল হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল বটে, কিন্তু নিজে তখন আসিতেপারিল না, অত্যন্ত ভিড় লাগিয়াছে খরিদ্দারের, কারণ সেদিন হাটবার।

মায়ের আদেশে টেঁপিকে অতিথির সামনে অনেকবার বাহির হইতে হইল। কখনওবা আসন পাতা, কখনও জলের গ্লাসে জল দেওয়া ইত্যাদি। টেঁপি খুব চটপটে চালাকচতুর মেয়ে, অতসীর শিষ্যা— কিন্তু হঠাৎ তাহারও কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিলএই সুন্দর ছেলেটির সামনে বার বার বাহির হইতে।

বংশীর ভাগ্নেটিও একটু বিস্মিত হইল। হাজারি-মামারা পাড়াগাঁয়ের লোক সে জানে—অবস্থাও এতদিন বিশেষ ভাল ছিল না। আজই না হয় হোটেলের ব্যবসায়ে দু-পয়সার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু হাজারি-মামার মেয়ে তো বেশ দেখিতে, তাহার উপরতার চালচলন ধরন-ধারণ যেন স্কুলে পড়া আধুনিক মেয়েছেলের মত। সে কাপড়গুছাইয়া পরিতে জানে, সাজিতে গুজিতে জানে, তার কথাবার্তার ভঙ্গিটাও বড় চমৎকার।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় হাজারি আসিল। বলিল—খাওয়া হয়েছে বাবা, আমি আসতে পারলাম না—আজ আবার ভিড় বড্ড বেশি।—ও টেঁপি, আমায় একটু তেল দে মা, নেয়ে নিই, আর তোর ঐ দাদার শোওয়ার জায়গা করে দে দিকি—পাশের ঘরটাতে একটু গড়িয়ে নাও বাবা।

বংশীর ভাগ্নে গিয়া শুইয়াছে—এমন সময় টেঁপি পান দিতে আসিল। পানের ডিবানাই, একখানা ছোট রেকাবিতে পান আনিয়াছে। ছেলেটি দেখিল চুন নাই রেকাবিতে।লাজুক মুখে বলিল—একটু চুন দিয়ে যাবেন?

টেঁপির সারা দেহ লজ্জার আনন্দে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রথম কারণ তাহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই হইল প্রথম। জীবনে ইতিপূর্বে তাহাকে কেহ 'আপনি' 'আজ্ঞে' করিয়া কথা বলে নাই। দ্বিতীয়ত কোনও অনাত্মীয় তরুণ যুবকওতাহার সহিত ইতিপূর্বে কথা বলে নাই। বলে নাই কি একেবারে। গাঁয়ের রামু-দা, গোপাল-দা, জহর-দা—ইহারাও তাহার সঙ্গে তো কথা বলিত? কিন্তু তাহাতে এমনআনন্দ তাহার হয় নাই তো কোনোদিন? চুন আনিয়া রেকাবিতে রাখিয়া বলিল—এতেহবে?

—খুব হবে। থাক ওখানেই—ইয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন?

টেঁপির বেশ লাগিল ছেলেটিকে। কথাবার্তার ধরন যেমন ভালো, গলার সুরটিও তেমনি মিষ্ট। যখন জলের গ্লাস আনিল, তখন ইচ্ছা হইতেছিল ছেলেটি তাহার সঙ্গেআর একবার কিছু বলে। কিন্তু ছেলেটি এবার আর কিছু বলিল না। টেঁপি জলের গ্লাসনামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, বৈকাল অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে—টেঁপি তখন একবারউঁকি মারিয়া দেখিল, ছেলেটি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ টেঁপির কেমন একটা অহেতুক স্নেহ আসিল ছেলেটির প্রতি।

আহা, হোটেলে কত রাত পর্যন্ত জাগে! ভাল ঘুম হয় না রাত্রে!

টেঁপি আসিয়া মাকে বলিল—মা সেই লোকটা এখনও ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেবো, নাঘুমুবে?

টেঁপির মা বলিল—ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। ডাকবার দরকার কি? চাকরটা কোথায়গেল? ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। খাবার আনতে দিতাম। উনিওতো বাড়ি নেই।

টেঁপি বলিল—লোকটা চা খায় কিনা জানিনে, তাহলে ঘুম থেকে উঠলে একটু চাকরে দিতে পারলে ভাল হোত।

টেঁপির মা চা নিজে কখনো খায় নাই, করিতেও জানে না। আধুনিকা মেয়ের এপ্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না।

মেয়েকে বলিল—তুই করে দিতে পারবি তো?

মেয়ে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি যে কি বল মা, হেসে প্রাণ বেরিয়েযায়—পরে কেমন একটি অপূর্ব ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া হাসিভরা মুখের চিবুকখানি বার বার উঠাইয়া নামাইয়া বলিতে লাগিল—চা কই? চিনি কই? কেটলি কই? চায়ের জল ফুটবে কিসে? ডিশ্‌-পেয়ালা কই? সে সব আছে কিছু?

টেঁপির মায়ের বড় ভাল লাগিল টেঁপির এই ভঙ্গি। সে সস্নেহে মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়েরদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে এমন সুন্দর ভঙ্গিতে কথা টেঁপি আরকখনও বলে নাই।

এই সময় হাজারি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল, হোটেলেই ছিল। বলিল—নরেন কোথায়?ঘুমুচ্ছে নাকি?

টেঁপির মা বলিল—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওকে একটু খাবার আনিয়ে দিতে হবে। আর টেঁপি বলছে চা করে দিলে হোত।

হাজারির বড় স্নেহ হইল টেঁপির উপর। সে না জানিয়া যাহাকে আজ যত্ন করিয়াচা খাওয়াইতে চাহিতেছে, তাহারই সঙ্গে তাহার বাবা-মা যে বিবাহের ষড়যন্ত্র করিতেছে—বেচারী কি জানে?

বলিল—আমি সব এনে দিচ্ছি। হোটেলেই আছে। হোটেলে বড় ব্যস্ত আছি, কলকাতা থেকে দশ-বারো জন বাবু এসেছে শিকার করতে। ওরা অনেকদিন আগে একবার এসে আমার রান্না খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। সেই আগের হোটেলে গিয়েছিল, সেখানে নেই শুনে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। ওরা রাত্রে মাংস আর পোলাও খাবে।তোমরা এবেলা রান্না কোরো না—আমি হোটেল থেকে আলাদা করে পাঠিয়ে দেবোএখন। নরেনকে যে একবার দরকার, বাবুদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইতে হবে, সে তো আমি পারবো না, নরেনকে ওঠাই দাঁড়াও—

টেঁপির মা বলিল—ঘুম থেকে উঠিয়ে কিছু না খাইয়ে ছাড়া ভাল দেখায় না। টেঁপি চায়ের কথা বলছিল—তা হোলে সেগুলো আগে পাঠিয়ে দেওগে, এখন জাগিও না।

বৈকালের দিকে নরেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। অত্যন্ত বেলা গিয়াছে, পাঁচিলের ধারেসজনে গাছটার গায়ে রোদ হল্‌দে হইয়া আসিয়াছে। নরেনের লজ্জা হইল—পরেরবাড়ি কি ঘুমটাই ঘুমাইয়াছে। কে কি—বিশেষ করিয়া হাজারি-মামার মেয়েটি কি মনেকরিল! বেশ মেয়েটি। হাজারি-মামার মেয়ে যে এমন চালাক-চতুর, চটপটে, এমনদেখিতে, এমন কাপড়-চোপড় পরিতে জানে তাহা কে ভাবিয়াছিল?

অপ্রতিভ মুখে সে গায়ে জামা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—আপনি উঠেছেন? মুখ ধোবার জল দেবো?

নরেন থতমত খাইয়া বলিল—না, না, থাক্‌ আমি হোটেলেই—

—মা বললে আপনি চা খেয়ে যাবেন, আমি মাকে বলে আসি—

ইতিমধ্যে হাজারি চায়ের আসবাব হোটেলের চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, টেঁপি নিজেই চা করিতে বসিয়া গেল। তাহার মা জলখাবারের জন্য ফল কাটিতে লাগিল।

টেঁপি বলিল—মা, চায়ের সঙ্গে শসা-টসা দেয় না। তুমি বরং ঐ নিমকি আর রসগোল্লা দাও রেকাবিতে—

—শসা দেয় না? একটা ডাব কাটবো? বাড়ির ডাব আছে—

টেঁপি হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি! মুখে আঁচল চাপা দিয়া বলিল— হি হি, তুমি মা যে কি! ...চায়ের সঙ্গে বুঝি ডাব খায়?

টেঁপির মা অপ্রসন্ন মুখে বলিল—কি জানি তোদের একেলে ঢং কিছু বুঝিনে বাপু!যা বোঝো তাই করো। ঘুম থেকে উঠলে তো নতুন জামাইদের ডাব দিতে দেখেছিচিরকাল দেশেঘরে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই টেঁপির মা মনে মনে জিভ কাটিয়া চুপ করিয়া গেল।মানুষটা একটু বোকা ধরনের, কি ভাবিয়া কি বলে, সব সময় তলাইয়া দেখিতে জানে না।

টেঁপি আশ্চর্য হইয়া বলিল—নতুন জামাই? কে নতুন জামাই?

—ও কিছু না; দেশে দেখেছি তাই বলছি। তুই নে, চা করা হোল?

টেঁপির মনে কেমন যেন খটকা লাগিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, তাহার উপর নিতান্তছেলেমানুষটিও নয়, যখন চা ও খাবার লইয়া পুনরায় ছেলেটির সামনে গেল তখনতাহার কি জানি কেন যে লজ্জা করিতেছে তাহা সে নিজেই ভাল ধরিতে পারিল না।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও কি! এই এত খাবার কেন এখন, চা একটুহলেই—

টেঁপি কোনো রকমে খাবারের রেকাবি লোকটার সামনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলেযেন বাঁচে।

ছেলেটি ডাকিয়া বলিল—পান একটা যদি দিয়ে যান—

পান সাজিতে বসিয়া টেঁপি ভাবিল—বাবা খাটিয়ে মারলে আমায়। চা দেও—পান সাজো—আমার যেন যত গরজ পড়েছে, বাবার হোটেলের লোক তা আমার কি?

টেঁপি একটা চায়ের পিরিচে পান রাখিয়া দিতে গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ কিন্তু।কথাবার্তা বেশ, হাসি-হাসি মুখ। কি কাজ করে হোটেলে কে জানে?

পান লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—মামীমা আমিযাচ্ছি, কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না। এত ঘুমিয়েছি, বেলা আর নেইআজ।

বেশ ছেলেটি।

নতুন জামাই? কে নতুন জামাই? কাহাদের নতুন জামাই?

মা এক-একটা কথা বলে কি যে, তাহার মানে হয় না।

টেঁপির মা কখনও এত বড় শহর দেখে নাই।

এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ইস্টিশানে বিদ্যুতের আলো, লোকজনই বা কত। আর তাদের এঁড়োশোলায় দিনমানেই শেয়াল ডাকে বাড়ির পিছনকার ঘন বাঁশবনে। সেদিন তো দিনদুপুরে জেলেপাড়ার কেষ্ট জেলের তিন মাসের ছেলেকে শেয়ালে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুসুম আসিয়া একদিন উহাদের বেড়াইতে লইয়া গেল। কুসুমের সঙ্গেতাহারা রাধাবল্লভতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চূর্ণীর ঘাট, পালচৌধুরীদের বাড়ি—সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। পালচৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ি দেখিয়া টেঁপির মা ও টেঁপি দুজনেই অবাক। এত বড় বাড়ি জীবনে তাহারা দেখে নাই। অতসীদের বাড়ীটাই এতদিন বড়লোকের বাড়ির চরম নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে তাহারা, তাহাদের পক্ষেঅবাক হইবার কথা বটে।

টেঁপির মা বলিল—না, শহর জায়গা বটে কুসুম। গায়ে গায়ে বাড়ি আর সবকোঠাবাড়ি এদেশে। সবাই বড়লোক। ছেলেমেয়েদের কি চেহারা, দেখে চোখ জুড়োয়।হ্যাঁরে, এদের বাড়ি ঠাকুর হয় না? পুজোর সময় একদিন আমাদের এনো মা, ঠাকুরদেখে যাবো।

সে আর ইহার বেশি কিছুই বোঝে না।

একটা বাড়ির সামনে কত কি বড় বড় ছবি টাঙানো, লোকজন ঢুকিতেছে, রাস্তারধারে কি কাগজ বিলি করিতেছে। টেঁপির মনে হইল এই বোধ হয় সেই টকি যাকেবলে, তাহাই। কুসুমকে —কুসুম-দি, এই টকি না?

—হ্যাঁ দিদি। একদিন দেখবে?

—একদিন এনো না আমাদের। মা-ও কখনো দেখেনি—সবাই আসবো।

একখানা ধাবমান মোটর গাড়ির দিকে টেঁপির মা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যতক্ষণ সেখানা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইয়া গেল।

কুসুম বলিল—আমার বাড়ি একটু পায়ের ধুলো দিন এবার জ্যাঠাইমা—

কুসুমের বাড়ি যাইতে পথের ধারে রেলের লাইন পড়ে। টেঁপির মা বলিল—কুসুম, দাঁড়া মা একখানা রেলের গাড়ি দেখে যাই—

বলিতে বলিতে একখানা প্রকাণ্ড মালগাড়ি আসিয়া হাজির। টেঁপি ও টেঁপির মাদুজনেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ি চলিয়াছে তো চলিয়াছে—তাহার আর শেষনাই। উঃ, কি বড় গাড়িটা।

কুসুম বলিল—জ্যাঠাইমা, রাণাঘাট ভাল লাগচে?

—লাগছে বৈকি, বেশ জায়গা মা।।

আসলে কিন্তু এঁড়োশোলার জন্য টেঁপির মায়ের মন কেমন করে। শহরে নিজেকেসে এখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। সেখানকার তালপুকুরের ঘাট, সদা বোষ্টমেরবাড়ির পাশ দিয়া যে ছোট নিভৃত পথটি বাঁশবনের মধ্য দিয়া বাঁড়ুয্যে-পাড়ার দিকেগিয়াছে, দুপুর বেলা তাহাদের বাড়ির কাছের বড় শিরীষ গাছটায় এই সময় শিরীষের সুঁটি শুকাইয়া ঝুন ঝুন শব্দ করে, তাহাদের উঠানের বড় লাউমাচায় এতদিন কত লাউ ফলিয়াছে, পেঁপে গাছটায় কত পেঁপের ফুল ও জালি দেখিয়া আসিয়াছিল—সে সবের জন্য মন কেমন করে বৈকি।

তবে এখানে যাহা সে পাইয়াছে, টেঁপির মা জীবনে সে রকম সুখের মুখ দেখে নাই।চাকরের ওপর হুকুম চালাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সকলে মানে, খাতির করে—অমন সুন্দর ছেলেটি তাহাদের হোটেলের মুহুরী—এ ধরনের ব্যাপারের কল্পনাও কখনওসে করিয়াছিল?

কুসুমের বাড়ি সকলে গিয়া পৌঁছিল। কুসুম ভারি খুশি হইয়া উঠিয়াছে—তাহারবাপের বাড়ির দেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারকে এখানে পাইয়া। কুসুমের শাশুড়ি আসিয়া টেঁপির মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আমাদের বড্ড ভাগ্যি মা, আপনাদের চরণ-ধুলো পড়লো এ বাড়িতে।

টেঁপির মাকে এত খাতির করিয়া কেহ কখনো কথা বলে নাই—এত সুখও তাহারকপালে লেখা ছিল! হায় মা ঝিটকিপোতার বনবিবি, কি জাগ্রত দেবতাই তুমি। সেবারঝিটকিপোতায় চৈত্র মাসে মেলায় গিয়া টেঁপির মা বনবিবিতলায় স-পাঁচ আনার সিন্নি দিয়া স্বামীপুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়াছিল, এখনও যে বছর পার হয় নাই! তবুওলোকে ঠাকুর-দেবতা মানিতে চায় না।

কুসুম সকলকে জলযোগ করাইল। পান সাজিয়া দিল। কুসুমের শাশুড়ি আসিয়াকতক্ষণ গল্পগুজব করিল। কুসুম গ্রামের কথাই কেবল শুনিতে চায়। কতদিন বাপেরবাড়ি যায় নাই, বাবা-মা মরিয়া গিয়াছে, জ্যাঠামশায় আছে, কাকারা আছে—তাহারাকোন দিন খোঁজও নেয় না। খোঁজ করিত অবশ্যই, যদি তাহার নিজের অবস্থা ভাল হইত। গরিব লোকের আদর কে করে?...এই সব অনেক দুঃখ করিল। আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে কুসুম উহাদের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

হাজারির হোটেলে রাত্রে এক মজার ব্যাপার ঘটিল সেদিন।

দশ-পনেরোটি লোক একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে—হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, এই যে ভাতটা দিলে, এ দেখছি ও-বেলার বাসি ভাত!

বংশী ঠাকুর ভাত দিতেছিল, সে অবাক হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু সে কি? আমাদের হোটেলে ওরকম পাবেন না। আধ মণ চাল এক-একবেলা রান্না হয়, তাতেই কুলোয় না—বাসি ভাত থাকবে কোথা থেকে?

—আলবাৎ এ ও-বেলার ভাত—। আমি বলছি এ
ও-বেলার ভাত।

গোলমাল শুনিয়া হাজারি আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?...বাসি ভাত? কক্ষনোনা; আপনি নতুন লোক, কিন্তু এঁরা যাঁরা খাচ্ছেন তারা আমায় জানেন—আমার হোটেল না চলে না চলুক কিন্তু ওসব পিরবিত্তি ভগবান যেন আমায় না দেন—

লোকটা তখন তর্কের মোড় ঘুরাইয়া ফেলিল। সে যেন ঝগড়া করিবার জন্যই তৈরী হইয়া আসিয়াছে। পাত হইতে হাত তুলিয়া চোখ গরম করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—তবে তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?

হাজারি নরম হইয়া বলিল—না বাবু, তা তো আমি বলছি নে। কিন্তু আপনারভুলও তো হতে পারে। আমি দিব্যি করে বলছি বাবু, বাসি ভাত আমারহোটেলে থাকে না

—থাকে না? বড্ড নবাবী কথা বলছ যে! বাসি ভাত আবার এ-বেলা হাঁড়িতে ফেলে দাও না তুমি?

—না বাবু।

—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আবার তবুও না বলছ? দেখবে মজা?

এই সময়ে নরেন ও হোটেলের আরও দু-একজন সেখানে আসিয়া পড়িল। নরেনগরম হইয়া বলিল—কি মজা দেখাবেন আপনি?

—দেখবে? সরে এসো দেখাচ্ছি জোচ্চোর সব কোথাকার—

এই কথায় একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। পুরানো খরিদ্দাররা সকলেইহাজারির পক্ষ অবলম্বন করিল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রাস্তার সমবেত জনতার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—শুনুন মশাই সব বলি। এইএর হোটেলে ভাত দিয়েছিল খেতে—ধরে ফেলেছি কিনা তাই এখন আবার আমাকেমারতে আসছে—পুলিস ডাকবো এখুনি—স্যানিটারি দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট করিয়েতবে ছাড়বো—জোচ্চোর কোথাকার— লোক মারবার মতলব তোমাদের?

এই সময় হোটেলের চাকর শশী হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—বাবু, এই লোকটাকেযেন আমি বেচু চক্কত্তির হোটেলে দেখেছি। সেখানে যে ঝি থাকে, তার সঙ্গে বাজারকরে নিয়ে যেতে দেখেছি—

নরেনের সাহস খুব। সে হোটেলের রোয়াকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসাকরিল—মশাই, আপনি বেচু চক্কত্তির হোটেলের পদ্ম ঝিয়ের কে হন?

তবুও লোকটা ছাড়ে না। সে হাত-পা নাড়িয়া প্রমাণ করিতে গেল পদ্ম ঝিয়েরনামও সে কোনোদিন শোনে নাই। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের তেজ যেন তখন কমিয়া গিয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল—এইবার মানে মানে সরে পড় বাবা, কেন মার খেয়েমরবে!

কিছুক্ষণ পরে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

এই ঘটনার পরে অনেক রাত্রে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলে গিয়ে হাজির হইল।বেচু চক্কত্তি তহবিল মিলাইতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি, হাজারি যে? এসো এসো। এত রাত্রে কি মনে করে?

হাজারি বিনীতভাবে বলিল—বাবু, একটা কথা বলতে এলাম।

—কি বল?

—বাবু আপনি আমার অন্নদাতা ছিলেন একসময়ে—আজও আপনাকে তাই বলেইভাবি। আপনার এখানে কাজ না শিখলে আজ আমি পেটের ভাত করে খেতে পারতাম না—আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা আছে বলে আমি তো ভাবিনে।

—কেন, কেন, একথা কেন?

হাজারি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আপনিব্রাহ্মণ, আমার মনিব। আমাকে এভাবে বিপদে না ফেলে যদি বলেন হাজারি তুমিহোটেল উঠিয়ে দাও, তাই আমি দেবো। আপনি হুকুম করুন—

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলিল—আমি তো এর কোনো খবর রাখিনে—আচ্ছা, তুমি যাও আজ, আমি তদন্ত করে দেখে তোমায় কাল জানাবো।আমাদের কোন লোক তোমার হোটেলে যায়নি এ একেবারে নিশ্চয়। কাল জানতেপারবে তুমি।...তারপর হাজারি চলচে-টলচে ভাল?

—একরকম আপনার আশীর্বাদে—

—রোজ কি রকম বিক্রিসিক্রি হচ্ছে? রোজ তবিলে কি রকম থাকে? তুমি কিছুমনে কোরো না, তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলেই জিজ্ঞেস করচি।

—এই বাবু, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা—ধরুন না কেন আজ রাত্তিরের তবিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা স'বারো আনা।

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য হইলেন মনে মনে। মুখে বলিলেন—বেশ, বেশ। খুব ভালো—শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, তাহলে এসো আজগে। কাল খবর পাবে।

হাজারি চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্ম ঝিকে ডাকাইলেন। পদ্ম আসিয়া বলিল—হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি? কি বলছিল?

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ও পদ্ম, হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল। রাণাঘাটের বাজারে হোটেল করে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার দাঁড়া-তবিল, এ তোকখনো শুনিনি। তার মানে বুঝচো? দাঁড়া-তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাতআট টাকা দৈনিক লাভ, ফেলে-ঝেলেও। মাসে আড়াইশো টাকা। দুশো টাকার তো মারনেই—হ্যাঁ পদ্ম?

পদ্ম ঝি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—গুল্ দিয়ে গেল না তো?

—না, গুল্ দেবার লোক নয় ও—সাদাসিধে মানুষটা। আমায় বড় মানে এখনও। ও গুল দেবে না, অন্তত আমার কাছে। তা ছাড়া দেখছ না রেল বাজারে কোন হোটেলেআর বিক্রি নেই। সব শুষে নিচ্ছে ও-ই একলা।

—আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবু ওর হোটেলে। খুব খানিকটা রাউ করে দিয়েওএসেছে নাকি। খুব চেঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে। আর কিছু হোক না হোকলোকে শুনে তো রাখলে?

—যদু বাঁড়ুয্যেরাও আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল, ওর হোটেল ভাঙতেই হবে। নইলে রেল বাজারে কেউ আর টিকবে না। এই কথা যদু বাঁড়ুয্যেও বললে। কিন্তু তাতে কিছুহবে না—ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো। নৃসিংহ আছে?

—না, বেরিয়ে গেল। পুলিসে সেই যে খবর দেবার কি হল?

—দেখ পদ্ম, আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই। হাজারি লোকটাভালো —আজ এসেছিল, এমন হাত জোড় করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর ওপর রাগ থাকে না।

—খ্যাংরা মারি ওর ভালমান্‌ষেতার মুখে—ভিজে বেড়ালটি, মাছ খেতে কিন্তু ঠিকআছে—পুলিসের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদুবাবু, তাই তুমি করো এবার। ওরহোটেল না ভাঙলে চলবে না। নয়তো আমাদের পাততাড়ি গুটুতে হবে এই আমি বলে দিলাম—এবেলা তবিল কত?

বেচু চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—মোট ছ'টাকা সাড়ে তিন আনা—

পদ্মঝি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকি ওদিকে। কাল বলেছে অন্তত একমাসের ভাড়া না দিলে হৈ চৈ বাধাবে। ভাড়া দেবে কোত্থেকে?

—দেখি।

—তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকি পাঁচ মাস। সে বলছে আর কাজ করবেনা, তার কি করি?

—বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা। দেখি সামনের মাসে কি রকম হয়—

পদ্মঝি রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল—আমার ভাতটা বেড়ে দাও ঠাকুর, রাত হয়েছে অনেক, বাড়ি যাই।

তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ছন্নছাড়া অবস্থা, ওই বড় দশ সেরী ডেক্‌চিটাআজ তিন-চার মাস তোলা আছে—দরকার হয় না। আগে পিতলের বালতি করিয়া সরিষার তৈল আসিত, এখন আসে ছোট ভাঁড়ে—বালতি দরকার হয় না। এমন দুরবস্থাসে কখনো দেখে নাই হোটেলের।

তাহার মনটা কেমন করিয়া ওঠে।..

নানারকম চেষ্টা করিয়া এই হোটেলটা সে আর কর্তা দুজনে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই হোটেলের দৌলতে যথেষ্ট একদিন হইয়াছে। ফুলে-নব্‌লা গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল, সেখানে তার ভাই এখনও আছে—চাষবাস করিয়া খায়—আর সে এইরাণাঘাটের শহরে সোনাদানাও পরিয়া বেড়াইয়াছে একদিন—এই হোটেলের দৌলতে। এই হোটেল তার বুকের পাঁজর। কিন্তু আজ বড় মুশকিলের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কোথা হইতে এক উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আসিয়া জুটিল হোটেলে—হোটেলেরসুলুকসন্ধান জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শিলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছে। এত যত্নের এত সাধ-আশার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে! যাহার জন্য আজ হোটেলে এই দুরবস্থা—ইচ্ছা হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে, যদি বাগে পায়। তাহার উপর আবার দয়া কিসের? কর্তা ওই রকম ভালমানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই তো আজ পথের কুকুর সব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ...দয়া!

একদিন রাণাঘাটের স্টেশনমাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাজারি নিজে যাইতে রাজী নয়—কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব, সে জানে। নরেন যাওয়াই ভাল। অবশেষে তাহাকেই যাইতে হইল। নরেন সঙ্গে গেল।

সাহেব বলিলেন—টোমার নাম হাজারি? হিন্ডু হোটেল রাখো বাজারে?

—হ্যাঁ হুজুর।

—টুমি প্ল্যাটফর্মে কেটার করবে? হিন্ডু ভাত, ডাল, মাছ, দহি?

হাজারি নরেনের মুখের দিকে চাহিল। সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না।নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুঝাইল। রেলযাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হিন্দু ভাতেরহোটেল খুলিতে চায়। সাহেব হাজারির নামডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে।আপাতত দেড়শো টাকা জমা দিলে উহারা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচেহোটেলের ঘর বানাইয়া দিবে।

হাজারি সাহেবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজী আছে।

স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেন্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলি পুরাইয়া হাজারির নামসই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোরকমপিটিশন চলিল। নৈহাটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালা টেন্ডার দিল এবং ওপরওয়ালা কর্মচারীদের নিকট তদ্বির-তাগাদাওশুরুকরিল।

নিজ-রাণাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না—শেষের দিকে, অর্থাৎ যখন টেন্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকি, যদু বাঁড়ুয্যে কথাটা শুনিল।স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটেলে খায়, সেই কি করিয়া জানিতে পারিয়া যদুকেবলিল—একটু চেষ্টা করুন না। আপনি টেন্ডার দিন। হয়ে যেতে পারে।

যদু চুপি চুপি টেন্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেন্ডারের জন্য জমা দিয়া আসিল।

সেদিন বেচু চক্কত্তি সবে হোটেলের গদিতে আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় পদ্ম ঝি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল—শুনেছ গা? শুনে এলাম একটা কথা—

—কি?

—ইস্টিশানে ভাতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি, দরখাস্ত দাও না কর্তা।

—ইস্টিশনে? ছোঃ, ওতে খদ্দের হবে না। দূরের যাত্রীদের মধ্যে কে ভাত খাবে? সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে—

—তোমার এই সব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা-উজীর মারা। সবাই দূরের যাত্রী থাকে না—যারা গাড়ি বদলে খুলনে লাইনে যাবে তারা খাবে, দুপুরে যে সব গাড়িকলকাতায় যায়—তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই খেয়ে যাবে। শুনলাম বাঁড়ুয্যেমশায় নাকি দরখাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে—

বেচু চক্কত্তির চমক ভাঙিল। যদু বাঁড়ুয্যে যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে, তবে এ দুধে সরআছে, কারণ যদু বাঁড়ুয্যে ঘুঘু হোটেলওয়ালা। পয়সা আছে না বুঝিয়া সে টেন্ডারের পাঁচটাকা জমা দিত না। বেচু বলিল—যাই একবার, দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে—

পদ্ম ঝি বলিল—কেরানী বাবুদের কিছু খাইয়ে এস—নইলে কাজ হবে না। আমাদেরহোটেলে সেই যে শশধরবাবু খেতো, তার শালা ইস্টিশানের মালবাবু, তার কাছে সুলুকসন্ধান নিও। না করলে চলবে কি করে? এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

—কেন ওবেলা খদ্দের তো মন্দ ছিল না?

পদ্ম ঝি হতাশার সুরে বলিল—ওকে ভাল বলে না কর্তা। সতেরো জন থাড় কেলাসে আর ন'জন বাঁধা খদ্দেরে টাকা দিচ্ছে তবে, হোটেল চলছে—নইলে বাজারহোত না। মুদি ধার দেওয়া বন্ধ করবে বলে শাসিয়েছে, তারই বা দোষ কি—একশোটাকার ওপর বাকি।

বেচু বলিল—টেন্ডারের দরখাস্ত দিতে গেলে এখুনি পাঁচটা টাকা চাই, তবিলে আছেদেখছি এক টাকা সাড়ে তের আনা মোট, ওবেলার দরুন। তার মধ্যে কয়লার দাম দেবোবলা আছে ওবেলা, কয়লাওয়ালা এল বলে। টাকা কোথায়?

পদ্ম ঝি একটু ভাবিয়া বলিল—ও-থেকে একটা টাকা নাও এখন। আর আমি চারটাকা যোগাড় করে এনে দিচ্ছি। আমার লবঙ্গফুল থাকে এপাড়ায়, তার কাছ থেকে। কয়লাওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—

—বুঝিয়ে রাখবে কি, সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে। তুমি পাঁচটাকাই এনে দ্যাও—

সন্ধ্যার পূর্বে বেচুও গিয়া টেন্ডার দিয়া আসিল। পদ্ম ঝি সাগ্রহে গদির ঘরের দ্বারেঅপেক্ষা করিতেছিল, এখনও খরিদ্দার আসা শুরু হয় নাই। বলিল—হয়ে গেল কর্তা? কি শুনে এলে?

—হয়ে যাবে এখন? ছেলের হাতের পিঠে বুঝি? তবে খুব লাভের কাণ্ড যা শুনে এলাম। যদু পাকা লোক—নইলে কি দরখাস্ত দেয়? আমি আগে বুঝতে পারি নি। মোটা লাভের ব্যবসা। ইস্টিশানের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতো মনে আছে? সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে। সে-ই বল্লে—যাত্রীরা রেলের বড় আপিসে

দরখাস্ত করেছে, আমাদের খাওয়ার কষ্ট। তা ছাড়া রেল কোম্পানী এলেটিক আলো দেবে, পাখা দেবে, ঘর করে দেবে—তার দরুন কিছু নেবে না আপাতোক। রেলের বোর্ড না কি আছে, তাদের অর্ডার। যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে। যথেষ্ট লোক খাবেপদ্ম, মোটা পয়সার কাণ্ড যা বুঝে এলাম।

পদ্ম ঝি বলিল—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবো সিদ্ধেশ্বরীতলায়। হয়ে যেনযায়—তুমি কাল আর একবার গিয়ে ওদিগের কিছু খাইয়ে এসো—

—বলি যদু বাঁড়ুয্যে টের পেলে কি করে হ্যাঁ?

—ওসবঘুঘুলোক। ওদের কথা ছাড়ান দ্যাও।

ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেলরেলের তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈয়ারী করিতেছে—আসবাবপত্র, আলমারি, টেবিল, চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে, সে-সব কোম্পানী দিবে।

এই সময় একদিন যদু বাঁড়ুয্যেকে হঠাৎ তাহাদের গদিঘরে আসিতে দেখিয়া বেচুও পদ্ম ঝি উভয়েই আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তব্যক্তি—কুলীন ব্রাহ্মণ, মাটিঘরার বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে-বংশের ছেলে। কখনও সে কারো দোকানে বা হোটেলে গিয়া হাউহাউ করিয়া বকে না—গম্ভীর মেজাজের মানুষটি।

বেচু চক্কত্তি যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

যদু বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—তারপর এসেছিএকটা কাজে, চক্কত্তি মশায়। হোটেল চলছে কেমন?

বেচু বলিল—আর তেমন নেই, বাঁড়ুয্যে মশায়। ভাবছি, তুলে দিয়ে আর কোথাওযাই। খদ্দেরপত্তর নেই আর—

—আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি। ইস্টিশানে হোটেল হচ্ছে জানেননিশ্চয়ই। আমি একটা টেন্ডার দিই। শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন?

— হ্যাঁ—তা—আমিও—

—বেশ। বলি, শুনুন। নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদ্বির করছে ওপরে—তারই হয়ে যাবে। মোটা পয়সার কারবার হবে ওই হোটেলটা। আসাম মেল, শান্তিপুর, বনগাঁ, ডাউন চাটগাঁ মেল—এসব প্যাসেঞ্জার খাবে—তা ছাড়া থাউকো লোক খাবে।ভাল পয়সা হবে এতে। আসুন আপনি আর আমি দুজনে মিলে দরখাস্ত দিই যে রাণাঘাটের আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালা,আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবেহোটেল। স্থানীয় হোটেলওয়ালারা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করে;s এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের খুব।

বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়াই আজ যদু বাঁড়ুয্যেতাহার গদিতে ছুটিয়া আসিয়াছে—নতুবা ঘুঘু যদু কখনও লাভের ভাগাভাগিতে রাজীহইবার পাত্র নয়। বলিল—বেশ দরখাস্ত লিখিয়া আনুন—আমি সই করে দেবো এখন।

যদু বাঁড়ুয্যে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—আরে, সে কি বাকি আছে, সে অশ্বিনী উকিলকে দিয়ে মুসোবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করেএনেছি। আপনি এখানটায় সই করুন—

যদু বাঁড়ুয্যে সই লইয়া চলিয়া গেলে পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—কি গা কর্তা?

বেচু হাসিয়া বলিল—কারে না পড়লে কি ঘুঘু যদু বাঁড়ুয্যে এখানে আসে কখনো?সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল। শুনবে?

পদ্ম সব-শুনিয়া বলিল—তাও ভালো। বেশি যদি বিক্রি হয়, ভাগাভাগিও ভাল। এখানে তোমার চলবেই না, যেরকম দাঁড়াচ্চে তার আর কি। হোক, ইস্টিশানে আধাবখরাই হোক্।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে একদিন যদু বাঁড়ুয্যে বেচুর গদিঘরে ঢুকিয়া যে ভাবে ধপ্করিয়া হতাশ ভাবে তক্তপোশের এক কোণে বসিয়া পড়িল, তাহাতে পদ্ম ঝি (সেখানেইছিল) বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্তী সংবাদের জন্য পদ্ম ঝি প্রস্তুত ছিল না।

যদু বলিল—শুনেছেন, চক্কত্তি মশাই? কাণ্ডটা শোনেননি?

বেচু চক্কত্তি ওভাবে যদু বাঁড়ুয্যেকে বসিতে দেখিয়া পূর্বেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শুভ নয়। তবুও সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি! কি ব্যাপার?

—ইস্টিশানের থেকে আসচি এই মাত্তর, আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেন্ডারমঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে—

বেচু একথার উত্তরে কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখে যদু বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়ারহিল।

—কার হয়ে গেল জানেন?

না—সেই ভাটিয়া ব্যাটার বুঝি—

—তা হলেও তো ছিল ভাল। হল হাজারির, তোমাদের হাজারির—

বেচু ও পদ্মঝি দু'জনেই বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায়। বেচু চক্কত্তিবলিল— দেখে এলেন?

—নিজের চোখে। ছাপা অক্ষরে। নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে—

পদ্ম ঝি হতবাক হইয়া যদু বাঁড়ুয্যের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল কথাটা যেনসে এখনও বিশ্বাস করে নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তা হলে ওরই হল!

এ কথার কোন অর্থ নাই, যদুও বুঝিল, পদ্ম ঝিও বুঝিল। ইহা শুধু বেচুর মনেরগভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—ওঃ, লোকটার বরাত খুবই ভাল যাচ্ছে দেখছি। ধুলো মুঠোধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আজ একুশ বছর এই রেল বাজারে হোটেল চালাচ্চি, আমরাগেলাম ভেসে, আর ও হাতাবেড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাত, তার কিনা—সবই বরাত।

বেচু বলিল—কেন হল, কিছু শুনলেন নাকি? টাকা ঘুষঘাষ দিয়েছিল নিশ্চয়ই—

—টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। হেড অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে—এখানকার ইস্টিশান মাস্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছিল। কোন কোন প্যাসেঞ্জার ওর নাম লিখেছে হেড্অফিসে, খুব ভাল রান্না করে নাকি, এই সব।

আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্ম ঝি বলিল—বলি এ কি হল, হ্যাঁকর্তা?

—তাই তো!

—মড়ুই পোড়া বামুনটা বড় বাড় বাড়িয়েচে, আর তো সহ্যি হয় না।

—কি আর করবে বল। আমি ভাবছি—

—কি?

—কাল একবার হাজারির হোটেলে আমি যাই—

—কেন,কি দুঃখে?

—ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও, রেলের হোটেলের অংশ কিছুআমায় দাও—

পদ্ম ঝি ভাবিয়া বলিল—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চায়?

—আমাকে খুব মানে কিনা তাই বলছি। এ না করলে আর উপায় নেই পদ্ম।হোটেল আর চালাতে পারবো না। একরাশ দেনা—খরচে আয়ে আর কুলোয় না। আমায় করতেই হবে।

পদ্ম ঝিয়ের মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। বলিল—যা ভাল বোঝো করো কর্তা। আমি কি বলব বল!

কিছুক্ষণ পরে যদু বাঁড়ুয্যে পুনরায় বেচুর হোটেলে আসিয়া বসিল। বেচু চক্কত্তিখাতির করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে যদু বলিল—একটা মতলব মনে এসেছে চক্কত্তি মশায় তাই আবার এলাম।

বেচু সকৌতূহলে বলিল—কি বলুন তো?

—আমি পালচৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম। ওঁরা জমিদার, ওঁদেরখাতির করে রেল কোম্পানী। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন, আপনি আর আমিকলকাতা রেল আপিসে একবার আপীল করি গিয়ে।

পদ্ম ঝি দোরের কাছেই ছিল, সে বলিল—তাই যান গিয়ে কর্তা, আমিও বলি যাতেকক্ষনো ও মড়ুই পোড়া বামুন হোটেল না পায় তা করাই চাই, দু'জনে তাই যান—

বেচু চক্কত্তি ভাবিয়া বলিল—কখন যেতে চান কাল?

যদু বলিল—সকাল সকাল যাওয়াই ভাল। বড় বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে—পালচৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায়ই। গরফেতে বাড়ি, বড় ভাল লোক।মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি।

যদু চলিয়া গেলে বেচুচক্কত্তি পদ্মকে বলিল—কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমারওভাবে যাওয়া হয় না। ও সব টের পাবেই যে আমরা আপীল করেছি, ওকেও নোটিশদেবে কোম্পানী। আপীলের শুনানি হবে। তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায়?

—না হয় না গেলে। ওর দরকার নেই, যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই কর।

—বেশ, যা বল।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বেচু চক্কত্তি কয়লাঘাটে রেলের বড় আপিসে যাইবেবলিয়া বাহির হইল এবং সন্ধ্যার পরে পুনরায় রাণাঘাটে ফিরিল। বেচু যখন নিজেরহোটেলে ঢুকিল, তখন খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। পদ্ম ঝি ব্যস্তভাবে বলিল—কি হল কর্তা?

বেচু বলিল—আর কি, মিথ্যে যাতায়াত সার হল, দুটো টাকা বেরিয়ে গেল। তারাবল্লে—এ আমাদের হাতে নেই, টেন্ডার মঞ্জুর হয়ে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে। এখনআর আপীল খাটবে না।

—তবে যাও কাল হাজারির কাছেই যাও—

—তার দরকার নেই। বাঁড়ুয্যে মশায় আসবার সময় বল্লেন—ওঁর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সামনের মাসে ওঁর ঘরেই—এ কিন্তু খুব ভাল কথা। ও ছোটলোকটার কাছে না গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভাল।

পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে রাণাঘাট রেল বাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাঘটিয়া গেল।

স্টেশনের আপ্ প্ল্যাটফর্মে নূতন হিন্দু-হোটেল খোলা হইল। শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক আলো, পাখা দিয়া সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নঅতি চমৎকার হোটেলটি। হোটলের মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া অনেকেআশ্চর্য হইয়া গেল।

আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা, বেচু চক্কত্তির পুরানো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমনএকটা গুজব রেল বাজারের সর্বত্র রটিল।

সেদিন বিকালের দিকে হাজারি তাহার পুরানো অভ্যাসমত চূর্ণীর ধার হইতেবেড়াইয়া ফিরিতেছে, এমন সময় পদ্ম ঝিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

হাজারিই পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—ও পদ্মদিদি, কোথায় যাচ্ছ?

পদ্মঝি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ছোট্ট পাথরের বাটি। সম্ভবত কাছেই কোথাওপদ্ম ঝিয়ের বাসা।

হাজারি বলিল—বাটিতে কি পদ্মদিদি?

—একটু দম্বল, দই পাতবো বলে গোয়ালাবাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তারপর, ভাল আছ?

—তা মন্দ নয়। তুমি ভাল আছ ঠাকুর?

—এখানে কাছেই থাকো বুঝি?

এ কথার উত্তরে পদ্ম ঝি যাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।বলিল—এস না ঠাকুর, আমার বাড়িতে একবার এলেই না হয়—

—তা বেশ বেশ, চলো না পদ্মদিদি।

ছোট্ট বাড়িটা, একপাশে একটা পাতকুয়া, অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোয়াল। পদ্ম ঝি রোয়াকটাতে একখানা মাদুর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল। হাজারি খানিকটা অস্বস্তি ও আড়ষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল। পদ্ম যে তাহার মনিব, তাহাদেরই হোটেলে সে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাজ করিয়াছে, এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায়? এমন কি, পদ্ম ঝিকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে, আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

পদ্ম ঝি বলিল—পান সাজব খাবে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—তা—তা বরং একটা—

পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—তারপর, রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম। ওখানে বসাবে কাকে?

—ওখানে বসাবো ভাবছি বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন—নরেনকে মনে আছে? সেইতাকে।

—মাইনে কত দেবে?

—সে সব কথা এখনও ঠিক হয়নি। ও তো আমার এই হোটেলে খাতাপত্র রাখে, দেখাশুনো করে, বড় ভাল ছেলেটি।

—তা ভালো।

—চক্কত্তি মশায়ের শরীর ভাল আছে? ক'দিন ওদিকে আর যেতে পারিনি। হোটেল চলছে কেমন?

—হোটল চলছে মন্দ নয়। তবে আমি কি বলছিলাম জানো ঠাকুর, কর্তামশায়কেরেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখো না তুমি? তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হাজারি এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলকর্তা কিকরে থাকবেন? ওঁর নিজের হোটেল?

—সেজন্যে ভাবনা হবে না। সে আমি দেখব। কি বল তুমি?

এখন আমি কোন কথা দিতে পারব না পদ্মদিদি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি। রেল-কোম্পানি যখন টেন্ডার নেয়, তখন যার নাম লেখা থাকে, তারছাড়া আর কোন লোকের অংশ-টংশ থাকতে দেবে না হোটেলে। হোটেল তো আমারনয়—হোটেল রেল-কোম্পানির।

—ঠাকুর, একটা কথা বলব? তুমি এখন বড় হোটেলওয়ালা, অনেক পয়সারোজগার কর শুনি। কিন্তু আমি তোমায় সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি। তুমি এস আমাদেরহোটেলে আবার।

হাজারি বিস্ময়ের সুরে বলিল—চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে? রাঁধতে?

সে মনে মনে ভাবিল—পদ্মদিদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলে কি?

পদ্ম কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিল—সত্যি বলছি ঠাকুর। এস আমাদের ওখানে আবার।

—কেন বল তো পদ্মদিদি? একথা তুললে কেন?

—তবে বলি শোন। তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জাঁকবে।

এমন ধরনের কথা হাজারি কখনও পদ্ম ঝিয়ের মুখে শোনে নাই। সেই পদ্ম ঝি আজ কি কথা বলিতেছে তাহাকে?

হাজারি গলিয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক—পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক, তাহার মুখের একথা যেন হাজারির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এরই আশায় যেন সে এতদিন রাণাঘাটের রেল বাজারে এত কষ্ট করিয়াছে।

অন্য লোকে হাজার ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু,অনেক বেশি মূল্যবান।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে, তাহা যে হয় না একথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে। যখন সে গোপালনগরের চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে চাকুরিলইয়াছিল—তখনও উহারা যদি তাহাকে না তাড়াইয়া দিত, তবে তো নিজস্ব হোটেলখুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না। উহাদের হোটেলে পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে—কেন তাহাকে উহারা তাড়াইল।

এখন আর হয় না।

এখন সে নিজে মালিক নয়, কুসুমের টাকা ও অতসী-মার টাকা হোটেলে খাটিতেছে, তাহার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অনেকগুলি প্রাণীর উন্নতি-অবনতি জড়ানো। নিজেরখেয়াল-খুশিতে যা-তা করা এখন আর চলিবে না।

টেঁপির ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—টেঁপি আর নরেন।

অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে—আর এখন পিছানো চলে না।

হাজারি পদ্ম ঝিয়ের মুখের দিকে দুঃখ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি। কিন্তু এখন যাওয়া হয় কি করে তুমিই বল!

পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয়, সে নিতান্ত মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়াফেলিয়াছিল। হাজারির কথার সে কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবংকিছুক্ষণ পরে একটা কাপড়-জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়াবলিল—পড়তে জান তো, পড়ে দেখ না?

হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয়, তবে ও-কাজে সে খুব পারদর্শী নয়। তবুপদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে সে ভাল পড়িতে পারে না! পুঁটুলি খুলিয়াসে দেখিল খানকয়েক কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নাই।

পদ্ম ঝি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে নিজেই বলিল—ক-খানা হ্যান্ডনোট, তা সবসুদ্ধ সাত'শ টাকার হ্যান্ডনোট। কর্তাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছেতখন। নিজের হাতের চুড়ি বিক্রি করি, কানের মাকড়ি বিক্রি করি—ছিল তো সব, যখনএইস্তিরি ছিলাম, দু'খানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে।

হাজারি বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি?

—দেইনি তো কার টাকায় হোটেল চলছিল এতদিন? যা কিছু ছিল সব ওর পেছনেখুইয়েছি।

—কিছু টাকা পাওনি?

—পেটে খেয়েছি আমি, আমার বোনঝি, আমার এক দেওর-পো এই পর্যন্ত। পয়সা যে একেবারে পাইনি তা নয়—তবে কত আর হবে তা? বোনঝির বিয়েতে কর্তা মশায় এক'শ টাকা দিয়েছিলেন—সে আজ সাত বছরের আগের কথা। সাত-শ টাকার সুদ ধর কত হয়?

টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে?

—আজ ন-বছরের ওপর হল। ওই এক'শ টাকা ছাড়া একটা পয়সা পাইনি—কর্তামশায় কেবলই বলে আসছেন একটু অবস্থা ভাল হোক হোটেলের—সব হবে, দেব।

—ওঁকে আগে থেকে জানতে নাকি, না রাণাঘাটে আলাপ?

—সে-সব অনেক কথা ঠাকুর। উনি আমাদের গাঁ ফুলে-নব্‌লার চক্কত্তিদের বাড়িরছেলে। ওঁর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্কত্তি—বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। অবস্থাও ভাল ছিল তাঁর—আমাদের কর্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে। লেখাপড়া তেমন শেখেননি, বললেন রাণাঘাটে গিয়ে হোটেল করব, পদ্ম কিছু টাকা দিতে পার? দিলাম টাকা। সে আজ হয়ে গেল—

হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্নপদ্মদিদিকে না করাই ভাল। গ্রামে কত লোক থাকিতে তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলেতাহার কাছেই টাকা চাহিল কেন, সেই বা টাকা দিল কেন, রাণাঘাটে বেচুর হোটেলেতাহার ঝি-গিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ব হইতেই অবলম্বিত ব্যবস্থারফল—এসব কথা হাজারি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না।

কিন্তু হাজারির বয়স হইয়াছে, জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয়, সে এবিষয়ে কোনোপ্রশ্ন না করিয়া বলিল—হ্যান্ডনোটগুলো তুলে রেখে দাও পদ্মদিদি ভালকরে। সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকাও তোমার হয়ে যাবে—এগুলো রেখে দাও।

পদ্ম কি রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল—ও সব তুলে রেখে কি করবঠাকুর? ওসব কোন্ কালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে। পড়ে দেখ না ঠাকুর—

হাজারি অপ্রতিভ হইয়া শুধুবলিল—ও!

—যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর, সব হোটলের পেছনে দিয়েছি—আর কি আছে এখনহাতে, ছাই বলতে রাইও না।

শেষের কথাগুলি পদ্ম ঝি যেন আপন মনেই বলিল, বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নহে। হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পদ্ম ঝির এমন অবস্থা সে কখনও দেখেনাই—ভিতরের কথা সে জানিত না, মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পদ্মদিদির উপর!

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল, সে কিছুই যখন করিতে পারিবে নাআপাতত—তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি?

বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটি অদ্ভুত ধরনেরআনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল।

বাহিরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেঁপির গলা। সে বলিতেছে—নরেনদা, চা নাখেয়ে কিছুতেই আপনি এখন যেতে পারবেন না। বসুন।

নরেন বলিতেছে—না, একবার এ-হোটেলে যেতে হবে, তুমি বোঝো না আশা, ইস্টিশানের হোটেল এখন তোবন্ধ—কিন্তু মামাবাবু আসবার আগে এ-হোটেলের সব দেখাশুনো আমায় করতে হবে।

টেঁপির ভাল নাম যে আশালতা, হাজারি নিজেই তা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—নরেনইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল!

টেঁপি পুনরায় আবদারের সুরে বলিল—না, ওসব কাজটাজ থাকুক, আপনি আমাকেআর মাকে টকি দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—আজ নিয়ে যেতেই হবে।

—কি আছে আজ?

—আনব? একখানা টকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে। ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি করে যাচ্ছিল ওবেলা, খোকা একখানা এনেছে—

—যাও চট্ করে গিয়ে নিয়ে এস।

হাজারির ইচ্ছা ছিল না উহাদের কথাবার্তায় সে বাধা দেয়। এমন কি সে একপ্রকারনিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি টেঁপি টকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পড়িয়া গেল।

টেঁপি পাছে কোনপ্রকার লজ্জা পায়—এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—এই যে টেঁপি, তোর মা কোথায়?

টেঁপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া গেল। মুখে বলিল—কে, বাবা! কখনএলে? টের পাইনি তো?

হাজারির কিন্তু মনে হইল টেঁপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই। যেন ভাবিতেছে, আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত।

হাজারির বুকের ভিতরটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। মেয়ে-সন্তান, আহা বেচারী! সব কথা কি ওরা গুছিয়ে বলতে পারে, না নিজেরাই বুঝিতে পারে? টেঁপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি?

হাজারি বলিল—আমি এখুনি হোটেলে বেরিয়ে যাব টেঁপি। পাঁচটা বেজে গিয়েছে, আর থাকলে চলবে না। এক গ্লাস জল বরং আমায় দে—

ওঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল—মামাবাবু কখন এলেন?

হাজারি যেন পূর্বে নরেনের কথাবার্তা শুনিতে পায় নাই বা এখানে নরেন উপস্থিত আছে সে-বিষয়ে কিছু জানিতনা, এমন ভাব দেখাইয়া বলিল—কে, নরেন? কখনএলে বাবাজী?

—অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু—চলুন, আমিও হোটেলে বেরুচ্ছি—

বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি বলিল—একটু জলটল খেয়ে যাও না? হোটেলে এখন ধোঁয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি? ব'স ব'স বরং। টেঁপি তোর নরেনদা'র জন্য একটু চা—

—না না থাক মামাবাবু, হোটেলে তো চা এমনিই হবে এখন।

—তা হোক, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন এখান থেকেই চা খেয়ে যাও।

বলিয়া হাজারি বাড়ির মধ্যের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। টেঁপির মা তখনও রান্নাঘরেরদাওয়ায় একখানা মাদুর বিছাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল। বেচারী চিরকালখাটিয়াই মরিয়াছে এঁড়োশোলা গ্রামে—এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয়তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

হাজারি স্ত্রীকেও জাগাইল না। সবাই মিলিয়া বড় কষ্ট করিয়াছে চিরকাল, এখন সুখের মুখ যখন দেখিতেছে—তখন সে তাহাতে বাধ সাধিবে না। টেঁপির মা ঘুমাইয়াথাকুক।

বাড়ির বাহির হইতে যাইতেছে, নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাজুকসুরে বলিল—মামাবাবু—এই গিয়ে আশা বলছিল—মামীমাকে নিয়ে আর ওকে নিয়েএকবারটকি দেখিয়ে আনার কথা—তা আপনি কি বলেন?

টেঁপিই যে একথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে, এ বিষয়ে হাজারির সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। ছেলেমানুষসব, উহারা কি করে না-করে বয়োবৃদ্ধ লোকে সব বুঝিতে পারে, অথচ বেচারীরা ভাবেতাহাদের মনের খবর কেহ কিছু রাখে না।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা যাবে যাও না? আজ যাবে? পয়সা-কড়ি সব তোমারমামীমার কাছে আছে, চেয়ে নাও! কখন ফিরবে?

—রাত আটটা হবে মামাবাবু—আপনি নিজে ইস্টিশানে যদি গিয়ে বসেন একটু—

—আচ্ছা তা হোক, ইস্টিশানে আমি যাব এখন, সে তুমি ভেবো না। তুমি ওদের নিয়ে যাও—ও টেঁপি, ডেকে দে তোর মাকে। অবেলায় পড়ে ঘুমুচ্ছে ডেকে দে। যাসযদি তবে সব তৈরি হয়ে নে—

হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া পড়িল। বালক-বালিকাদের আমোদের পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চায় না। প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া এবেলার রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাটফর্মেরহোটেলে। এখানে সে বড় একটা বসে না। নরেনই এখানকার ম্যানেজার। এ সবসাহেবী ধরনের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চাটগাঁ মেল আসিবার বেশি বিলম্ব নাই—বনগ্রামের গাড়িওএখনি ছাড়িবে। এই সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ, ঢাকা মেল, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরের ট্রেনগুলির ভিড়। যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু, অনেকেই খায়। হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা।

স্টেশনের হোটেলে দুজন নূতন লোক রান্না করে। এখানে বেশির ভাগ লোকে চায়ভাত আর মাংস—সেজন্য ভাল মাংস রান্না করিতে পারে এরূপ লোক বেশি বেতন দিয়া রাখিতে হইতেছে। পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর—এক-একদিনভিড় এত বেশি হয় যে, ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাইতে হয়।

হাজারিকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্যেরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব, নরেন ম্যানেজার মাত্র। তাহারা ইহাও ভাল জানিয়াছেযে হাজারির পদতলে বসিয়া তাহারা এখন দশ বৎসর রান্না-কাজ শিখিতে পারে—সুতরাং হাজারিকেশুধুতাহারা যে মনিব বলিয়া সমীহ করে তাহা নয়, ওস্তাদ কারিগর বলিয়া শ্রদ্ধা করে।

একজন রাঁধুনীর নাম সতীশ দীঘ্‌ড়ি। বাড়ি হুগলী জেলার কোনো পাড়াগাঁয়ে, রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খুব ভাল রান্নার কাজ জানে, পূর্বে ভাল ভাল হোটেলে মোটা মাহিনায়কাজ করিয়াছে—এমন কি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত গিয়াছিল—সেখানে একশিখ হোটেলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছে। সতীশ নিজে ভাল রাঁধুনী বলিয়া হাজারির মর্ম খুব ভাল করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে।

হাজারি তাহাকে বলিল—কি দীঘ্‌ড়ি মশাই, রান্না সব তৈরী হল?

সতীশ বিনীত সুরে বলিল—একবার দয়া করে আসুন না কর্তা, মাংসটা একবার দেখুন না?

—ও আমি আর কি দেখব, আপনি যেখানে রয়েছেন—

—অমন কথা বলবেন না কর্তা, অন্য কেউ আপনাকে বোঝে না-বোঝে আমি তো আপনাকে জানি—এসে একবার দেখিয়ে যান।

হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ায় মাংসের রঙ দেখিয়া বলিল—রঙ এরকম কেনদীঘ্‌ড়ি মশায়?

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাঁধুনিকে বলিল—বলেছিলাম না কার্তিক? কর্তাচোখে দেখলেই ধরে ফেলবেন? কুঁদের মুখে বাঁক থাকে কখনো?কর্তা যদি কিছু মনে না করেন, কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ।

হাজারি হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা দিতে হবে দীর্ঘ্‌ড়ি মশাই আবার এ বয়সে? লঙ্কারবাটনা হয়নি—পুরনো লঙ্কা, তাতেই রঙ হয়নি। রঙ হবে শুধু লঙ্কার গুণে।

—কর্তা-মশাই, সাধে কি আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছেকরে? কিন্তুআর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন।

হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের কড়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল—কষামাংসে যেগরম জল ঢেলেছিলেন তা ভাল ফোটেনি। সেই জন্যে প্যাঁজা উঠেছে। ওতে মাংস জঠুর হয়ে যাবে।

সতীশ অন্য পাচকের দিকে চাহিয়া বলিল—শোন কার্তিক, শোন। আমি বলছিলাম নাতোমায় জল ঢালবার সময় যে এতে প্যাঁজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না? আর কর্তা মশায় না দেখে কি করে বুঝে ফেলেচেন দ্যাখ। ওস্তাদ বটে আপনি কর্তা।

হাজারি হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বেশ ভালো ঘর। বিজলী আলো জ্বলিতেছে। মার্বেল পাথরের টেবিলে বাবুখরিদ্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া। ভীষণ ভিড় খরিদ্দারের—ওদিকে বনগাঁ লাইনেরট্রেনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, পয়সা গুনিয়া কূল করা যায় না—এই তো জীবন। বেচু চক্কত্তির হোটেলের রান্নাঘরে বসিয়া হাতাবেড়ি নাড়িতে নাড়িতেএই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনও সাহস করে নাই। এতসুখও তার অদৃষ্টে ছিল। পদ্মদিদির কত অপমান আজ সার্থক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিতকর্মব্যস্ত হোটেল-জীবনের মধ্যে। আজ কাহারও প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ নাই।

হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাঁটাপথে গোপালনগরে যাইবার সময় সেই ছোট্ট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ির বধূটির কথা। হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায়ে খাটাইয়া দিবে। সে কাল যাইবে। গরিব মেয়েটির টাকা খাটাইবার এই ভাল ক্ষেত্র। বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিল হাজারির দুঃসময়ে—সুসময়ে সেই সরলা মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে। নতুবা ধর্ম থাকে না।

পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল। চাকদা স্টেশন পর্যন্ত অবশ্য ট্রেনে আসিল—বাকি পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল।

সেই রকম বড় বড় তেঁতুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিনমানেই এ পথেঅন্ধকার। হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়াছিল, তখন রাণাঘাটহোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে—হাতে পয়সা নাই, পথ হাঁটিয়া এই পথে সেচাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। আর আজ?

আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সে রাণাঘাটের বাজারের দুটি বড় হোটেলের মালিক। তার অধীনে দশ-বারো জন লোক খাটে। যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি, হাজারির সাধ্য নাই তাহার বিন্দুমাত্র প্রত্যুপকার সে করে—অতসী-মা বড়মানুষের মেয়ে, তার উপর সে বিবাহিতা—হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে?

কিন্তু তাহার বদলে যে দুটি-একটি সরলা দরিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নতুন পাড়ার গোয়ালা-বউটি ইহাদের মধ্যে একজন। নতুন পাড়া পৌঁছিতে বেলা প্রায় ন'টা বাজিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেঁতুলগাছের ছায়ায় কাহাদের

একখানা গরুর গাড়িপড়িয়া আছে, তাহার উপর আসিয়া বসিল। সর্বাঙ্গে ঘাম, এক হাঁটু ধুলা—একটু জিরাইয়া লইয়া ঘাম মরিলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়াভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকাই যুক্তিসঙ্গত।

একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পথিক যশোরের দিক হইতে আসিতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া সেকাছে গিয়া বলিল—দেশলাই আছে?

—আছে, বসুন।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—প্রণাম হই, একটু পায়ের ধুলো দেন ঠাকুরমশাই।

লোকটির নাম কৃষ্ণলাল, জাতিতে শাঁখারি, বাড়ি পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে। কথাবার্তায় বেশটান আছে পূর্ববঙ্গের। বনগ্রামে ইছামতীর ঘাটে তাহাদের শাঁখার বড় ভড় নোঙর করিয়াআছে, কৃষ্ণলাল পায়ে হাঁটিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যাইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কাজের লোক বেশিক্ষণ বসে না। একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পর্বেই কৃষ্ণলালউঠিতে চাহিল। হাজারি কথাবার্তায় তাহাকে বসাইয়া রাখিল। বনগাঁ হইতে সতেরোমাইল পথ হাঁটিয়া ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে যে লোক, তাহার উপর অসীমশ্রদ্ধা হইল হাজারির। ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে।

সে বলিল—গাঁজাটাজা চলে? আমার কাছে আছে—

কৃষ্ণলাল এক গাল হাসিয়া বলিল—তা ঠাকুরমশায়—পরসাদ যদি দেন দয়া করেতবে তো ভাগ্যি।

—বোসো তবে, এক ছিলিম সাজি।

হাজারি খুব বেশি যে গাঁজা খায়, তা নয়। তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক-আধছিলিম খাইয়া থাকে। আজকাল রাণাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই, হোটেলের সকলে খাতির করে, তাহার উপর নরেন আছে—এই সব কারণে হোটেলে ও ব্যাপারচলে না—বাসায় তো নয়ই, সেখানে টেঁপি আছে। আবার যাহার তাহার সঙ্গেও গাঁজা খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে মান থাকে না। আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি হৃষ্টমনেভাল করিয়া ছিলিম সাজিল। কলিকাটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—বাপরে, আপনারা দেবতা। পেরসাদ করে দিন আগে—

কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল। কৃষ্ণলাল খুশি হইল, সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে না—নিজের চেষ্টায় যে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোটেলের মালিক, তাহার সহিত বসিয়া গাঁজা খাওয়া যায় বটে।

হাজারি বলিল—রাণাঘাটে তো যাবে, আমার হোটেলেই উঠো। রেল-বাজারেআমার নাম বললেই দেখিয়ে দেবে। পয়সা দিও না কিন্তু, আমি সই দিয়ে দিচ্ছি—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণলাল পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে ওইটি মাপ করতে হবে কর্তা। আপনার হোটেলেই উঠবো— কিন্তু বিনি পয়সায় খেতে পারব না। ব্যবসার নিয়ম তানয়, নেয্য নেবে, নেয্য দেবে। এ না হলে ব্যবসা চলে না। ও হুকুম করবেন নাঠাকুরমশায়।

—বেশ, তা যা ভাল বোঝা।

কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। শ্রীচরণঘোষ বাড়িতেই ছিল, হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই। এসব স্থানে কালেভদ্রেলোকজন আসে—কাজেই মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন।

বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বলেছিলেন যে দু-মাসের মধ্যে আসবেন খুড়োমশায়?দু বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে! মনে পড়ল এতদিন পরে মেয়ে বলে?

—তা তো পড়লো মা। এস, সাবিত্রীসমান হও মা, বেশ, ভাল আছ?

—আপনি যেরকম রেখেছেন। আপনাদের বাড়ির সব ভাল খুড়োমশায়?

—তা এখন একরকম ভাল।

—কুসুমদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছে?

—হ্যাঁ, ভালআছে।

—আমার কথা বলেছিলেন?

হাজারি বিপদে পড়িল। ইহার এখান হইতে সেবার সেই যাইবার পরে গোপালনগরেচাকুরি করিল অনেক দিন, তারপর কতদিন পরে রাণাঘাটে গিয়া কুসুমের সহিতদেখা—ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল?

—ইয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কিনা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় সব কথা মনে পড়ে না ছাই। বুড়োও তো হয়েছি মা—

—আহা বুড়ো হয়েচেন না আরও কিছু! আমার পিসেমশায়ের চেয়ে আপনি তো কত ছোট!

—কে গঙ্গাধর? হ্যাঁ, তা গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্তত ষোল-সতেরো বছরের বড়।

—বসুন খুড়োমশায়, আমি আপনার হাত-পা ধোয়ার জল আনি—

শ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল—আপনি তো দাঠাকুরবউমার বাপের বাড়ির গাঁয়ের লোক—সব শুনেচি আমরা, সেবার আপনি চলে গেলে।বউমা সব পরিচয় দেলেন।

হাজারি বলিল—সে বউটির বাপের বাড়ির গাঁয়ের লোক নয়, তবে তাহার পিসিমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের লোক বটে এবং বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহুদিন জানাশোনাআছে বটে।

শ্রীচরণ বলিল—দাঠাকুর আমরা ছোট জাত, বলতে সাহস হয় না—যখন এবারপায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন দু-চার দিন এখানে এবার থাকুন না কেন? বউমারও বড্ডসাধ আপনি দু'দিন থাকেন, আমায় বলতি বলেচে আপনাকে।

হাজারি এখানে কুটুম্বিতার নিমন্ত্রণ খাইতে আসে নাই, এমন কি আজ ওবেলারওনা হইতে পারিলেই ভাল হয়। দুটি বড় হোটেলের কাজ, সে না থাকিলে সববিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে—হাজার কাজ বুঝিলেও নরেন এখনও ছেলেমানুষ। তাহার উপর দুই হোটেলের ক্যাশের দায়িত্ব রাখা ঠিক নয়।

রান্না করিবার সময় বউটিও ঠিক ওই অনুরোধ করিল। এখন দু'দিন থাকিয়া যাইতে হইবে, যাইবার তাড়াতাড়ি কিসের? সেবার ভাল করিয়া সেবাযত্ন না করিতে পারিয়াউহাদের মনে কষ্ট আছে, এবার তাহা হইতে দিবে না।

হাজারি হাসিয়া বলিল—মা, সেবার দু'দিন থাকলে কোনো ক্ষেতি ছিল না—কিন্তুএবার তা আর ইচ্ছে করলেও হবার জো নেই।

হাজারির কথার ভাবে বউটি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন খুড়োমশায়?এবার থাকতে পারবেন না কেন? কি হয়েছে?

—সেবার চাকুরি ছিল না বলেছিলাম মনে আছে?

—এবার চাকুরি হয়েচে, তা বুঝতে পেরেচি। ভালই তো—ভগবান ভালই করেচেন।কোথায় খুড়োমশায়?

—গোপালনগরে।

—ও! তাই এ রাস্তা দিয়েহেঁটেযাচ্চেন বুঝি?

—ঠিক বুঝেচ মা। মায়ের আমার বড্ড বুদ্ধি!

বধূটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আহা, এর মধ্যে আবার বুদ্ধির কথা কি আছেখুড়োমশায়?

—বেশ, কিন্তু তুমি বঁটি দেখে কোটো মা। আঙুল কেটে ফেলবে। ঝিঙেগুলো ধুয়েফেল এবার—

—গোপালনগরের কোথায় চাকুরি করচেন খুড়োমশায়?

—কুণ্ডুদের বাড়ি।

—খুব বড়লোক বুঝি?

—নিশ্চয়ই। নইলে রাঁধুনী রাখে কখনো পাড়াগাঁয়ে? খুব বড়লোক।

—ওদের বাড়ি পুজো হয় খুড়োমশায়?

—খুব জাঁকের পুজো হয়। মস্ত প্রতিমে। যাত্রা, পাঁচালি—

—আমায় নিয়ে দেখিয়ে আনবেন এবার পুজোর সময়? আপনার কোনো হাংনামাপোয়াতে হবে না। আমাদের বাড়ির গরুর গাড়ি আছে, তাতে উঠে বাপে-ঝিয়ে যাবো।আবার তার পরদিন দেখেশুনে ফিরবো। কেমন?

—বেশ তো।

—নিয়ে যাবেন তাহলে, কথা রইল কিন্তু। আমি কখনো কোনো জায়গায় যাইনি খুড়োমশায়, বাপের বাড়ির গাঁ আর শ্বশুর বাড়ীর গাঁ—হয়ে গেল। আমার বড্ড কোন জায়গায় যেতে দেখতে ইচ্ছে করে। তা কে নিয়ে যাচ্ছে?

হাজারির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। মেয়েটিকে একটু শহর-বাজারের মুখ তাহাকেদেখাইতেই হইবে। সে বুঝাইয়া বলিল, তাহার দ্বারা যাহা হইবার তাহা সে করিবেই।পাকা কথা থাকিল।

একবার তামাক খাইয়া লইয়া বলিল—মা, সেই টাকার কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ খুড়োমশায়। টাকা আপনার দরকার?

—কত দিতে পারবে?

—তখন ছিল আশি টাকা—এই দু-বছরে আর গোটা কুড়ি হয়েছে।

বধূটি লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া বলিল—আপনার জামাই লোক ভাল। গত সনতামাক পুঁতে দু-পয়সা লাভ করেছিল, আমায় তা থেকে কুড়িটা টাকা এনে দিয়েবললে, ছোট বৌ রেখে দাও। এ তোমার রইল।

—বেশ, টাকাটা আমায় দিয়ে দাও সবটা।

—নিয়ে যান। আমি তো বলেছিলামই সেবার—

—ভাল মনে দিচ্ছ তো মা?

বধূ জিভ কাটিয়া বলিল—অমন কথা বলবেন না খুড়োমশায়, আপনি আমার বাপের বয়িসী ব্রাহ্মণ দেবতা—দুটো কানা কড়ি আপনার হাতে দিয়ে অবিশ্বাস করব, এমন মতি যেন ভগবান না দেন।

মেয়েটির সরল বিশ্বাসে হাজারির চোখে জল আসিল। বলিল—বেশ, তাই দিও।সুদ কি রকম নেবে?

—যা আপনি দেবেন। আমাদের গাঁয়ে টাকায় দু-পয়সা রেট—

—তাই পাবে আমার কাছে।

হাজারি খাইতে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছিল, মাত্র এক শত টাকার মূলধনে মেয়েটিকেসে এমন কিছু বেশি লাভের অংশ দিতে পারিবে না তো! অংশীদার সে করিয়া লইবেতাহাকে নিশ্চয়ই—কিন্তু এক শত টাকায় কত আর বার্ষিক লভ্যাংশ পড়িবে। হাজারির ইচ্ছা মেয়েটিকে সে আরও কিছু বেশি করিয়া দেয়। রেলওয়ে হোটেলের অংশে যে অন্যকাহারও নাম থাকিবার উপায় নাই—নতুবা ওখানকার আয় বেশি হইত বাজারের হোটেলের চেয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হাজারি রওনা হইল—যাইবার পূর্বে বৌটি হাজারির নিকট এক শত টাকা গুনিয়া দিল। হাজারি রাণাঘাট হইতেই একখানা হ্যান্ডনোট একেবারে টিকিট মারিয়া আনিয়াছিল, কেবল টাকার অঙ্কটি বসাইয়ানাম সই করিয়া দিল। হাজারির অত্যন্ত মায়া হইল মেয়েটির উপর। যাইবার সময় সে বার বার বলিল—এবার যখন আসবো, শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু মনে থাকেযেন মা।

—গোপালনগর?

—যেখানে বল তুমি।

—আবার কবে আসবেন?

—দেখি, এবার হয়তো বেশি দেরি হবে না।

এখান হইতে নিকটেই বেলের বাজার—ক্রোশ দুয়ের মধ্যে। হাজারির অত্যন্ত ইচ্ছাহইল বেলের বাজারে সেবার যে মুদীর দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার সহিত একবার দেখা করে। জ্যোৎস্না রাত আছে, শেষ রাত্রের দিকে বেলের বাজার হইতে বাহির হইলেও বেলা আটটার মধ্যে রাণাঘাট পৌঁছানো যাইবে।

বেলের বাজারের মুদী হাজারিকে দেখিয়া চিনিল। খুব যত্ন করিয়া থাকিবার জায়গাকরিয়া দিল। তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল ফিরাইয়া হাজারির হাতে দিয়াবলিল—ইচ্ছে করুন, ঠাকুরমশায়। তা এখন আপনার কি করা হয়? সেবার তো চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন—

—হ্যাঁ সেবার তো চাকুরি পেয়েও ছিলাম—গোপালনগরের কুণ্ডুবাবুদের বাড়ি।

—ও! তা বেশ বেশ। গোপালনগরের কুণ্ডুবাবুরা এদিগরের মধ্যে নামকরা বড়লোক। লোকও তেনারা শুনিচি বড় ভাল। কত মাইনে দেয় ঠাকুরমশাই?

—তা দিত দশ টাকা আর খাওয়া-পরা।

—ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি? এখন গোপালনগরেই যাবেন তো?

—না, আমি আর সেখানে নেই।

মুদী দুঃখিত সুরে বলিল—আহা! সে চাকুরি নেই? তবে এখন কি—

হাজারি বসিয়া বসিয়া তাহার হোটেলের ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। দোকানীপাকা ব্যবসাদার, ইহার কাছে এ গল্প করিয়া সুখ আছে, ব্যবসা কাহাকে বলে এ বোঝে।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজিল। হাজারির গল্প শুনিয়া মুদী তাহাকে অন্য চোখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সম্ভ্রমের সহিত বলিল—ঠাকুরমশাই, রাত হয়েছে, রসুয়ের যোগাড় করে দিই। তবে একটা কথা, আমার দোকানের জিনিসপত্তরের দাম এক পয়সা দিতে পারবেন না—

—সে কি কথা!

—না ঠাকুরমশায়, এখন তো পথ-চলতি খদ্দের নন, আমারই মত ব্যবসাদার, বন্ধু লোক। আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমার যা জোটে, দুটি বিদুরের খুদ খেয়ে যান। আবার রাণাঘাটে যখন আপনার হোটেলে যাব, তখন আপনি আমায় খাওয়াবেন।

হাজারি জানে এ অঞ্চলের এই রকমই নিয়ম বটে। ব্যবসাদার লোকদের পরস্পরেরমধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এই সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে আছে। রাণাঘাটের মত শহর জায়গায় রেষারেষির আবহাওয়ায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে দোকানী বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল। ঘি ময়দা আনিয়াদিল, লুচি ভাজিয়া খাইতে হইবে, হাজারির কোনো আপত্তিই টিকিল না। ছোট একটারুই মাছ কোথা হইতে আনিয়া হাজির করিল। টাট্‌কা পটল, বেগুন, প্রায় আধ সের ঘন দুধ, বেলের বাজারের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা সন্দেশ।

হাজারি দস্তুরমত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। এমন জানিলে সে এখানে আসিত না। মিছামিছি বেচারীর দণ্ড করা, অথচ সে-কথা বলিতে গেলে লোকটি মহাদুঃখিত হইবে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ আতিথেয়তা শহর-বাজারে হাজারির চোখে পড়েনাই—এই সব পল্লী-অঞ্চলেই এখনও ইহা আছে, হয়তো দু-দশ বছর পরে আর থাকিবে না।

পরদিন সকালে হাজারি দোকানীর নিকট বিদায় লইল বটে, কিন্তু রাণাঘাট না আসিয়া হাঁটাপথে গোপালনগর চলিল। তাহার পুরানো মনিব-বাড়ি, সেখানে তাহার একটা কাপড়ের পুঁটুলি আজও পড়িয়া আছে—আনি আনি করিয়া আনা আর হইয়া উঠে নাই।

পথে বেলা চড়িল।

পথের ধারে বনজঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটি দেখিয়া হাজারির মনে পড়িল ইহারইকাছে সেই শ্রীনগর-সিম্‌লে গ্রাম।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেবার যাঁহার বাড়িতে আশ্রয়লইয়াছিল, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে যাইবে। অনেক দিন পরে যখনএ পথে আসিয়াছে, তখন তাহার সংবাদ লওয়াটা দরকার বটে।

বিহারী বাঁড়ুয্যে মশায় বাড়িতেই ছিলেন। এই দুই বৎসরে চেহারা তাহার আরওম্যালেরিয়াশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সম্মুখের দু-একটিদাঁত পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যেমশায় হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, গ্রাম্য-আতিথেয়তারকোন ত্রুটি হইল না—তখনই হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং এ-বেলাঅন্তত থাকিয়া আহার না করিয়া তাহার যে যাইবার উপায় নাই এ-কথাটিও হাজারিকেজানাইয়া দিলেন। বাড়ির সম্মুখস্থ নারিকেল গাছে ডাব পাড়িবার জন্য তখনই লোকউঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

গ্রামে তখনই লোক ছিল না তত, এ দু-বছরে যেন আরও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাড়ির উত্তর দিকের বাঁশবনের ওপারে সেবার একঘর গৃহস্থ ছিল, হাজারির মনে আছে—এবার সেখানে শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে। বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—কে, ও দুলাল তো? না, ওদের আর কেউ নেই। দুলাল আর তার ভাই নেপাল এক কার্তিক মাসে মারা গেল—দুলালের বৌ বাপের বাড়ি চলে গেল, ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরে, আর নেপাল তো বিয়েই করেনি। কাজেই ভিটে সমভূম হয়ে গেল। আর গাঁ-সুদ্ধ হয়েছে এই দশা। তা আপনি আসবেন বলেছিলেন, আসুন না? ঐ দুলালের ভিটেতে ঘর তুলুন কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারের জমি দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের গাঁয়ে এখন লোকের দরকার—আপনি আসুন খুব ভাল ধানের জমি দেবো আপনাকে আর আম-কাঁঠালের বাগান। কত চান? বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ঘোর জঙ্গল হয়ে পুব পাড়ায়। লোক নেই মশায়, কে ভোগ করবে আম-কাঁঠালের বাগান? আপনি আসুন, চারখানা বড় বড় বাগানআপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গাঁয়ের মত খাদ্যসুখ কোথাও পাবেন না, আরএত সস্তা। দুধ বলুন, ফলফুলুরি বলুন, মাছ বলুন—সব সস্তা।

হাজারি ভাবিল, জিনিস সস্তা না হইয়া উপায় কি? কিনিবার লোক কে আছে? একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে লোকনেই তো জিনিসপত্তর তৈরী করে কে? এই তরি-তরকারি দুধ?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—ওই যে—আপনি বুঝতে পারলেন না! ভদ্দরলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষালোকের বাড়বাড়ন্ত খুব। সিম্‌লে গাঁয়ের বাইরে মাঠের মধ্যেদেখবেন একশো ঘর চাষী কাওরা আর বুনোর বাসা। ওদের মধ্যে মশায় ম্যালেরিয়ানেই, যত রোগ বালাই সব কি এই ভদ্দরলোকের পাড়ায় মশায়?পাড়াকে পাড়া উজাড় করে দিলে একেবারে রোগে!

বিহারী বাঁড়ুয্যের চারিটি ছেলে, বড় ছেলেটির বছরখানেক হইল বিবাহ দিয়াছেন, বলিলেন। সে ছেলেটির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর দু-তিনবছর এভাবে যদি ছেলেটি কাটায় তবে বাঁড়ুয্যে মশায়ের পুত্রবধূকে কপালের সিঁদুরএবং হাতের নোয়ার মায়া কাটাইতেই হইবে।

কিন্তু সে ছেলেটির বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই, জমিজমা, চাষআবাদেরসমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয়—বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় একরূপ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।বড় ছেলেটিই একমাত্র ভরসা। তাহার উপর ছেলেটি লেখাপড়া এমন কিছু জানে নাযে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত—শুধু তাহার কেন, অন্য ছেলেগুলিরও তাই।

তবুও হাজারি বলিল—বাঁড়ুয্যেমশায় একটা কথা বলি, আপনি যদি কিছু মনে নাকরেন। আপনার একটি ছেলেকে আমি রাণাঘাটে নিয়েগিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়েদিতে পারি—ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে—

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—ভাত-বেচা হোটেলে? না, মাপ করবেন। ও-সব আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের বংশে ও-সব কখনো—ও কাজ আমাদের নয়।

হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীনগর-সিম্‌লে হইতে বাহির হইয়া যখন আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখনসেবারকারের মতই সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমন নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সুখ মৃত্যুরসামিল—ও সুখ তাহার সহ্য হইবে না।

গোপালনগরে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিল।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ি পৌঁছিতেই হাজারি যথেষ্ট খাতির পাইল। কুণ্ডুদের বড়কর্তাখুশি হইয়া বলিলেন—আরে হাজারি ঠাকুর যে, কোথায় ছিলেন এতদিন? আসুন—আসুন।

বাড়ির মেয়েরাও খুশি হইল। হাজারি ঠাকুরের রান্না সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আজওতাহারা বলাবলি করে। লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ির লোকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ইহারা হাজারির পুরানো মনিব সুতরাং সে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে ত্রুটিকরিল না। বড়বাবুর স্ত্রী বলিলেন—ঠাকুরমশায়, দু-দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন, আরদু-বছর দেখা নেই, ব্যাপার কি বলুন তো? মাইনে বাকি তাও নিলেন না। হয়েছিল কি?

ইহারা ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে, রসুইয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সম্মানপ্রদর্শনের কার্পণ্য নাই। মেজকর্তার মেয়ে নির্মলার সেবার বিবাহ হইয়াছিল—সে শ্বশুরবাড়িতে থাকিবার সময়েই হাজারি উহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। নির্মলা এখানেসম্প্রতি আসিয়াছে। সে হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বেশআপনি, শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই। উনি সেই বিয়ের পরদিনআপনার হাতের রান্না খেয়ে গেছলেন, আমায় বললেন—তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভাল।ওর হাতের রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না, ওমা, এসে দেখি কোথায় কে! কোথায় ছিলেন এতদিন? সেই রকম মাংস রাঁধুন তো একদিন। এখন থাকবেন তোআমাদের বাড়ি?

হাজারির কষ্ট হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে। তবুও বলিতে হইল। নির্মলাকে বলিল—তোমায় আমি মাংস রেঁধে খাইয়ে যাব মা, দু-দিনতোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই করে খাওয়াব, তারপর যাব।

বড়কর্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন—রাণাঘাটের প্ল্যাট্‌ফর্মের সে নতুন হোটেলআপনার? বেশ, বেশ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকরিকরে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে যে কোনব্যবসাই হোক। আপনি ভাল রাঁধেন, ওই হোটেলের ব্যবসাই আপনার ঠিকমত ব্যবসা—যেটা যে বোঝে বা জানে। উন্নতি করবেন আপনি।

আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে এক জোড়া ধুতি উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন যাহা বাকি ছিল সব চুকাইয়া দিল। হাজারি বেতন লইতে আসে নাই, কিন্তু উহা তাহারবলা সাজে না। সম্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপালনগর হইতে বিদায় হইল।

রাণাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—কোথায় গিয়েছিলেনমামাবাবু? বাড়িসুদ্ধ সব ভেবে খুন। কাল রেলওয়ে ইন্সপেক্টর এসেছিল, আমাদেরহোটেল দেখে খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভাল লিখেছে।

—টেঁপি ভাল আছে?

—হ্যাঁ, কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু। মামীমা, আমি আরআশালতা। মামীমা টকি দেখে খুব খুশি।

টেঁপির কথাটা সে মামীমার উপর দিয়াই চালাইয়া দিল।

—আর একটা কথা মামাবাবু—

কি?

—কাল পদ্ম ঝি এসে আপনাদের বাসায়মামীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল। আর কুসুমদিদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। উনিও কাল এসেছিলেন।

হাজারি বাড়ি ঢুকিতেই টেঁপি ওরফে আশালতা এবং তাহার মা দুজনেই টকির গল্পে মুখর হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম, তাহারা কখনও ও-জিনিসের কল্পনাই করেনাই—আবার একদিন দেখিতেই হইবে—এইবার কিন্তু টেঁপি বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না। কাজ তো সব সময়েই আছে, একদিনও কি সময় করিয়া যাইতে নাই?

—কী গান গাইলে! চমৎকার গান, বাবা। আমি দুটো শিখে ফেলেছি।

—কি গান রে?

—একটা হোল, তোমারি পথ চেয়ে থাকব বসে চিরদিন—চমৎকার সুর বাবা।শুনবে? বেশ গাইতে পারি এটা—

—থাক এখন আর দরকার নেই। অন্য সময়...এখন একটু কাজ আছে।

টেঁপি মনঃক্ষুণ্ণ হইল। এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুশি হইত। তা নয়বাবার সব সময় কেবল কাজ আর কাজ!

টেঁপির মা বলিল—ওগো, কাল পদ্ম বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গেদেখা করতে। বেশ লোকটা। ওদের হোটেলে তুমি নাকি কাজ করতে!...

হাজারি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বললে পদ্মদিদি?

—গল্প করলে বসে, পান সেজে দিলাম, খেলে। ওদের সে হোটেল উঠে যাচ্ছে। আর চলে না, এই সব বললে।

হাজারি এখনও পদ্মকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। পদ্মদিদি সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পদ্মদিদিতাহার বাড়িতে আসিয়াছিল বেড়াইতে—তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে—হাজারি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল—পদ্ম ঝি তাহার বাড়িতে পদধূলি দিয়া যেন তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

—টেঁপি বলিল—বাবা, নরেনদাদাকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। নরেন-দা বলেছে আমাকেমাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তুমি মাংস এনে দাও—

হাজারি এদিকের সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ি যাইবার জন্য রওনা হইল, পথেহঠাৎ পদ্ম ঝিয়ের সঙ্গে দেখা। পদ্ম ঝিয়ের পরনে মলিন বস্ত্র। কখনও হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই।

হাজারি বলিল হাতে কি পদ্মদিদি? যাচ্ছ কোথায়?

পদ্ম হাজারিকে দেখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ঠাকুরমশায়, কবে ফিরলে? হাতে তেঁতুল, একটু নিয়ে এলাম হোটেল থেকে।

হাজারি মনে মনে হাসিল। হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাসএখনও যায় নাই পদ্মদিদির!

হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পদ্ম বলিল—শোনো, দাঁড়াও না ঠাকুরমশায়! কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে! বলেনি বৌদিদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল বটে।

—বৌদিদি লোক বড় ভাল, আমার সঙ্গে কত গল্প করলে। আর একদিন যাব।

—বা, যাবে বৈ কি পদ্মদিদি, তোমাদেরই বাড়ি। যখন ইচ্ছে হয় যাবে। হোটেলকেমন চলছে?

—তা মন্দ চলছে না। একরকম চলছে।

—বেশ বেশ। তাহলে এখন আসি পদ্মদিদি—

হাজারি চলিয়া গেল। ভাবিল—একরকম চলছে বললে অথচ কাল বাড়িতে বসেগল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না, উঠে যাবে। পদ্মদিদি ভাঙে তো মচকায় না!

কুসুমের বাড়িতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। কথায়-কথায় নতুন গাঁয়েরবধূটির কথা মনে পড়াতে হাজারি বলিল—ভাল কথা কুসুম-মা চেনো? এঁড়োশোলারবনমালীর স্ত্রীর ভাইঝি—তোমাকে দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নতুন গাঁ?

কুসুম বলিল—খুব চিনি। ওর নাম তো সুবাসিনী। ওকে কি করে জানলেন জ্যাঠামশায়?

হাজারি বধূটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, তাহার টাকা লইয়া আসা, হোটেলেতাহাকে অংশীদার করার সঙ্কল্প।

কুসুম বলিল—এ তো বড় খুশির কথা। আপনার হোটেলে টাকা খাট্‌লে ওরভবিষ্যতে একটা হিল্লে হয়ে রইল।

—কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা? তখন কোথায় থাকবে হোটেল?

—ও কথা বলতে নেই জ্যাঠামশায়—ছিঃ—

কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে। হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসাবে দেখেনা, হোটেলের অংশীদার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা দেয়, মাসিক লাভেরঅংশ স্বরূপ।

কুসুম বলিল—অমন সব কথা বলেন কেন, ওতে আমার কষ্ট হয়। আপনি ছিলেনতাই আজ রাণাঘাট শহরে মাথা তুলে বেড়াতে পারছি, ছেলেপিলে দু-বেলা দু-মুঠোখেতে পাচ্ছে। এই বাড়ি বাঁধা রেখে

গিয়েছিলেন শ্বশুর, আপনাকে বলিনি সে-কথা, এতদিন বাড়ি বিক্রি হয়ে যেত দেনার দায়ে, যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস। ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ করে ফেলেছি—এখন বাড়ি আমার নামে।আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশায়—আমার চোখে আপনি দেবতা।

হাজারি বলিল—উঠি আজ মা। একবার ইস্টিশানের হোটেলটাতে যাব। একদল বড়লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে, দার্জিলিং মেলের সময় এখানে খানা খাবে। তাদের জন্যে মাংসটা নিজে রাঁধবো। তারে তাই লেখা আছে।

দার্জিলিং মেলে চার-পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারির রেলওয়ে হোটেলে খাইতে আসিল। হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল। উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশি হইয়া গেল। হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল—হাজারিবাবু, আপনারনাম কলকাতায় পৌঁচেছে জানেনতো?বড়ঘরে যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে, তারা জানে রাণাঘাটের হিন্দু-হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাঁধুনী। আমাদেরসেইটে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আজ আপনার এখানে আসা। তারে বলাও ছিলযাতে আপনি নিজে রাঁধেন। বড় খুশি হয়েছি খেয়ে।

ইহার কয়েক দিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলিকাতা হইতে। সেদিন যাহারারেলওয়ে হোটেলে খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ওবেলা, বিশেষ জরুরী দরকার আছে। সাড়ে তিনটার কৃষ্ণনগর লোকালে দুইজন ভদ্রলোক নামিল। তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি—যে হাজারির রান্নারসুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিল। অন্য একজন বাঙালী নয়—কি জাত, হাজারি চিনিতেপারিল না।

পূর্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবাঙালী ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়াহিন্দীতে বলিল—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এই সে হাজারি ঠাকুর।

অবাঙালী ভদ্রলোকটি হাসিমুখে হিন্দীতে কি বলিলেন, হাজারি ভাল বুঝিল না।বিনীত ভাবে বাঙালী বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দী বুঝিতে পারে না।

বাঙালী বাবুটি বলিলেন—শুনুন হাজারিবাবু, কথাটা বলি। আমার বন্ধু ইনি গুজরাটী, বড় ব্যবসাদার, ধুরন্ধর খাড্ডে কোম্পানির বড় অংশীদার। জি. আই. পি. রেলের সব হিন্দু রেস্টোরান্টের কন্ট্রাক্টর হোল খাড্ডেকোম্পানি। ওরা আপনাকে বলতে এসেছেওদের সব হোটেলের রান্না দেখাশুনা তদারক করবার জন্যে দেড়শো টাকা মাইনেতেআপনাকে রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেন্ট। আপনার সব খরচ, রেলের যে কোনো জায়গায় যাওয়া-আসা, একজন চাকর ওরা দেবে। বম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে, আপনাকে একটা অংশও ওরা দেবে।আপনি রাজী?

হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে। মন্দ কি? কাজকর্ম এদিকেযাহা রহিল নরেন দেখাশুনা করিতে পারে। খরচা বাদে মাসে অতিরিক্ত দেড় শত টাকাকম নয়—তা ছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি। এ হাতছাড়া করা উচিত হয় না—নরেনের ইহাই মত।

হাজারি আসিয়া বলিল—আমি রাজী আছি। কবে যেতে হবে বলুন। কিন্তু একটাকথা আছে—হিন্দী তো আমি তত জানিনে! কাজ চালাব কি করে?

বাঙালী বাবু বলিলেন—সেজন্যে ভাবনা নেই। দু'দিন থাকলেই হিন্দী শিখে নেবেন। সই করুন এ কাগজে। এই আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্ম; এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। দুজনসাক্ষী ডাকুন।

যদু বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া আনা হইল হোটেল হইতে, অন্য সাক্ষী নরেন। কাগজপত্রেরহাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহারা চা-পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল। বাঙালী ভদ্রলোক বলিয়া গেল—মে মাসের পয়লা জয়েন করতে হবে আপনাকে বম্বেতে। আপনার ইন্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বম্বে পৌঁছে দেবে। তৈরী থাকবেন—আর পনেরো দিন বাকি।

হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল।এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে। বোম্বাই! সে বোম্বাই যাইতেছে!দেড়শো টাকা মাহিনায়! বিশ্বাস হয় না। সব যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল। টাকার জন্যনয়। টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশী ছাড়া কম রোজগার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব? পাঁচটা দেশ দেখিয়া বেড়ানো, পাঁচজনের কাছে মান-খাতির পাওয়া, নূতনতর জীবনযাত্রার আস্বাদ—এ সবই তো আসল।

পিছন হইতে যদু বাঁড়ুয্যে ডাকিল—ও হাজারি-ভায়া, হাজারি-ভায়া শোন, হাজারিভায়া—

হাজারি কাছে যাইতেই যদু বাঁড়ুয্যে রাণাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে—সেই যদু বাঁড়ুয্যে স্বয়ং নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলো লইতেগেল। বলিল—ধন্যি, খুব দেখালে ভায়া, হোটেল করে তোমার মত ভাগ্যি কারো ফেরে নি। পায়ের ধুলো দাও, তুমি সাধারণ লোক নও দেখছি।

হাজারি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—কি করেন বাঁড়ুয্যেমশায়—আমার দাদার সমান আপনি—ওকি—ওকি—আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে—আপনাদের আশীর্বাদে—এক রকম করে খাচ্ছি—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—এসো না ভায়া গরিবের হোটেলে একবার, এক ছিলিমতামাক খেয়ে যাও—এসো।

যদু বাঁড়ুয্যের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না। যদু চা খাওয়াইল, ছানার জিলাপি খাওয়াইল, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল। স্বপ্ন না সত্য? এই যদু বাঁড়ুয্যে একদিন নিজের হোটেলে কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল। তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও!

না, যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে। ইহার বেশি আর সে কিছু চায় না। রাধাবল্লভঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন। আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন।

কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল, জ্যাঠামশায় কি ভাবেন, এইবয়সে তাঁহাকে সে অত দূরে যাইতে কখনই দিবে না। জেঠিমাকে দিয়াও বারণকরাইবে। আর টাকার দরকার নাই। সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের?

হাজারি বলিল—মা বেশিদিন থাকব না সেখানে। চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে। না গেলে ওরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করতে পারে। আর একটাউদ্দেশ্য আছে কি জান মা, বড় বড় হোটেল কি করে চালায়, একবার নিজের চোখেদেখে আসি। আমার তো ঐ বাতিক, ব্যবসাতে যখন নেমেছি, তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব। বাধা দিও না মা, তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সাধ্যিনেই আমার।

টেঁপির মা ও টেঁপি কান্নাকাটি করিতে লাগিল। ইহাদের দুজনকে বুঝাইল নরেন। মামাবাবু কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছেন? অত কান্নাকাটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে? বম্বে তো বাড়ির কাছে, লোকে কত দূর-দূরান্তর যাইতেছে না চাকুরির জন্য?

সেই দিন রাত্রে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—একটা কথা আছে। আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যে বোম্বাই যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাবারআগে টেঁপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব। নরেন এখানকার কারবার দেখাশুনাকরবে—রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে—ওটাতেই মোটা লাভ। এতে তোমার কি মত?

বংশীধর অনেকদিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল— হাজারিদা, আমি কি বলব, বল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেলে কাজ করেছি। আমরা সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হয়ে কাটিয়েছি

বহুকাল। নরেনও তোমারই আপনারছেলে। যা বলবে তুমি, তাতে আমার অমত কি? আর ওরও তো কেউ নেই—সবই জান তুমি। যা ভাল বোঝ কর।

দেনাপাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল। হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির স্বত্ব টেঁপির নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া উভয় হোটেল চালাইবে—তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাবমত কুসুমকে ও টেঁপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে থাকিবে।

বিবাহের দিন ধার্য হইয়া গেল।

টেঁপির মা বলিল—ওগো, তোমার মেয়ে বলছে অতসীকে নেমন্তন্ন করে পাঠাতে।ওর বড় বন্ধু ছিল—তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখ না?

হাজারিও সে-কথা ভাবিয়াছে। অতসীর সঙ্গে আজ বহুদিন দেখা হয় নাই। সেইমেয়েটির অযাচিত করুণা আজ তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে লোকের চোখেসম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অতসীর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা হাজারি জানিত না, কেবলমাত্র এইটুকুজানিত অতসীর শ্বশুর বর্ধমান জেলার মূলঘরের জমিদার। হাজারি চিঠিখানা তাহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল, কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পুনরায় পত্র লিখিবার সময় নাই।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে হাজারি শ্রীমন্ত কাঁসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতেগিয়াছে, শ্রীমন্ত বলিল—আসুন আসুন হাজারিবাবু, বসুন। ওরে বাবুকে তামাক দে রে—

হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলি পুরানো বাসনপত্র, পিতলের বালতি ইত্যাদি নূতন বাসনের দোকানে দেখিয়া বলিল—এগুলো কি হেশ্রীমন্ত?এগুলো তো পুরোনো মাল—ঢালাই করবে নাকি?

শ্রীমন্ত বলিল—ও-কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম বাবু। ও আপনাদের পুরোনো হোটেলের পদ্ম ঝি রেখে গেছে—হয় বন্ধক নয় বিক্রি। আপনি জানেন না কিছু? চক্কত্তিমশায়ের হোটেল যে সীল হবে আজই। মহাজন ও বাড়িওয়ালার দেনা একরাশ, তারানালিশ করেছিল। তা বাবু পুরোনো মালগুলো নিন না কেন? আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে—বড় ডেক্‌চি, পেতলের বালতি, বড় গামলা। সস্তা দরে বিক্রি হবে— ও বন্ধকী মালের হ্যাংনামা কে পোয়াবে বাবু, তার চেয়ে বিক্রিই করে দেবো—

হাজারি এত কথা জানিত না। বলিল, পদ্ম নিজে এসেছিল?

শ্রীমন্ত বলিল—হ্যাঁ ওদের হোটেলের একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে। হোটেল সীল হলে কাল একটা জিনিসও বার করা যাবে না ঘর থেকে, তাই রেখে গেল আমার এখানে।বলে গেল এগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতেই হবে; চক্কত্তি মশায়ের একেবারে নাকিঅচল অবস্থা।

বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ মিটাইয়া হোটেলে ফিরিতেঅনেক বেলা হইয়া গেল। একবার বেচু চক্কত্তির হোটেলে যাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তুতাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

কুসুম এ কয়দিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানারকম বড়, ছোট, খুচরাকাজে সারাদিন লাগিয়া থাকে। হাজারি তাহাকে বাড়ি যাইতে দেয় না, বলে—মা, তুমি তো আমার ঘরের লোক, তুমি থাকলে আমার বড় ভরসা। এখানেই থাক এ ক'টাদিন।

বিবাহের পূর্বদিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল। সে কৃষ্ণনগর লোকালে আসিতেছে, স্টেশনে যেন লোক থাকে।

আর কেহ অতসীকে চেনে না, কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়া আনিবে, হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল।

ইন্টার ক্লাস কামরা হইতে অতসী আর তাহার সঙ্গে একটি যুবক নামিল। কিন্তুতাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইলপৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্তে মুছিয়া লেপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়াগিয়াছে তাহার চক্ষুর সম্মুখে।

অতসীর বিধবা বেশ।

অতসী হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কাকাবাবু, ভাল আছেন?

ইনি কাকাবাবু—সুরেন। এ আমার ভাসুরপো।কলকাতায় পড়ে। অমন করে দাঁড়িয়েরইলেন কেন?

—না—মা—ইয়ে, চলো—এস।

—ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি! দিয়েছিলাম একরকম বিদেয় করে, আবার এসে পড়েছে সাত বোঝা নিয়ে—এই না? বাবা-কাকারা এমনি নিষ্ঠুর বটে!

হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এক প্ল্যাট্‌ফর্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যেতাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। মনের কোন স্থান যেন হঠাৎ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতসীই তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল।রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরেন উহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে হাজারির দিকেচাহিয়া দেখিল হাজারির চোখ রাঙা, কেমন এক ভাব মুখে। অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়াসেও বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কারণ টেঁপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিলইতিমধ্যে—সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল। অতসীদি বিধবাহইয়াছে—এ কথা তো কেহ বলে নাই।

বাড়ি পৌঁছিয়া অতসী টেঁপিকে লইয়া বাড়ির ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল। দুজনে বহুকাল পরে দেখা—সেই এঁড়োশোলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি, কত কথা যে জমা হইয়া আছে!

টেঁপি চোখের জল ফেলিল বাল্যসখীর এ অবস্থা দেখিয়া। অতসী বলিল—তোরা যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি, তা হলে কিন্তু চলে যাব ঠিক বলছি। এলাম বাপ- মায়ের কাছে, বোনের কাছে একটু জুড়ুতে, না কেবল কান্না আর কেবল কান্না—সরে আয়, তোর এই দুল জোড়াটা পর তো দেখি কেমন হয়েছে—আর এ ব্রেসলেট্‌টা, দেখি হাত—

টেঁপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—এ তোমার ব্রেস্‌লেট্ অতসী-দি, এ আমায় দিতেপারবে না—কক্‌খনো না—

—তা হলে আমি মাথা কুটবো এই ছাদে, যদি না পরিস্সত্যি বলছি। আমারসাধ কেন মেটাতে দিবি নে?

টেঁপি আর প্রতিবাদ করিল না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, ওদিকে অতসীতাহার ডান হাত ধরিয়া তখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেস্‌লেট্ পরাইতেছে।

হাজারি অনেক রাত্রে তামাক খাইতেছে, অতসী আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—কাকাবাবু!

হাজারি চমকিয়া উঠিল, বলিল—অতসী মা? এখনও শোওনি?

—না কাকাবাবু। আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি, তাইএলাম।

হাজারি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা।আমি কিছুই শুনিনি। কতদিন গাঁয়ে যাইনি তো। তোমার এ বেশ চোখে দেখতে কিনিয়ে এলাম মা তোমায়?

অতসী চুপ করিয়া রহিল। হাজারির স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের সান্নিধ্যের নিবিড়তায় সেযেন তাহার দুঃখের সান্ত্বনা পাইতে চায়।

হাজারি সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। পরেঅতসী বলিল—কাকাবাবু, আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজেইউন্নতি হবে—মনে আছে?

—সব মনে আছে অতসী-মা। ভুলিনি কিছুই। আর যা কিছু এখানকার ইস্টাট্-পত্র—সব তো তোমার দয়াতেই মা—তুমি দয়া না করলে—

অতসী তিরস্কারের সুরে বলিল—ওকথা বলবেন না কাকাবাবু, ছিঃ—আমি টাকাদিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টাকা বাড়তো? তিন বছরের মধ্যে এত বড়জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনাড়ি লোক? আমি কিছুই জানতুম না কাকাবাবু, এখানে এসে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ক্ষমতাবান পুরুষমানুষ কাকাবাবু।

—এখন তুমি এঁড়োশোলায় যাবে মা, না আবার শ্বশুরবাড়ি যাবে?

—এঁড়োশোলাতেই যাবো। বাবা-মা দুঃখে সারা হয়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবো। জানেন কাকাবাবু, আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব, যাতে সাধারণের উপকার হয়। বাবার টাকা সব এখন আমিই পাব, শ্বশুরবাড়ি থেকেও টাকাপাব। কিন্তু এ টাকার আমার কোন দরকার নেই কাকাবাবু। পাঁচজনের উপকারেরজন্যে খরচ করেই সুখ।

—যা ভাল বোঝ মা করো। আমি তোমায় কি বলব?

—কাকাবাবু, আপনি বম্বে যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ মা।

অতসী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল—আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? বেশ বাপে-ঝিয়ে থাকবো, আপনাকেরেঁধে দেব—আমার খুব ভালো লাগে দেশবেড়াতে।

—যেও মা, এবারটা নয়। আমি তিন বছর থাকব সেখানে। দেখি কি রকম সুবিধেঅসুবিধে হয়। এর পরে যেও।

—ঠিক কাকাবাবু? কেমন মনে থাকবে তো?

—ঠিক মনে থাকবে। যাও এখন শোও গিয়ে মা, অনেক কষ্ট হয়েছে গাড়িতে, সকাল সকাল বিশ্রাম কর গিয়ে।

পরদিন বিবাহ। টেঁপির নরম হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ হাতে স্থাপনকরিবার সময় হাজারির চোখে জল আসিল।

কতদিনের সাধ—এতদিনে ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিলেন।

বংশীধর ঠাকুর বরকর্তা সাজিয়া বিবাহ-মজলিশে বসিয়া ছিল। সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা!

কাছাকাছি সব হোটেলের রাঁধুনী বামুনেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বরযাত্রীসাজিয়া আসিয়াছে। এ বিবাহ হোটেলের জাতের, ভিন্ন জগতের কোনো লোকেরনিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাতে। ইহাদের উচ্চ কলরব, হাসি, ঠাট্টা ও হাঁকডাকে বাড়ি সরগরমহইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কনে, বিদায় হইয়া গেল। বেশিদূর উহারা যাইবে না। এইরাণাঘাটেরই চূর্ণীর ধারে বংশীধর একখানা বাড়ি ভাড়া করিয়াছে পাঁচ দিনের জন্য।সেখানে দেশ হইতে বংশীধরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি (বংশীধরের স্ত্রী মারাগিয়াছে বহুদিন) আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে। বৌভাত সেখানেই হইবে।

হাজারি একবার রেলওয়ে হোটেলে কাজ দেখিতে যাইতেছে, বেলা আন্দাজ দশটা, বেচু চক্কত্তির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল। কোর্টের পিওন, বেলিফভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পালচৌধুরীর জমাদার। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্কত্তির হোটেল সীল হইতেছে।

হাজারি কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুরানো মনিবের হোটেল, এইখানেসে দীর্ঘ সাত বৎসর সুখে-দুঃখে কাটাইয়াছে। এত দিনের হোটেলটা আজ উঠিয়া গেল!একটু পরে পদ্ম ঝি দুহাতে দুটি বড় বালতি লইয়া হোটেলের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিল। বেলিফ্ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল—এই দেখুন মশায়, ওই মেয়েলোকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, এটা বে-আইনী। আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছিআপনাদের সামনে।

পেয়াদারা গিয়া বাধা দিয়া বলিল—বাল্‌তি রেখে যাও—

পরে আরও কাছে গিয়া হাঁক দিয়া বলিল—শুধু বাল্‌তি নয় বাবু, বালতির মধ্যেপেতল কাঁসার বাসন রয়েছে।

পদ্ম ঝি ততক্ষণ বালতি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল—এ বাসন আমার নিজের— হোটেল চক্কত্তি মশায়ের, আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পেয়াদারা ছাড়িবার পাত্র নয়। অবশ্য পদ্ম ঝিও নয়। উভয় পক্ষে বাক্‌বিতণ্ডা, অবশেষে টানাহেঁচড়া হইবার উপক্রম হইল। মজা দেখিবার লোক জুটিয়া গেল বিস্তর।

একজন মহাজন পাওনাদার বলিল—আমি এই সকলের সামনে বলছি, বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতের আইন অমান্য করবার জন্যে আমি তোমাকেপুলিসে দেবো।

একজন সাক্ষী বলিল—তা দেবেন কেমন করে বাবু? ওর নামে তো ডিক্রি নেইআদালতের। ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন?

বেল্‌ফ্ বলিল—তা নয়, ওকে চুরির চার্জে ফেলে পুলিসে দেওয়া চলবে। এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের। তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবাররাইট কি? ওকে জিজ্ঞেস করো ও ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা—

পদ্ম ঝি তা দিতে রাজী নয়। সে আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছে বাল্‌তিদুটি। বেলিফ্ বলিল—কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে— বদমাইশ মাগী কোথাকার—ভাল কথার কেউ নয়!

পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল। পুনরায় একচোট ধস্তাধস্তির সূত্রপাতহইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—পদ্মদিদি, বাসনওদের দিয়ে দাও।

লজ্জায় ও অপমানে পদ্ম ঝিয়ের চোখে তখন জল আসিয়াছে। জনতার সামনেদাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই। এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সেহাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—এই দেখো না ঠাকুর মশায়, তুমি তো কতদিন আমাদের হোটেলে ছিলে—এআমার জিনিস না? বলো না তুমি, এ বাল্‌তি কার?

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল—কেঁদো না এমন করে পদ্মদিদি। এ হলআইন-আদালতের ব্যাপার। বাসন রেখে এসো ঘরের মধ্যে, আমি দেখছি তারপর কিব্যবস্থা করা যায়—

অবশ্য তখন কিছু করিবার উপায় ছিল না। সে আদালতের বেলিফ্‌কে জিজ্ঞাসাকরিল—কি করলে এদের হোটেল আবার বজায় থাকে?

—টাকা চুকিয়ে দিলে। এ অতি সোজা কথা মশাই। সাড়ে সাতশো টাকার দাবিতেনালিশ—এখনও ডিক্রি হয়নি। বিচারের আগে সম্পত্তি সীল্ না করলে দেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে, তাই সীল করা।

আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বেচু চক্কত্তিকে একধারেডাকিয়া হাজারি বলিল—আমার সঙ্গে চলুন না কর্তামশায় একবার ইস্টিশানেরদিকে—আসুন, কথা আছে।

রেলের হোটেলে নিজের ঘরটিতে বেচু চক্কত্তিকে বসাইয়া হাজারি বলিল—কর্তাএকটু চা খাবেন?

বেচু চক্কত্তির মন খারাপ খুবই। চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই, হাজারি কিছুতেইছাড়িল না। চা পান ও জলযোগান্তে বেচু বলিল—হাজারি, তুমি তো সাত-আট বছর আমার সঙ্গে ছিলে, জানো তো সবই, হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ। আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি—এখন কোথায় যাই আর কি করি। পৈতৃক জোতজমা ঘরদোর যা ছিল ফুলে-নব্লায়, সে এখন আর কিছু নেই, ওই হোটেলই ছিল বাড়ি। এমন কষ্টহয়েছে, এই বুড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায়? চালাই কী করে?

—এমন অবস্থা হল কি করে কর্তা? দেনা বাধালেন কী করে?

—খরচে আয়ে এদানীং কুলোতো না হাজারি। দু-বার বাসন চুরি হয়ে গেল। ছোটহোটেল, আর কত ধাক্কা সইবার জান্ ছিল ওর! কাবু হয়ে পড়লো। খদ্দের কমে গেল।বাড়িভাড়া জমতে লাগলো—এসব নানা উৎপাত—

হাজারি বেচু চক্কত্তিকে তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল—কর্তা, একটা কথা আছে বলি। আপনি আমার পুরোনো মনিব, আমার যদি টাকা এখন থাকতো, আপনার হোটেলেরসীল্ আমি খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন অত টাকা আমার হাতে নেই। তাই বলছি, যতদিন বম্বে থেকে না ফিরি, আপনি আমার বাজারের হোটেলেরম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান। পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেবো। (হাজারিমাহিনার কথাটা মনিবকে বলিতে পারিল না।) খাবেন দাবেন হোটেলে, আর পদ্মদিদিওওখানে থাকবে, মাইনে পাবে, খাবে। কি বলেন আপনি?

বেচু চক্কত্তির পক্ষে ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেলবাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে। পদ্ম ঝিও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে কুসুমের বাড়ি গেল। কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য না হইয়া পারিল না, কারণ জীবনে কোনদিন পদ্ম ঝিকুসুমের দোর মাড়ায় নাই।

—এসো পদ্মপিসি বসো। আমার কি ভাগ্যি। এই পিঁড়িখানাতে বোসো পিসি।পান-দোক্তা খাও? বসো পিসি, সেজে আনি—

পদ্ম ঝি বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ-গল্প ও-গল্প করিল।পদ্ম বুঝিতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়াতবে চাকুরি বজায় রাখা। যদিও সে মনে মনে জানে, চাকুরি বেশি দিন তাহাকে করিতে হইবে না। আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে, তবে বিপদের দিনগুলিতে একটাকোনো আশ্রয়ে কিছুদিন মাথা গুঁজিয়া থাকা।

পরদিন পদ্ম ঝি হোটেলের কাজে ভর্তি হইল। বেচু চক্কত্তিও বসিল গদির ঘরে। ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভাল করিয়াই বুঝিত। তবে কথা এইযে, ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে। বেচু চক্কত্তি দেখাশোনা করিয়াই খালাস।

হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরোনো দিনের হোটেলে আবার কাজ করিতেছে, বেচু চক্কত্তি তাহার মনিব, পদ্ম ঝিও ছোট মনিব।

পদ্ম যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর মশায়, ইলিশ মাছ আনাবএবেলা না পোনা?—তখন হাজারি পূর্ব অভ্যাসমতই সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিল, যা ভাল মনে করো পদ্মদিদি। পচা না হোলে ইলিশই এনো।

বেচু চক্কত্তি পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশি। সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—হাজারি, একটা কথা বলি, তোমার এখানে ফাস্ট আরসেকেনকেলাসের মধ্যে মোট চার পয়সার তফাৎ রেখেচ, এটা ভাল মনে হয় না আমার কাছে। এতে করে সেকেনকেলাসে খদ্দের কম হচ্চে, বেশি লোক ফাস্ট কেলাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না।গত এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কিনা! নরেন বাবাজী ছেলেমানুষ, সেহিসেবের কি বোঝে?

হাজারি কথাটার সত্যতা বুঝিল। বলিল—আপনি কি বলেন কর্তা?

—আমার মত হচ্ছে এই যে ফাস্ট কেলাস হয় একদম উঠিয়ে দাও, নয়তো আমারহোটেলের মত অন্তত দুআনা তফাৎ রাখো। শীতকালে যখন সব সস্তা, তখন এ থেকেযা লাভ হবে, বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফাস্ট কেলাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই লাভের খানিকটা খেয়ে গিয়েও যাতে কিছু থাকে, তা করতে হবে। বুঝলে না?

—তাই করুন কর্তা। আপনি যা বোঝেন, আমি কি আর তত বুঝি?

বেচু চক্কত্তি খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে। ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতইহাজারির নম্র কথাবার্তা—যেন তিনিই মনিব, হাজারি তাঁর চাকর। যদিও পদ্ম ঝি ওতাঁহার দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে, সবই কপালের গুণে, আসলে তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই, তবুও দুজনেই এখন মনে ভাবে, বুদ্ধি থাক আরনা-ই থাক— বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না—লোক হিসাবে হাজারি কিন্তু খুবই ভাল।

সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। এইসময়টা সকলের অগোচরে সে একবার গাঁজা খাইয়া থাকে, হোটেলে গিয়া আজকালসে-সুবিধা ঘটে না। এমন সময় অতসীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাঁজারকলিকা ও সাজসরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল।

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি মা?

—কাকাবাবু, আপনি কবে বম্বে যাচ্ছেন?

—আসচে মঙ্গলবার যাব, আর চার দিন বাকি।

—আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এঁড়োশোলা যাব, আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জলখাবার এনে দেব—যাবেন কাকাবাবু?

হাজারির চোখে জল আসিল। কি তুচ্ছ সাধ! মেয়েদের মনের এই সব অতিসামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষাই কি সব সময়ে পূর্ণ হয়?কি করিয়া সে এঁড়োশোলা যাইবে এখন? ছেলেমানুষ, না হয় বলিয়া খালাস!

মুখে বলিল—মা, সে হয় না। কত কাজ বাকি এদিকে, সে তো মা জান না। নরেন ছেলেমানুষ, ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিয়ে—

—আজ চলুন আমায় নিয়ে। গরুর গাড়িতে আমরা বাপে-মেয়েতে চলে যাই— কাল বিকেলে চলে আসবেন। তা ছাড়া টেঁপিও বলছিল একবার গাঁয়ে যাবার ইচ্ছেহয়েছে। চলুন কাকাবাবু, চলুন—

—তা নিতান্ত যদি না ছাড় মা, তবে পরশু সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পরেফিরতে হবে। থাকবার একদম উপায় নেই—কারণ তার পরদিনই বিকেলে রওনা হতে হবে আমায়। বোম্বাইয়ের ডাকগাড়ি রাত আটটায় ছাড়ে বলে দিয়েছে।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের নিমগাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল। পাশেরচুনকয়লার আড়তে হিন্দুস্থানী কুলিরা সেই ভাবে সুর করিয়া সমস্বরে ঠেঁট্ হিন্দিতে গজলগাহিতেছে, চূর্ণীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে-নাব্‌লার হাটের হাটুরে লোক পারাপারহইতেছে—পুরোনো দিনের মতই সব।

সে কি আজও বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজ করিতেছে? পদ্ম ঝিয়ের মুখনাড়া খাইয়াতাহাকে কি এখনি সদ্য আঁচ বসানো কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া ও-বেলাররান্নার ফর্দ বুঝিয়া লইতে হইবে?

সেই পদ্মদিদি ও সেই বেচু চক্কত্তির সঙ্গে সকালবেলাও তো কথাবার্তা হইয়াছিল।দাঁড়িপাল্লার পাল্লা বদল হইয়াছে, পুরোনো দিনের সম্বন্ধগুলি ছায়াবাজির মত অন্তর্হিতহইল কোথায়? বোম্বাই...বোম্বাই কত দূরে কে জানে? টেঁপিকে লইয়া, অতসী বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত! ইহারা যে-কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে পারে—দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় বিনা আশঙ্কায়, বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতেপারে।

তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকার মত দিন তাহার জীবনেআসিবে? নরেনকে যেদিন প্রথম দেখে সেইদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর ছবিটি—টেঁপি লাল চেলি পরিয়া নরেনের পাশেদাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দেরহাসি—তখন মনে হইয়াছিল এসব দুরাশা, এও কি কখনও হয়?

সবই ঠাকুর রাধাবল্লভের দয়া। নতুবা সে আবার কবে ভাবিয়াছিল যে সে বোম্বাইযাইবে দেড়-শ টাকা মাহিনার চাকুরি লইয়া?

পরদিন অতসী আসিয়া আবার বলিল—কবে এঁড়োশোলা যাবেন কাকাবাবু? টেঁপিও যাবে বলছে, কাকীমাও বলছিলেন গাঁ থেকে সেই আজ দু বছর আড়াই বছর এসেছেনআর কখনও যাননি। ওঁরও যাবার ইচ্ছে। একদিনের জন্যেও চলুন না?

আবার স্বগ্রামে আসিয়া উহাদের গাড়ি ঢুকিল বহুদিন পরে। হাজারিদের বাড়িটাবাসযোগ্য নাই, খড়ের ঘর, এতদিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ঝড়ে খড়উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিব্য চোখে পড়ে।

অতসী টানাটানি করিতে লাগিল তাহাদের বাড়িতে সবসুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু টেঁপির মা রাজী নয়, নিজের ঘরদোরের উপর মেয়েমানুষের চিরকাল টান—ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেঁপির সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেজে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল। টেঁপিকে বলিল—তুইবস্ মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেয়ারাতলার ঘাটে কতদিন নাই নি!

পুকুরের ঘাটে গিয়া এ-পাড়ার রাধু চাটুজ্যের পুত্রবধূর সঙ্গে প্রথমেই দেখা। সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেঁপির মায়ের সমান, দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল। টেঁপির মাকেদেখিয়া সে তো একেবারে অবাক। বাসন মাজা ফেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়াবলিল—ওমা, দিদি যে! কখন এলে দিদি? আর কি আমাদের কথা মনে থাকবেতোমার? এখন বড়লোক হয়ে গিয়েছ সবাই বলে। গরিবদের কথা কি মনে পড়ে?

দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধু চাটুজ্যের পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া টেঁপির মা ঘাট হইতে ফিরিল।মেয়েটি বাড়ি ঢুকিয়া টেঁপিকে বলিল—চিনতে পারিস্ মা?

—ওমা, কাকীমা যে, আসুন, আসুন—

—এস মা, জন্ম-এইস্ত্রী হও, সাবিত্রীর সমান হও। হ্যাঁ গা, তা তোমার কেমনআক্কেল? মেয়েকে আনলে, অমনি জামাইকেও আনতে হয় না? শুনেছি চাঁদের মত জামাই হয়েছে। এ চুড়ি কে দিয়েছে—দেখি মা। ক ভরি? একে কি বলে? পাশা? দেখিদেখি—কখনও শুনিওনি এসব নাম। তা একটা কথা বলি। তোমাদের রান্না এ-বেলা এখানে হওয়ার উপায়ও নেই—আমাদের বাড়িতে তোমরা সবাই এ-বেলা দুটোডালভাত—

টেঁপি বলিল—সে হবে না কাকীমা। অতসী-দি এসেছে আমাদের সঙ্গে জানেন না?অতসীদি সবাইকে বলেছে খেতে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলছিলআমাদের— মা গেল না, জানেন তো মার সাত প্রাণ বাঁধা এই ভিটের সঙ্গে— রাণাঘাটের অমন বাড়ি, কলেরজল—শহর জায়গা, সেখানে থাকতেও মা শুধু বাড়ি-বাড়ি করে—আহা বাড়ির কি ছিরি! ফুটো খড়ের চাল, বাড়ি বললেও হয়, গোয়াল বললেও হয়—

—বাপের বাড়ির নিন্দে করিস নে, যা যা—আজ না-হয় বড়লোক শ্বশুর হয়েছে, এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মানুষ হয়েছ মা!

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই কখন কাটিয়া গেল। ইহাদের আসিবার খবরপাইয়া এ-পাড়া ও-পাড়ার মেয়েমহলের সবাই দেখা করিতে আসিল। জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল।

টেঁপির মা বলিল—জামাইয়ের আসবার জো নেই যে! রেলের হোটেলের দেখাশুনো করেন, সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে। উপায় থাকলে আনি নে মা?

অতসীর দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্বে জানিত। গ্রামসুদ্ধ লোক তাহার জন্য দুঃখিত।সবাই একবাক্যে বলে, অমন মেয়ে—দেবীর মত মেয়ে। আর তারই কপালে এই দুঃখ, এই কচি বয়সে!

সন্ধ্যার দেরি নাই। অতসীদের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারিকথাবার্তা বলিতেছিল। হরিচরণবাবু কন্যার অকাল-বৈধব্যে বড় বেশি আঘাত পাইয়াছেন। হাজারির মনে হইল যেন এই আড়াই বৎসরের ব্যবধানে তাঁর দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েকে দেখিয়া আজ তবুও একটু সুস্থ হইয়াছেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এই দেখ। তোমার বয়েসে আর আমার বয়েসে—খুববেশি তফাৎ হবে না। তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে—না-হয় এক-আধ বছর বাকি।কিন্তু তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে, মনে তুমি এখনও যুবক। কাজ করবারশক্তি তোমার অনেক বেশি এখনও। এই বয়সে বম্বে যাচ্ছ, শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি।বাঙালীর মধ্যে তোমার মত লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত জাতটা ততই জাগবে। এরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরী হয়—দেখছ না আমাদের গাঁয়ের দশা? ইহকালই দেখলি নে, ভোগ করলি নে, তোদের পরকালেকি হবে বাপু? সেখানেও সেই ভূতের ভয়। পরকালে নরকে যাবে। তুমি কি ভাবোঅকর্মা, অলস, ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান?

এই সময় পুরানো দিনের মত অতসী আসিয়া উহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া বলিল—খান কাকাবাবু, চা আনি, বাবা তুমিও খাও, খেতে হবে।সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরি—

কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল। পিছনে আসিল টেঁপি। সেই পুরোনোদিনের মত সবই—তবুও কত তফাৎ! অতসীর মুখের দিকে চাহিলে হাজারির বুকেরভিতরটা বেদনায় টনটন করে। তবুও তো মা-বাপের সামনে অতসী বিধবার বেশযতদূর সম্ভব বর্জন করিয়াছে। মা-বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতেফিরিতে পারিবে না। ইহাতে পাপ হয় হইবে।

হরিচরণবাবু সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বাড়ির মধ্যে গেলেন।

অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল—কেমন মা, তোমার সাধ যা ছিল মিটেছে?

—নিশ্চয়ই কাকাবাবু। টেঁপি কি বলিস্? কতদিন ভাবতুম গাঁয়ে তো যাবো, সেখানে টেঁপিও নেই, কাকাবাবুও নেই। কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলবো?

—কাল আমার সঙ্গে রাণাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা।

—বাঃ, সে আমি বাবা-মাকে বলে রেখেছি। আপনাকে উঠিয়ে দিতে যাব না কিরকম? কাকাবাবু, টেঁপি এখন দিনকতক আমার কাছে এখানে থাক্ না? তাহলেআপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন।

নরেনের কথা বলিতে টেঁপি বাপের অলক্ষিতে অতসীকে এক রাম-চিমটি কাটিল।

—কাকাবাবু পুজোর সময় আসবেন তো! এবার আমাদের গাঁয়ে আমরা ঠাকুরপুজোকরব।

—পুজোর তো অনেক দেরি এখন মা। যদি সম্ভব হয় আসবো বই কি। তবে তুমিযদি পুজো করো তবে আসবার খুব চেষ্টা করব।

টেঁপি বলিল—তোমাকে আসতেই হবে বাবা। মা বলেচে এবার প্রতিমা গড়িয়েকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করবে। এখনও তিন-চার মাস দেরি পুজোর—সে সময় ছুটিনিয়ে আসবে বাবা, কেমন তো?

রাধু মুখুয্যের পুত্রবধূ নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রে তাহাদের বাড়িতে সকলকে খাইতে হইবেই। টেঁপির মা সন্ধ্যাবেলা হইতেই রাধু মুখুয্যের বাড়ি গিয়া জুটিয়াছে, মোচা কুটিয়া, দেশী কুমড়া কুটিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের এ জীবন তাহার অনেক ভাল লাগে। সে বলিতেছিল—ভাই, শহরে-টহরে কি আমাদের পোষায়? এই যে কুমড়োর ডাঁটাটুকু, এই এক পয়সা। এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা। সে ফালি কাটতে বোধহয় পোড়ারমুখো মিন্সেদের হাত কেটে গিয়েছে। আমার ইচ্ছে কি জান ভাই, উনি চলে গেলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে আবার গাঁয়ে আসব, পুজো পর্যন্ত এখানেই থাকব।মেয়ে-জামাই থাকল রাণাঘাটের বাসায়, ওরাই সব দেখাশুনো করুক, ওদেরই জিনিস।আমার সেখানে ভাল লাগে না।

স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল—তোমার ইচ্ছে যা হয় করো—কিন্তু তারআগে ঘরখানা তো সারানো দরকার। ঘরে জল পড়ে ভেসে যায়, থাকবে কিসে?

টেঁপির মা বলিল—সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। আমি অতসীদের বাড়ি থেকে কি ওইমুখুয্যেদের বাড়ি থেকে ঘর সারিয়ে নেব। জামাইকে বলে যেও খরচযা লাগে যেন দেয়।

রাধু মুখুয্যের বাড়ি রাত্রে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট— খিচুড়ি, ভাজা-ভুজি, মাছ, ডিমের ডালনা, বড়াভাজা, টক, দই, আম, সন্দেশ। অতসীকেও খাইতে বলাহইয়াছিল। কিন্তু সে আসে নাই। টেঁপি ডাকিতে গেল কিন্তু অতসী বলিল, তাহার মাথা ভয়ানক ধরিয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

শেষরাত্রে দুখানা গাড়ি করিয়া সকলে আবার রাণাঘাট আসিল। দুপুরের পর হাজারিএকটু ঘুমাইয়া লইল। ট্রেন নাকি সারারাত চলিবে, কখনও সে অতদূর যায় নাই, অতক্ষণ গাড়িতেও থাকে নাই। ঘুম হইবে না কখনই। যাইবার সময়ে টেঁপির মা ও টেঁপি কাঁদিতে লাগিল। কুসুমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অতসী সকলকে বুঝাইতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, ওকি কাকীমা? বিদেশে যাচ্ছেনএকটা মঙ্গলের কাজ, ছিঃ টেঁপি, অমন চোখের জল ফেলো না ভাই।

হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে, সামনেই পদ্ম ঝি।

পদ্ম ঝি বলিল—এখন এই গাড়িতে যাবেন ঠাকুর মশায়?

—হাঁ, পদ্মদিদি এবেলা খদ্দের কত?

—তা চল্লিশ জনের ওপর। সেকেনকেলাস বেশি।

ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো?

পদ্ম ঝি হাসিয়া বলিল—ওমা, তা আর বলতে হবে? যতদিন বাজারে পাই, ততদিন ইলিশের বন্দোবস্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন—দেখেছিলাম তো ও হোটেলে!

—হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো? তুমি হলে গিয়ে পুরোনো লোক।বেশ হুঁশিয়ার থেকো পদ্মদিদি। ভেবো তোমার নিজেরই হোটেল।

পদ্ম ঝি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝুঁকিয়া নিচু হইয়া বলিল—দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাক, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। এ কি হইয়া গেল! পদ্মদিদিতাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইতেছে, এমন একটা দৃশ্যকল্পনা করিবারও দুঃসাহস কখনো তাহার হয় নাই। কোন্ সৌভাগ্যটা বাকি রহিল তাহার জীবনে?

স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্মচারীরা প্রায় সকলে—তা ছাড়াঅতসী, টেঁপি, নরেন। বাহিরের লোকের মধ্যে যদু বাঁড়ুয্যে। যদু বাঁড়ুয্যে সত্যই আজকালহাজারিকে যথেষ্ট মানিয়া চলে। তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি এখনও অনেকবেশি উন্নতি দেখাইবে, এই তো সবে শুরু।

অতসী পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আসবেন কিন্তু পুজোর সময় কাকাবাবু, মেয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন রইল। ঠিক আসবেন—

টেঁপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খাবারের পুঁটুলিটা ওপরের তাক থেকে নামিয়ে কাছে রাখো বাবা, নামাতে ভুলে যাবে, তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু। আজ রাত্তিরেই খেও, ভুলো না যেন। কাল বাসি হয়ে যাবে, পথে-ঘাটে বাসি খাবার খবরদার খাবে না। মনে থাকবে? তোমার চিঠি পেলে মা বলেচে রাধাবল্লভতলায় পুজো দেবে।

চলন্ত ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতেছিল পদ্মদিদি যেআজ তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকেছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি!

ঠাকুর রাধাবল্লভ, জাগ্রত দেবতা তুমি, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। তুমিই আছ। আর কেহ নাই। থাকিলেও জানি না।